নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ

আবদুর রাযযাক নদভী

(38) نئی دنیا کا یوم آغاز

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: مولانا عبدالرزاق ندوی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস
মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)
অনুবাদ ঃ আবদুর রাজ্জাক নদভী

প্রকাশ কাল
অগ্রায়হণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
মহররম, ১৪৩৪ হিজরী
ডিসেম্বর, ২০১২ ঈশায়ী

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ 02-712-11221; মোবাঃ 01822-806163

কম্পিউটার কম্পোজ
মারজিয়া কম্পিউটারস্
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-90177-3-8

মূল্য ঃ ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র।

NUTUN PRITHIBIR JANMO DIBOSH: BIRTH DAY OF NEW WORLD. Written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, translated by Abdur Razzak Nadvi, published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Phone; 712 1121. Printed by M/S Tawakkal Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000; Bangladesh.

E-mail: roufster@gmail.com Web site: www.muhammadbrothers.com

Price: Tk. 160.00 only U D $ 4.00 only

উৎসর্গ

সেই সকল প্রবীণের প্রতি যাঁরা নবীনদের
গড়তে আগ্রহী নন।

আমাদের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো শোকর আর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অশেষ দরূদ ও সালাম।

একজন মুসলমানের সেই সকল ইতিহাস থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা উচিত নয় অথবা ভুলে যাওয়াও ঠিক নয়, যে পরিবেশ ও সমাজে নবী মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.)-এর আলোকোজ্জ্বল সূর্য প্রথম উদিত হয়েছিল। সে সময়কার দুনিয়া বিস্তৃত জাহেলিয়াত সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার। সেই সাথে সীরাতের পাঠকদের জন্য সে যুগের সামাজিক কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কেও অবগত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য, এ ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলাও একেবারে কম নয়।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-কে বিদগ্ধ পাঠক সমাজে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। স্ব-পরিচয়ে তিনি বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মুসলিমের নিকট সুপরিচিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সফরকারী ক্ষণজন্মা এই মহান পুরুষ ইবনে বতুতা (বা বাত্‌তুতা)-র সঙ্গে তুলনীয়। আল্লামা নদভী দেশ ভ্রমণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের আলোকে যে সারগর্ভ বক্তৃতা ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা রেখেছেন, সে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধে মানবতার প্রতি আল্লামা নদভী (র.)-র গভীর দরদ ফুটে উঠেছে ।

আমরা আল্লামা নদভী (র.)-র বিছু প্রবন্ধ 'নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস' নামে প্রকাশ করতে পেরে রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পাঠক হয়তো নামটি পড়ে আশ্চর্য হহতে পারেন, কিন্তু বইটিতে যতগুলো প্রবন্ধ আছে সবই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের দ্বারাই পৃথিবী নবজীবন লাভ করে। তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধগুলোকে অনুবাদ করে দেয়ার জন্য জনাব আবদুর রায্‌যাক নদভী সাহেবকে আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন! আমাদের এ প্রয়াস সফল হলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করব।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিনীত প্রচেষ্টা কবুল করুন! আমীন!

ঢাকা
জুলাই, ২০০৩ ইং

প্রকাশক

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর অন্যতম খলিফা, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগেরর পরিচালক জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেবের

ভূমিকা

বিশ শতকে এই উপমহাদেশের যে কয়েকজন মনীষী আলেম ও বুযুর্গ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছেন আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী (র) তাঁদের অন্যতম। পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতি–বিশেষ করে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তার উত্থান-পতন সম্পর্কে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যপ্রসূত ও বিশ্লেষণধর্মী যেসব মূল্যবান ভাষণ ও লেখনী রেখে গেছেন সেগুলোই তাঁর নাম ও পরিচয়কে অক্ষয় ও অমর করে রাখবে।

এসব ভাষণ ও লেখনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মহানবী সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় এসব ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন যেখানে মুসলমানদের সাথে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ নানাধর্ম ও মতের মানুষ সেসব ভাষণ শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। প্রদত্ত এসব ভাষণের অনেকগুলোই পরবর্তী-কালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর তিনি দু'টি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনাসহ অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধও লিখেছেন বিভিন্ন সময়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত সেসব ভাষণ এবং লিখিত অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আবদুর রায্যাক নদভী। অনুবাদক বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ থেকে ফারেগ হবার পর লাখনৌস্থ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় ভর্তি হন এবং সেখানে দু' বছরব্যাপী আরবী কোর্স সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি আল্লামা নদভী (র)-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। ফলে মাওলানা আবদুর রায্যাক নদভীর অনুবাদ অন্য অনেক অনুবাদকের তুলনায় যে অধিক প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হবে তা আশা করা চলে সঙ্গতভাবেই। ভূমিকা লেখক অত্যধিক ব্যস্ততাজনিত কারণে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুরোপুরি এর ওপর নজর বুলাতে পারেন নি। তবে যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে পাঠকের পক্ষে আল্লামা নদভী (র)-র মূল বক্তব্য বুঝতে কোন অসুবিধা হবেনা। মুদ্রণ প্রমাদ কিছুটা চোখে পড়বে। সেটুকু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। দীনের নগণ্য এ খাদেমের দো'আ ; মেহেরবানী মালিক অনুবাদকের খেদমতটুকু কবুল করুন এবং এ ময়দানে আরও অগ্রসর হবার তাঁকে তৌফিক দিন। আমীন!

–আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অনুবাদকের আরয

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর ও দরূদ সালাম হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর ও তার সাহাবীদের ওপর! বিশ্বব্যাপী নতুন করে সীরাতচর্চা শুরু হয়েছে, মানুষ আজ সেই মহামানব সম্পর্কে জানতে চায়, জানতে চায় তাঁর আগমনের রহস্য।

এ কথা নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় বলা চলে মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি, সুখ-শান্তি, নাজাত ও পরিত্রাণ একমাত্র নবী ও রাসূলগণের অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। মানুষকে আল্লাহ পাক যে সকল ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা যথাযথ পালন করার, সর্বোপরি আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বশেষ নবীর আনুগত্য করা একান্ত জরুরী। এজন্য তাঁদের জীবনী, লক্ষ্য ও আগমনের সঠিক উদ্দেশ্য যথাযথভাবে জানা দরকার। আর এসব জানা যদি হয় সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ও আধুনিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে, তবে তা হবে আমাদের জন্য পরম পাওয়া।

গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম ব্যক্তিত্ব, গবেষক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সমাবেশে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাতের ওপর সময় উপযোগী যেসব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন সেগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেসব পুস্তিকার মাত্র কয়েকটির বাংলা অনুবাদ "নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস"।

বইটিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাপক তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয় ঘটেছে। আশা করি পাঠক সমাজ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন ঃ অনুবাদের পর বইটি কলেবরে ছোট হওয়াতে ও সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু নিবন্ধ সংগ্রহ করে নিতে হয়েছে। বিশেষ করে জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেবের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং অন্যদের নিকটও কৃতজ্ঞ। আমার স্নেহের ভাগ্নে জাকিরকে অফুরন্ত দোয়া যার আন্তরিক চেষ্টায় বইটি প্রকাশ পেতে চলেছে। আর বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য

মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাঁকে খাটো করতে চাই না। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে আমার একান্ত মুনাজাত, আমার উস্তাদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-কে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন! সেই সাথে এর সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত সকলকে কবুল করুন। আমীন!

মাদরাসাতুল হুদা
উত্তরা, ঢাকা।
মে-২০০৩ ইং

আব্দুর রাযযাক নদভী

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস	১১
রসুলুল্লাহর জন্ম (সা.)ঃ এক নতুন পৃথিবীর জন্ম	১৯
হেরা গুহার আলো	২৩
রহমত রূপে রাসূল (সা.)	৩৪
সম্ভব হবে কি এর কোন চিকিৎসা	৩৭
মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ঃ এক নতুন পৃথিবী	৩৮
সুস্পষ্ট তাওহীদের আকীদা	৩৮
ঐক্য ও সাম্য	৪০
মানুষের সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা	৪২
হৃদয়ে হৃদয়ে ছেয়ে গেল আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো	৪৫
সমন্বয় সাধনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত	৫১
মঞ্জিলে মাকসুদ	৫৪
জন্ম হলো নতুন পৃথিবী—নতুন মানুষ	৫৫
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) আরব দ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন?	৫৮
সভ্যতা ও মানবতার উৎকর্ষ সাধনে নবুওয়াতের অবদান	৭২
স্থানের উপযোগিতা	৭২
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব	৭৩
এ যুগে আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা	৭৪
কুরআনে কারীমের আলোকে নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম	৭৫
অনুপ্রেরণাদায়ক ও প্রিয় আলোচ্য বিষয়	৭৫
নির্বাচিত সৃষ্টি ও মানবতার নিষ্কলুষ আদর্শ	৭৭
কুদরতী প্রশ্ন	৮০
সাফা পাহাড়ের উপকণ্ঠে	৮৩
নবুয়তের দর্শনগত রূপ	৮৪
হিদায়েতের একমাত্র মাধ্যম	৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রীক দর্শনে ব্যর্থতার কারণ	৯২
ইসলামী যুগে দর্শনের ত্রুটি	৯৫
আম্বিয়া-ই-কিরামের স্বাতন্ত্র্য	৯৫
রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাবের পর কারো অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অবকাশ নেই	৯৯
ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে মহাবিপর্যের আশংকা	১০০
জ্ঞানী, তত্ত্ববিদ ও আম্বিয়া-ই-কিরামের স্বরূপ নিরূপণে একটা উদাহরণ	১০০
শহরে নবীগণের দায়িত্ব কি হবে	১০২
সর্বাপেক্ষা পবিত্র দায়িত্ব	১০৩
মানবতার কল্যাণ, বরকত ও সভ্যতার অগ্রগতির আসল উপাদান	১০৪
মাওলানা রাবে হাসানী নদভীর অভিমত	১০৭
মানবতার পথ প্রদর্শনে ইসলামের সুমহান অবদান	১০৯
নবুওয়তে মুহাম্মদীর মু'জেযা ও বৈপ্লবিক অবদান	১০৯
একটি অপ্রত্যাশিত সূচনা	১১০
আত্মা, মহাকাশ, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের অতীতকাল, চিন্তা-ভাবনার	১১১
জ্ঞানের বিক্ষিপ্ত এককের ভেতর ঐক্য ও সম্পর্ক	১১৩
পাশ্চাত্য জাগরণ, সভ্যতায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব যুগের সূচনায় ইসলামের অবদান	১১৫
প্রাচীন বিশ্বে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকর অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানে তাদের নেতৃত্ব	১১৬
মুসলিম আবিষ্কারক ও বিশেষজ্ঞগণ	১১৬
জ্ঞানের ইতিহাসে সবচে' বড় ভ্রান্তি ও ইতিহাসের সবচে' বড় দুর্ঘটনা	১১৮
প্রফেসর খলীক আহমদ নিজামীর মুখবন্ধ	১২০
মহানবী (সা.)-এর অবদানে আজকের সভ্য পৃথিবী	১২৩
প্রাচীন ধর্মগুলোর তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা সভ্যতার পতন বৃত্তান্ত	১২৫
তাতারী প্রলয় রোধ ও ইউরোপকে জ্ঞানের আলো দান	১৩৭
মুসলমানদের উদ্দেশ সীরাতের পয়গাম	১৪২
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবদানে নতুন পৃথিবী	১৪৭
সর্বশেষ নবী ও তাঁর উম্মত	১৬২
হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী	১৬৩
বিশুদ্ধ হাদীসের দৃষ্টিতে খতমে নবুওয়ত	১৭৬
সমকালীন পৃথিবীর প্রতি সীরাতে মুহাম্মদীর পয়গাম	১৭৮

নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস

[রবিউল আওয়াল মাসের দিল্লি রেডিওর আমন্ত্রণে পঠিত প্রবন্ধ]

যদি আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি ঃ মানব জাতির ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিন কোন্‌টি, যা সমগ্র মানব জাতির কাছে শীর্ষ মর্যাদা ও বিরল সম্মান পাবার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে, যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং মানুষ যা কখনও ভুলবে না, যা চিরন্তন দিবসের মর্যাদার অধিকারী হবে, ইতিহাসের নানা কাল আর যুগে দুই পৃথিবীর মাঝে ভেদরেখা হিসেবে চিহ্নিত হবে?

যদি আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি ঃ কোন্ সে দিবসটি, জাতি ধর্ম, শ্রেণী, স্তর, দর্শন-মতবাদ, চিন্তা ও ভাবধারার শত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে দিবসে সকলেই পালন করবে মহাউৎসব, মহাআনন্দ? কারণ এ দিবসেই সমগ্র মানব জাতি সুদীর্ঘ বঞ্চনার পর চরম সৌভাগ্যের সোনালী সূর্যের আলোক দর্শনে হয়েছিল পরম ধন্য, যুগ-যুগান্তর স্থায়ী পদস্খলনের পর লাভ করেছিল পুনরুজ্জীবন।

যদি আমরা পরস্পকে জিজ্ঞেস করি ঃ সে দিবস কোন্‌টি, যা পৃথিবীর নবজন্মের উৎস দিবস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, বিবেচিত হতে পারে সৌভাগ্য যুগের সূচনাক্ষণ হিসেবে, যেদিন বিজয় হয়েছিল অমর্যাদার ওপর মর্যাদার, অকল্যাণের ওপর কল্যাণের, অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের, শ্রেণী বৈষম্যের ওপর সাম্যের, পাশবিকতার ওপর মানবতার, পাষণ্ডতার ওপর দয়া ও ভালবাসার, বাতিলের ওপর হকের, মিথ্যার ওপর সত্যের, যেদিন বিজয় হয়েছিল জংলী জীবন ও দলীয় আইন-কানুনের ওপর সুশৃংখল জীবন বিধান ও পরিপূর্ণ আইন-শৃংখলার? এক কথায় সকল প্রকার জাহিলিয়াতের ওপর চূড়ান্ত বিজয় হয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঈমানের।

আমরা যদি পরস্পর প্রশ্ন করি ঃ সে কোন্ দিবসটি, যেদিন সকল অকল্যাণের মূলোৎপাটন করতে, সকল ফেৎনা-ফ্যাসাদের গতির সামনে চরম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, আল্লাহর ওপর প্রগাঢ় ঈমান, সৎ কর্মের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও অসৎ কর্ম থেকে নিরুৎসাহিত করতে? আল্লাহভীতি ও মানবসেবার ওপর প্রতিষ্ঠিত, চক্ষু শীলতকারী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল এক প্রচণ্ড কর্মচঞ্চল ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি; যে সমাজ জন্ম দিয়েছিল এমন সব মানুষ যাঁরা অন্তরের দিকে থেকে ছিলেন সবচেয়ে সৎ, জ্ঞানে ছিলেন সবচেয়ে গভীর, মানবতার সৌভাগ্যের লক্ষ্যে আল্লাহতা'য়ালা তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন, যাঁরা মানব জাতিকে সুপ্রাচীন গভীর তমসা থেকে

বের করে এনেছিলেন আলো ঝলমল পথে, মানবতাকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্তি দিয়ে টেনে এনেছিলেন আলোর পথে এবং আল্লাহর দাসত্বের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে পথ প্রদর্শন করেছিলেন পৃথিবীর প্রশস্ততার দিকে, যাঁরা এ পথে অকাতরে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন নিজেদের জানমাল, শৌর্য-বীর্য, যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য, ঐশ্বর্য ও হাসি মুখে বরণ করে নিতেন সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন-নিপীড়ন ও বিপর্যয়; সকল প্রকার উত্থান-পতন ও ভাঙা-গড়ার সম্মুখীন হতে হতেন না কখনও পিছপা, কোন প্রকারে বিরোধিতা ও সমালোচনা তাঁদের এ পথ থেকে পিছু হটাতে সক্ষম হতো না, বন্ধুর বন্ধুত্ব, শত্রুর শত্রুতা তাঁদের প্ররোচিত করতে পারত না কোন অন্যায় আচরণে, যাঁরা মুমিনদের প্রতি ছিলেন সদয়, বিনয়ী আল্লাহদ্রোহীর বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্রকঠিন, আল্লাহর পথে করে যেতেন অবিরাম জিহাদ, ভয় করতেন না কোন সমালোচনা কটাক্ষের।

আমরাও যদি একে অপরকে প্রশ্ন করি, কোন্ দিনটিতে আরবরা নব জীবন লাভে ধন্য হয়েছিল? বরং সে দিনেই তারা প্রকৃতপক্ষে নব জন্ম লাভ করেছিল এবং বিশ্ব ইতিহাসের মঞ্চে প্রথমবার তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, অধিষ্ঠিত হয়েছিল মর্যাদার সুউচ্চ আসনে, আর তখনই তারা একটি সুসভ্য জাতির মর্যাদা লাভ করেছিল। কারণ ইতিপূর্বে তারা হাজারো দলে বিভক্ত গোত্রীয় জীবন যাপন করত। বিভক্ত ছিল আত্মঘাতী নানা দল-উপদলে, পরস্পর সংঘাতমুখর নেতৃত্বে। তারা ছিল বিশ্ব জাতিসত্তার নিভৃত কোণে বসবাসরত এক অপরিচিত জনগোষ্ঠী, মানব জীবনের কোন ক্ষেত্রে তাদের ছিল না কোন পদচারণা–কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। আর না ছিল গৌরব করার মত কোন অবদান। বিশ্ব রাজনীতি ও জীবন ব্যবস্থার ওপর তাদের ছিল না কোন সম্মানজনক স্থান ও অবস্থান। নৈতিকতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে তাদের ছিল না কোন মর্যাদার আসন। মানুষের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, ভাবধারা মূল্যবোধের ওপর ছিল না তাদের কোন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব। পৃথিবীর লাইব্রেরী, পাঠশালা, জ্ঞান-গবেষণাগারে ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অগ্রগতির ময়দানে ছিল না তাদের কোন অধিকার ও অংশীদারিত্ব। তারা অধিকারী ছিল মাত্র সামান্য কিছু কাব্যসম্ভারের, যা স্থানীয় ঘটনা প্রবাহ ও তুচ্ছ স্বার্থকে কেন্দ্র করে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোকে রচিত হতো। অবশ্য এ কাব্যের মাঝে ফুটে উঠত ভাষার অসামান্য রূপ-মাধুর্য ও শোভা-সৌন্দর্যমণ্ডিত রচনা শিল্পের অপূর্ব নৈপুণ্য। শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসের অসাধারণ দক্ষতা, শব্দসম্ভারের পর্যাপ্ততা, দীপ্তিময় হয়ে উঠত তাতে কবির আত্মমর্যদাবোধ ও স্বাধীনচিত্ততা। কবি আবৃত্তি করত আর অমনি লোকমুখে তার চর্চা হতো এবং সাথে সাথে তা ছড়িয়ে পড়ত শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ঠাঁই পেত মর্যাদার আসনে। অতঃপর তা ঝুলিয়ে দেয়া হতো কাবা

গৃহে। এই ছিল তার বিস্তার ও মর্যাদার সীমারেখা। না আরব জাহানের বাইরের কোন কবি-সাহিত্যিকদের জানার কোন ব্যবস্থা ও সুযোগ ছিল, আর না ছিল সভ্য দুনিয়ার কোন জীবন্ত ভাষায় তার অনুবাদের ব্যবস্থা। এ সবের পরেও আরব জনগোষ্ঠী সত্য ভাষণে, শক্তিশালী উপস্থাপনায়, চিন্তা-চেতনার স্বচ্ছতায়, সাম্যের প্রতি ভালবাসায়, সহজ-সরল ও সাদামাঠা জীবন যাপনে, প্রচণ্ড লড়াই ও লড়াইয়ের ময়দানে অপূর্ব দৃঢ়তায়, বংশধারার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এসবে তাদের ছিল জগতজোড়া খ্যাতি। অপূর্ব চারিত্রিক সৌন্দর্য, অতিথিপরায়ণতা, বদান্যতায় ও আল্লাহপ্রদত্ত অসংখ্য গুণ, যোগ্যতা ও প্রতিভায় তারা ছিল পৃথিবীময় পরিচিত। কিন্তু অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের তিমির অন্ধকারে এসব গুণ গুমরে গুমরে অশ্রুপাত করছিল, অথচ এসবের সুষ্ঠু বিকাশ ও ব্যবহার সংঘাত-বিক্ষুব্ধ ও অন্ধকার পৃথিবীতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংঘটিত করতে পারে মহাবিপ্লব। অশান্ত ধরায় প্রবাহিত করতে পারে শান্তির ফল্গুধারা, দিকভ্রান্ত মানবতাকে দিতে পারে সঠিক পথের সন্ধান। মানবতার দ্বারপ্রান্তে এনে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও বঞ্চিত সুখ-স্বচ্ছান্দ্য। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এ বিকাশের সকল পথ ছিল রুদ্ধ।

অকস্মাৎ আরব উপদ্বীপে সৃষ্টি হলো নব জাগরণ। সংঘটিত হলো প্রলয়ংকরী এক মহাবিপ্লব। আরব উপদ্বীপে আবদ্ধ এ জনগোষ্ঠীর সকল সুপ্ত প্রতিভা যেন ফুলে-ফেঁপে উঠল, বিকশিত হলো! বঞ্চিত ও অখ্যাত এ জাতিসত্তা আজ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করল। ফিরিয়ে দিল পৃথিবীর গতি। পাল্টে দিল ধরার পট। বদলে দিল দুনিয়ার দৃশ্য। বিশ্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করল নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি যা ছিল এক নতুন দ্বীন-ধর্ম থেকে সংগৃহীত, এক নতুন শক্তি থেকে আহরিত এবং আল্লাহভীতি ও আমানতদারি দ্বারা সিঞ্চিত ও পরিতৃপ্ত। আরব দ্বীপে আবদ্ধ তাদের সে ভাষা আজ নতুন পৃথিবীর পবিত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করল। এর পাঠক-পঠন, এতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন ও সাহিত্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করা, এর উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের প্রতি ঝুঁকে পড়ল মানবেতিহাসের সেরা মেধাবী ছাত্ররা। এ ভাষার সাথে পরিচিত লাভ করা, এতে গভীর জ্ঞানার্জন করা পবিত্র দ্বীনী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার সোপানে পরিণত হলো যা ছাড়া কোন ব্যক্তি সে সমাজে না পারে মর্যাদার চূড়ায় আরোহণ করতে আর না পারে শিক্ষা, অধ্যাপনা, ফতোয়া, বিচার বিভাগের কোন পদ অলংকৃত করতে।

আমরা যদি একে অপরকে প্রশ্ন করি ঃ সে কোন্ দিবসটি যে দিবস নিরাশ মানব মনে জাগ্রত হয়েছিল নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার, ভগ্ন মানব মনে সঞ্চারিত হয়েছিল নতুন পৃথিবী গড়ার, নতুনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন-সাধ? এই দিনেই বিজয় হয়েছিল 'অশুভ'র ওপর 'শুভ'র, যা মানব জাতিকে করে রেখেছিল নিরাশ-কর্মক্ষম, যা বিস্তার লাভ করেছিল পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে? পরিবেষ্টন করে রেখেছিল সকল জাতিগোষ্ঠীকে, যা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল মানুষের মন-মানসিকতা ও বুদ্ধি-বিবেকের সুগভীরে, যা প্রভাবিত করে রেখেছিল আকীদা-বিশ্বাস ও সকল কর্মকাণ্ডকে। পরিণতিতে সকল সভ্যতা-সংস্কৃতির সলিল সমাধি হতে চলেছিল। সেখানে মানুষ মানুষের পূজা করত। নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা হয়ে পড়েছিল নিরাশ। ধরাবক্ষে অবশিষ্ট থাকার সমূহ যোগ্যতা, গুণাবলী, যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও অধিকার তারা হারিয়ে ফেলেছিল। সমগ্র মানব জাতি অবধারিত শাস্তি আর নিশ্চিত ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই দিনের সুপ্রভাত শুভাগমন তাদের জন্য আবার বয়ে আনল বেঁচে থাকার পয়গাম, এনে দিল সমাজ পুনর্গঠনের অবকাশ ও সুযোগ। তার জীবন হলো দীর্ঘায়িত, আবার ফিরে পেল বেঁচে থাকার যোগ্যতা ও অধিকার, পুনরুদ্ধার হলো হারানো গৌরব ও মর্যাদা। পুনরুজ্জীবিত হলো বিলুপ্ত আখলাক-চরিত্র, শৌর্য-বীর্য, ফিরে পেল নির্ভরশীলতা। প্রাপ্ত হলো জালেমের শাস্তি নিধান এবং মজলুমের সাহায্য যোগানোর শক্তি-সাহস। তার মর্যাদার উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা লাভে সে ধন্য হলো, যা যথার্থই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। গোটা সৃষ্টিকুলের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ দিবসটি ছিল তার দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির দিবস, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার প্রাপ্তির দিবস, উন্নতি-অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্তির দিবস। তাই যেসব ব্যক্তি এ দিবসের পর পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, তারা সকলেই এ মহাদানের কাছে থাকবে চিরঋণী।

কোন প্রকার মতপার্থক্য সন্দেহ ছাড়া এসব প্রশ্নের উত্তর হবে এটি—সেদিন, যেদিন ধরাবক্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম (সা.)। এই সে দিন, যে দিন মানবতা ফিরে পেয়েছিল তার হারানো ঈমান। যুগ যুগ ধরে সে ছিল তার অন্বেষী। এ ঈমান ছিল সকল সৃষ্টির স্রষ্টার ওপর, তার একত্ববাদের ওপর, আখেরাতের ওপর, ভাল-মন্দ কর্মের পুরস্কার ও তিরস্কারের ওপর ঈমান, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর ঈমান। মানুষ এ মহামূল্যবান ঈমান পেয়েছে এমন সময় যখন সে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিল এবং ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও প্রবৃত্তির দাসত্বের প্রতি। এ ঈমান ছিল সকল প্রকার নবী-রাসূল ও পথ প্রদর্শকদের ওপর। এমন সময় যখন ধর্মে বিকৃতিসাধনকারী দানবগোষ্ঠী ধর্মকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল।

তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখত, অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত মানুষের সম্পদ। মানুষের মর্যাদা যখন ছিল আক্রান্ত ও ভূলুণ্ঠিত, সৃষ্টির সেরা মানুষ যখন তার মর্যাদাময় মস্তককে অবনত করেছিল পাথর, বৃক্ষ, জীবজন্তু, নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতের সম্মুখে। কিন্তু এই ঈমানের বরকতে সে বিশ্বাস করতে শিখল দুনিয়ার সব কিছু তারই সেবার উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির আর সবকিছু তার সেবায়ই সদা নিয়োজিত। আর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের উদ্দেশে। আজ সে মানব মর্যাদা ও ভেদাভেদের কৃত্রিম মানদণ্ড বিশ্বাস করে না, বরং মনে করে, আল্লাহভীতিই একমাত্র মর্যাদার মানদণ্ড। না আরব অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর না অনারব আরবের চেয়ে। একমাত্র তাকওয়া ও আল্লাহভীতিই মর্যাদার মাপকাঠি। কারণ সকল মানুষই আদম সন্তান, আর আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। সে আজ সকলের অধিকারে বিশ্বাসী। সকলের অধিকার স্বীকৃত এবং অধিকার আদায় করা তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য। সে অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও দয়ালু। স্বীয় অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বিনম্র ও মধ্যম পন্থার অনুসারী। সর্বোপরি কর্তব্য প্রতিপালনে সে তৎপর ও কর্মচঞ্চল। নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকলেই অভিভাবক, তোমাদের সকলকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী আজ এ সমাজে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নয়, বরং সে পুরুষের মর্যাদাময় সহকর্মী ও সহধর্মিণী। পুরুষের যেমন নারীর ওপর অধিকার রয়েছে, যা সে যথাযথভাবে আদায় করতে বাধ্য, তেমনি নারীরও পুরুষের ওপর ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যা সে আদায় করতে বাধ্য। এ হলো ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তব শিক্ষা ও বিজ্ঞজনোচিত উপদেশমালা, যা নিয়ে আবির্ভূত হলেন মানবতার মুক্তির দূত, বিশ্ব শান্তির অগ্রপথিক, পথভ্রষ্ট মানবতার পথের দিশারী, স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত সৃষ্টির প্রতি সর্বশেষ বাণীবাহক মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) যাঁর আবির্ভাবের ফলে ধরাপৃষ্ঠে অস্তিত্ব লাভ করে নজিরবিহীন একটি সুসভ্য কল্যাণময় পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সমাজ। প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি দেশেই শুধু এ উপদেশমালা ও শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে দিনেই পৃথিবী এসব উপদেশমালা ও বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীতে এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থার আর কোন উদাহরণ নেই। তবে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এর অস্তিত্ব ও প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় যদিও তা পূর্বের ন্যায় ততটা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ছিল না।

ইসলামের পূর্বেকার সমাজের অবস্থা ছিল, কখনও কখনও সেসব সমাজে সংস্কার ও রেনেসাঁর স্লোগান উঠত কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা ও পরিস্থিতির চাপে তা তিমির আঁধারে অদৃশ্য হয়ে যেত। দুর্গন্ধময় সমাজ তা গ্রাস করে ফেলত। কারণ

এ রেনেসাঁ আন্দোলনের পেছনে এমন সব ব্যক্তি থাকতেন না যারা এ লক্ষ্য অর্জনের পথে নিজেদের জান, মাল, ইজ্জত, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা- প্রতিপত্তি সব কিছু বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে যুগের সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারেন। এমন কোন দলও দৃষ্টিগোচর হতো না, যারা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বাজি রেখে মানবতাকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.)-এর আগমনে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত মজবুত ও হিমাদ্রির মত অটল অবিচল এমন এক সংঘবদ্ধ দলের আবির্ভাব ঘটে, যাদের জীবন-মরণ সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত ছিল মানবতার মুক্তির পবিত্র দাওয়াতের উদ্দেশে। এ পথে অবিরাম জিহাদের উদ্দেশে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

"তোমরা সেরা উম্মত, মানবতার কল্যাণ সাধনার্থে তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করে থাক ও অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখ" (আল ইমরান, ১১০)। এরা এমন এক জাতি যারা এ দাওয়াতের উদ্দেশে নিজেদের প্রাণকে উৎসর্গ করে দেয়। এ দাওয়াতের উন্নতি, অগ্রগতি ও এর জীবন-মরণের সাথেই বেঁধে দেয় নিজেদের জীবন-মরণ ও ভবিষ্যৎকে।

এ নবাগত চিরন্তন জাতি, যার সাথে এ দাওয়াতের ভবিষ্যৎ যুক্ত, তাদের নেতৃত্ব দেবে আরবরা, যারা এর সর্বপ্রথম ধারক-বাহক, যারা সত্যনিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছিল, যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে হাত রেখে শপথ করেছিল, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। নিজেদের জান-মাল ও মালিকানাধীন সব কিছুর ওপর তাঁর প্রাধান্যকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিল। নিজেদের জান-মাল, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকেও পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছার অধীন করে দিয়েছিল। এরাই তাঁর প্রথম নিষ্ঠাবান সঙ্গী, আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দল। এ দাওয়াতে বিশ্বস্ত বাহক। বিশ্বের দরবারে এ দাওয়াতের নিষ্ঠাবান আদর্শ প্রতিনিধি দল। এ দাওয়াতকে গভীরভাবে বোঝার ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে তারাই অগ্রপথিক। এ পথে সর্বাধিক জানমালের কোরবানী দিত। যারা এরই জন্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন, নির্দ্বিধায় শিকার হয়েছেন এ পথের সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয়ের। নিজেদের ভবিষ্যতকেও দাওয়াতের ভবিষ্যতের সাথে এবং নিজেদের স্থায়িত্বকে এর স্থায়িত্বের সাথে বেঁধে দিয়েছিলেন। নিজেদের বিত্ত-বৈভব, নিজেদের সর্বস্ব বিপন্ন করে দিয়েও একে পৃথিবীর সামনে সমুন্নত করে রেখেছিলেন। এ কারণেই হুযুর (সা.) বদর প্রান্তে মহৎপ্রাণ জামাত সম্পর্কে

যথার্থই বলেছিলেন, হে আল্লাহ, মুষ্টিমেয় দলটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ধরাপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত হবে না (সীরাতে ইবনে হিশাম)। আল্লাহতা'আলা পৃথিবীতে এ আরবদেরকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাদেরকে দিয়েছিলেন অনন্য মর্যাদা, যখন তারা বিশ্বের দরবারে ছিল অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। তাদের ঐশ্বর্যময় করেছিলেন, যখন তারা ছিল দরিদ্র। তাদের শক্তিশালী করেছিলেন, যখন তারা ছিল দুর্বল। তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, যখন তারা ছিল বিভিন্ন গোত্র ও দলে বিভক্ত। তাদের ভাষাকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ, পবিত্র ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষার সম্মান দানে ভূষিত করেছিলেন, অথচ তা ছিল আরব দ্বীপে আবদ্ধ এক অখ্যাত ভাষা। পৃথিবীময় এ ভাষার প্রচার-প্রসারের এক স্থায়ী ব্যবস্থা করেছিলেন। মানুষের অন্তরে দান করলেন এর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসা। 'দজলা' প্রান্ত থেকে 'আটলাস পর্বতমালা' পর্যন্ত পৃথিবীর এক বিশাল জনগোষ্ঠী নিজেদের পূর্ব ভাষা পরিত্যাগ করে এ ভাষাকে গ্রহণ করল নিজেদের ভাষা হিসেবে, অথচ এ ছিল শুধু মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের ভাষা। আজ আল্লাহর ফজলে ও মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের বরকতে এ ভাষা লাভ করল সুবিশাল নতুন মুসলিম বিশ্বের ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা ও লেখনীর ভাষা হওয়ার বিরল মর্যাদা। বিশ্ববক্ষে আল্লাহপাক আরবদের দান করলেন শক্তিশালী সুদৃঢ় অবস্থান ও মর্যাদা। মুসলিম বিশ্বে সকল প্রকার উত্থান-পতন, আঞ্চলিকতা ও খণ্ড জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চরমপন্থী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশের পরেও এ মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে, যদি তারা ইসলামকেই একমাত্র দ্বীন হিসেবে মেনে চলে, ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার ওপর প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, তাঁর বিধানাবলীকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাত ও তাঁর আনীত আদর্শকে প্রকৃত মর্যাদা দান করতে থাকে। মুক্ত কণ্ঠে ও স্বগৌরবে বিশ্বের সামনে এ কথার ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করতে থাকে, মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.) একমাত্র ব্যক্তি যাঁর আগমনই সমগ্র মানব জাতিকে দিয়েছিল মুক্তি, মর্যাদা ও স্বাধীনতা। আরবরা পেয়েছিল গৌরবময় মর্যাদা ও পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব।

এই সেই নতুন পৃথিবী যেখানে মানব জাতি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে। এখানে সে এর ওপর বুক ফুলিয়ে গৌরব করতে পারে। সে উপভোগ করতে পারে সকল প্রকার বৈষম্যমুক্ত ন্যায্য সামাজিক ও নাগরিক অধিকার। এখানে বয়ে চলে অনাবিল স্বাধীনতা ও সাম্যের ফল্গুধারা। এখানে কোন অধিকার-বঞ্চিতের ক্রন্দন শ্রবণ করতে হয় না। অগ্রাহ্য হয় না কোন

ফরিয়াদীর ফরিয়াদ। সে এমনও সব অধিকার লাভ করে, যা প্রাচীন পৃথিবীতে গুমরে গুমরে অশ্রুপাত করত, শ্বাসরুদ্ধ ও পরিত্যক্ত ছিল। কিন্তু এ দিগন্ত বিস্তীর্ণ নতুন পৃথিবীতে সভ্যতা-সংস্কৃতির ও সকল প্রকার উন্নতি-অগ্রগতির দ্বার অবারিত উন্মুক্ত। এ সে নতুন পৃথিবী, যেখানে আরবরা লাভ করল নতুন মর্যাদা, নতুন নেতৃত্ব। ধন্য হলো এক নতুন জীবন লাভে, অধিকারী হলো বিশাল এক সাম্রাজ্যের। মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ও ইসলাম ছাড়া এ মর্যাদা অর্জন করা কোনভাবে সম্ভব ছিল না।

আল্লাহ্ তাঁর ওপর অবতীর্ণ করুন অসংখ্য দরূদ ও সালাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ সময়ই আমরা অনুভব করি না, এ মহাইনকিলাব, এ বিরল সৌভাগ্য, যার সুফল আমরা সকলেই উপভোগ করছি এবং যা থেকে আমরা গোটা মানব জাতি উপকৃত হচ্ছি, এর মূল উৎস ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলের মুবারক আবির্ভাব, যা এ দিনেই সংঘটিত হয়েছিল। মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) আল্লাহর শেষ নবী। সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ দূত, শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, সত্যের মহান দিশারী। সুতরাং এ দিবসটিই মানব ইতিহাসের সর্বাধিক গৌরবময় দিবস। তার স্মরণে মানব জাতি সগৌরব আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে অলংকৃত ভাষায় সুর লহরিত কণ্ঠে আবৃত্তি করবে ঃ জন্ম নিল পথের দিশা/সৃষ্টি নিয়ে আলোকিত ভাই/ফুটল হাসি কালের মুখেও/পঞ্চমুখর তব প্রশংসায়।

রসুলুল্লাহর জন্ম (সা.) ঃ এক নতুন পৃথিবীর জন্ম

প্রত্যেক মানুষের কাছেই তাঁর জন্ম দিবসটি অত্যন্ত প্রিয়। আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি তারও একটি জন্ম দিবস আছে। আর তা হলো রসুলুল্লাহর আগমনের মুবারক দিবস। এমনিতে তো পৃথিবীর বয়স অনেক দীর্ঘ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ পৃথিবী অনেকবারই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে, আবার জাগ্রত হয়েছে। মারা গিয়েও আবার জীবন লাভ করেছে। সর্বশেষ যে দিনে এ পৃথিবী মৃত্যুর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, হুঁশ ফিরে পায় এবং চক্ষু মেলে তাকায়, সে দিনটি ছিল রসুলুল্লাহর আগমনের অর্থাৎ রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ। কারণ এ দিনেই মক্কার প্রধান সরদার আবদুল মুত্তালিবের গৃহে তাঁর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্ম লাভ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ইয়াতীম হয়ে, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা করেন সমগ্র মানব জাতির এবং পৃথিবীকে উপহার দেন এক নতুন জীবন।

ঘুমন্ত অবস্থায় জীবনের যে অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় তা তো আসলে কোন জীবনই নয় অথবা আত্মহত্যার আয়োজনে সে সময় অতিবাহিত হয়, তা কোন জীবন বলারই যোগ্য নয়। তাই সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর প্রকৃত ও কাজের বয়স চৌদ্দ শত বছরের বেশী নয়।

খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মানবতার গাড়ী একটি ঢালু পথে এক গভীর খাদের দিকে চলতে আরম্ভ করে। অন্ধকার বিস্তার লাভ করতে থাকে। পথের উৎরাই বাড়তেই থাকে এবং ক্রমেই এর গতি দ্রুত হতে থাকে। এ গাড়ীর আরোহী ছিল বিশ্বে বসবাসরত সমগ্র মানব কাফেলা এবং আদমের সমস্ত পরিবার। হাজার বছরের সভ্যতা সংস্কৃতি, যুগ যুগ ধরে জ্ঞানী-গুণী মানুষের পরিশ্রমের ফসল এ গাড়ীতে ছিল ভর্তি। কিন্তু গাড়ীর আরোহীরা ছিল গভীর সুখ-নিদ্রায় বিভোর অথবা গাড়ীতে আরো উন্নত জায়গা দখলের প্রতিযোগিতায় মত্ত। তারা ছিল সংকীর্ণ প্রকৃতির। সহযাত্রীদের সাথে মতবিরোধ হলেই এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকত। সেখানে কিছু এমন মানুষও ছিল যারা নিজেদেরই মত আরও কিছু মানুষকে হুকুমের দাস বানিয়ে রেখেছিল। কিছু তো এমনও ছিল, যারা উন্নত খানাপিনার আয়োজনে ব্যস্ত। আর কিছু ছিল গান-বাজনা ও আনন্দ উল্লাসে মত্ত। সকলেই নিজ নিজ কাজে ও নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ ফিরে দেখছিল না গাড়ী কোন্ গভীর খাদে নিপতিত হতে যাচ্ছে। একটু পরে গাড়ী ও গাড়ীর আরোহীদের পরিণতি কি হবে? গাড়ী কী ভয়াবহ পরিণতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত!

মানবতার দেহ তরতাজা ও সতেজ ছিল। কিন্তু অন্তর ছিল মৃতপুরী, মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় ও হৃদয় অনুভূতিহীন মৃত, ধমনী অবসাদগ্রস্ত, আঁখি নিষ্প্রভ ও ঘোলাটে। মানবতা, ঈমান ও ইয়াকীনের মহামূল্যবান সম্পদ থেকে ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করেও একজন ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী মানুষ পাওয়া ছিল ডুমুরের ফুলের মতই দুর্লভ! সর্বত্রই ছিল সন্দেহবাদীদের রাজত্ব। মানুষ নিজেই নিজেকে অপমানের চরম গহ্বরে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। মানুষ তারই সেবায় নিয়োজিত বস্তুর সম্মুখে মস্তক অবনত করত। মানবতার এ উন্নত শির এক আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছুর সম্মুখেই অবনত হতো। হারামে সে ছিল নেশাগ্রস্ত, সুরার নেশায় বিভোর, এ ছিল তার দিবা-নিশির জীবনসঙ্গী। রাজরাজড়ারা প্রজার খুনের ওপর আয়েশ করত। অঞ্চলের পর অঞ্চল মানব বসতি তাদের অঙ্গুলি হেলনে উজাড় ও বিরান হয়ে যেত। তাদের কুকুরগুলো স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করত, অথচ বুভুক্ষ মানবতা সামান্য দানাপানির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরত। জীবনযাত্রার মান এত বুলন্দ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে জীবন ধারণ হয়ে গিয়েছিল সীমাহীন কষ্টসাধ্য। যে ব্যক্তি এই মানে উত্তীর্ণ হতে না পারত তাকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না, বরং তাকে চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হতো। নিত্য নতুন করের ভারে কৃষিজীবী ও হস্তশিল্প মালিকদের কোমর ভেঙে পড়ছিল, গর্দান বেঁকে যাচ্ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কথায় কথায় সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য উজাড় এবং জাতির পর জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া তাদের বাঁ হাতের খেলা ছিল। সকলেই জীবন চিন্তার অক্টোপাসে ছিল বন্দী। জুলুম ও অত্যাচারে সমগ্র মানবতা ছিল অতিষ্ঠ। সারা দেশ অনুসন্ধান করেও এমন একজন আল্লাহর বান্দার সন্ধান করেও পাওয়া যেত না, যার মধ্যে তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির চিন্তা-ভাবনা অথবা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসা ছিল। মোটকথা, এ পৃথিবীতে নামমাত্র জীবন ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল এক বড় ধরনের আত্মহত্যার আয়োজন।

দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন হয়ে পড়েছিল মানবীয় শক্তি সাধ্যের বর্হিভূত। পানি বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সমস্যা কোন এক দেশের উন্নতি অথবা কোন এক জাতির মুক্তির ছিল না। সমস্যা ছিল সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী। সমস্যা ছিল সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও নাজাতের এবং সমগ্র মানব জাতির হায়াত-মওত তথা জীবন-মৃত্যুর। প্রশ্ন কোন একটি অপরাধের ছিল না। মানবতার পুরো দেহ ছিল ক্ষত-বিক্ষত। তার আঁচল ছিল ছিন্ন-ভিন্ন। যারাই সংস্কার প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসত, তারাই এই বলে পশ্চাপদ হয়ে যেত, "তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, পট্টি বাঁধবো কোথায়?" দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক—সকলেই এ ময়দানের মর্দে মুজাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সৎ সাহস দেখাতে অক্ষমতা প্রকাশ

করে, বরং সকলেই এই সর্বগ্রাসী মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। নিজেরাই যারা রোগী তারা অন্য রোগীর চিকিৎসা কিভাবে করবে? যাদের নিজেদের অন্তর ইয়াকীনের আলোশূন্য অন্ধকার, তারা অন্যের অন্তরকে কিভাবে ইয়াকীনের আলোয় পূর্ণ করতে পারে? যারা নিজেরাই পিপাসায় কাতর তারা অন্যকে কোত্থেকে পানি পান করাবে?

মানবতার ভাগ্যদ্বার আজ এক ভারী তালাবদ্ধ, যার চাবির সন্ধান মিলছে না। জীবনের ফিতা জড়িয়ে গিয়েছে, যার কোন প্রান্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।.....এই ছিল সে সময়কার গোটা মানব বিশ্বের চিত্র। কিন্তু এ পৃথিবীর মালিক ও স্রষ্টার কাছে এ অবস্থা ও এই চিত্র ছিল ভীষণ অপছন্দনীয় ও সম্পূর্ণ অসহনীয়। তাই তিনি এই অবস্থার প্রতিকারের দিকে মনোনিবেশ করলেন। সর্বশেষে তিনি আরব দেশে (যারা স্বাধীনচেতা, উদার ও মুক্ত মন-মানসিকতা এবং সহজ-সরল জীবনবোধের অধিকারী যা ছিল স্বভাব ও ফিতরাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) এক নবী প্রেরণ করলেন। কারণ নবী ছাড়া এ মহামারী আক্রান্ত বিধ্বস্ত ও ঘুণে-ধরা সমাজ আর কারো পক্ষে সংস্কার করা সম্ভব ছিল না। এ মহান পয়গাম্বর ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আল্লাহর লাখ লাখ দরুদ ও সালাম তাঁর ওপর।

এ জীবনের সব কিছু সহীহ-সালামতেই ছিল, কিন্তু তার ব্যবহার হচ্ছিল অপাত্রে। জীবনের চাকা চলছিল ঠিকই, কিন্তু ভুল পথে। প্রকৃত সমস্যা ছিল এই, জীবনের লক্ষ্যচ্যুতি হয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল সকল অপরাধের মূল উৎস। লক্ষ্য কি ছিল? এ লক্ষ্য ছিল নিজের, এ পৃথিবীর স্রষ্টার সঠিক পরিচয় লাভ এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যের ফয়সালা। তাঁর প্রেরিত পয়গম্বরদের মান্য করা এবং তাঁদের নির্দেশনা ও তা'লীম মাফিক জীবন যাপন করা। মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখা।

নবী আগমন করলেন। মানবতার প্রকৃত সমস্যা উপলব্ধি করলেন এবং জীবনের স্থানচ্যুত লক্ষ্যকে সঠিক স্থানে স্থাপন করলেন। কিন্তু এ পথে তাকে হাজারো সমস্যা, সংকট ও সীমাহীন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হলো। নিজের গোটা পরিবারকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে, নিজের সর্বস্ব কুরবানী করে, এ পথের সকল ঝড়-ঝঞ্ঝাকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে, মানবতার তুফানবেষ্টিত তরীকে কূলে ভেড়ালেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি রাজমুকুট, ধন-দৌলত ও আরাম-আয়েসের বড় থেকে বড় উপঢৌকনকেও প্রত্যাখ্যান করলেন, প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করলেন, সারা জীবন আরামহীন জীবন অতিবাহিত করলেন। পেটে পাথর বাঁধলেন। কখনো উদরপূর্ণ করে খানাপিনা করলেন না। দুনিয়ার সকল বিপদ-আপদ ও সকল ত্যাগ-তিতিক্ষায় ছিলেন সবার

অগ্রগামী। সকল প্রকার ভোগ-বিলাস পরিহার করলেন। তিনি ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বেই পৃথিবীর সব কিছুকে সঠিক স্থানে স্থাপন করে গেলেন। পরিবর্তন করে দিলেন তিনি ইতিহাসের ধারাকে। তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি পৃথিবীর গতিই পাল্টে দিলেন! পৃথিবী ফিরে পেল জাগ্রত বিবেক। জন্ম নিল সৎ কর্মের মানসিকতা। পৃথিবী শিখল ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে। উন্মুক্ত হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর পথসমূহ। মানুষের সামনে মানুষ এবং তারই সেবার উদ্দেশে সৃজিত অন্য সব সৃষ্টিলোকের সম্মুখে মস্তক অবনত করার কথা যে আজ কল্পনাও করতে পারে না। উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ বিদূরিত হলো। গোত্রীয় ও বংশীয় অহংকার বিলুপ্ত হলো। নারী তার অধিকার ফিরে পেল। দুর্বল ও অসহায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেল। মোটকথা, দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ দৃশ্যপটই বদলে গেল। যেখানে গোটা দেশে একজন আল্লাহভীরু মানুষ খুঁজেও পাওয়া যেত না, সেখানে লক্ষ লক্ষ এমন মানুষ জন্মলাভ করল যাঁরা দীনের আলো ও রাতের আঁধারে আল্লাহকে সমানভাবে ভয় করত, যাদের অন্তর অগাধ বিশ্বাস ও আল্লাহর ইয়াকীনে পরিপূর্ণ ছিল, যারা দুশমনের প্রতিও ইনসাফ করতে কুণ্ঠাবোধ করত না, ন্যায়ের ক্ষেত্রে স্বীয় সন্তানকেও পরোয়া করত না, যাঁরা নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে ছিল প্রস্তুত, তারা অন্যের আরামের খাতিরে নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করত না। দুর্বলকে সবলের ওপর প্রাধান্য দিত, যারা রাত্রে ইবাদত গুজার, দিনে ছিল ঘোড় সওয়ার। ঐশ্বর্য ও রাজত্ব, শক্তি ও খাহেশাত সব কিছুর ওপর ছিল তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। শুধু আল্লাহর নির্দেশের সামনেই তাঁরা মাথা ঝোকাত। আজ তাদের একমাত্র পরিচয়, তারা আল্লাহর বান্দা। তারা অশান্ত পৃথিবীকে ইল্‌ম ও ইয়াকীন, ন্যায়-নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহর যিকিরে পূর্ণ করে দিল। যমানার রথ গেল বদলে। শুধু মানুষই নয়, গোটা পৃথিবীটাই বদলে গেল!

এই ঐতিহাসিক বিপ্লব ও জগতজোড়া এই পরিবর্তন সংঘাত-বিক্ষুব্ধ ধারায় প্রেরিত আল্লাহর সেই পয়গাম্বরের অনন্য শিক্ষারই ফল ছিল। সমগ্র মানব জাতির ওপর কোন মানুষ এমন এহ্‌সান ও অনুগ্রহ করেন নি যেমনটি করেছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। যদি মুহাম্মদ (সা.)-প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহ ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে মানব সভ্যতা হাজার হাজার বছর পিছিয়ে যাবে আর বিশ্বমানবতা হারাবে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু।

বেলাদতে নববীর এই দিনটি কেন মুবারক হবে না? আজকের এ দিনেই তো দুনিয়ার সবচেয়ে মুবারক মানব ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিনি এ পৃথিবীকে দিয়েছেন নতুন ঈমান, নতুন জীবন।

কবির ভাষায় "ধরাব্যাপী বসন্তের এ সমারোহ তাঁরই অবদান।"

হেরাগুহার আলো

[১৯৫০ সালে রেডিও মক্কাতে প্রচারিত]

আমি জাবালে নূরে আরোহণ করলাম। এই নূর পর্বতের সেই বিখ্যাত গুহাটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম যার নাম হেরা গুহা। এখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার মনকে বললাম, এই সেই গুহা যেখানে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে নবুওয়াত দান করেছিলেন। এই সেই গিরিকন্দর যেখানে তাঁর প্রিয় নবীর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাযিল করেছিলেন। সুতরাং যথার্থভাবেই বলা যায়, যে সূর্যের বিমল কিরণ সারা জাহানকে আলোকিত করেছিল সেই সূর্যের প্রথম উদয় হয়েছিল এইখানে। অতঃপর পৃথিবী লাভ করেছিল নব জীবন।

এই পৃথিবী প্রতিদিনই একটি নতুন প্রভাতকে আলিঙ্গন করে, স্বাগত জানায়। কিন্তু সাধারণভাবে পৃথিবী তার এই নতুন প্রভাতে কোন নতুনত্ব পায় না, কোন চমক খুঁজে পায় না। খুঁজে পায় না নতুন প্রভাতে নতুন কোন সৌভাগ্যের পরশ। তাই নতুন প্রভাতের আগমনে পৃথিবীর অধিবাসীরা জেগে ওঠে। তারা ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে কিন্তু তাদের অন্তরনিদ্রা ভাঙ্গে না। অলস নিদ্রায় ডুবে থাকে তার অন্তরাত্মা। এই নিদ্রার কোন শেষ নেই। এই মিথ্যা প্রভাতেরও কোন অন্ত নেই, অথচ এই গিরিকন্দর থেকে যে প্রভাত সূচিত হলো, হেরা গুহার এই গর্ভে যে সূর্যের উদয় হলো সে ছিল এক ভিন্ন প্রভাত, বরং সে ছিল এক সুবহে সাদিক যার আলোয় উজালা হলো সারা জগত। জাগৃতি এল সব কিছুতে, এই প্রভাতেই ইতিহাস খুঁজে পেল নতুন মোড়, নতুন পথ। নতুন রাঙিয়ে রোল উঠল পৃথিবী, যুগ। সত্যিকার অর্থে এটাই ছিল এক নতুন সকাল।

এই প্রভাতের আগে মানবতার স্বভাবজাত উন্নতি থেমে গিয়েছিল। উন্নতির সব পথ ছিল তালাবদ্ধ। মানব উন্নয়ন ও বিকাশের সব দরজা রুদ্ধ ছিল। মানুষের বিবেকগুলোও ছিল তালা মারা। সে সময়ের চিন্তাবিদ দার্শনিকরা বিবেকের সেসব জট খুলতে পারেন নি। মানুষের হৃদয়ের তালা ঝুলছিল। ওয়ায়েজ, সাধক, সংস্কারকরা সেই তালাও খুলতে পারেন নি। মানুষের প্রতিভাগুলোও ছিল তালাবদ্ধ। সমকালীন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সমাজ ব্যবস্থা কোনটাই সেই তালা খুলতে সাহস করেনি, সক্ষম হয়নি। সেকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও বিশেষ কোন অর্থবহ ছিল না। সেকালের বিদ্বান, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকমণ্ডলীও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থবহ করতে অক্ষম ছিলেন। আদালতের স্থান প্রাঙ্গণ ছিল ঠিকই। কিন্তু ইনসাফের দরজা ছিল বন্ধ। অসহায় ফরিয়াদীর কান্না শোনার সেখানে কেউ ছিল না। বংশ ও দ্বন্দ্ব নিরসনে ছিল অসহায়। শাহী দরবারগুলোর

দরজা ছিল অনেক উঁচুতে। মেহনতী কিষাণ, অসহায় দিনমজুর আর নির্যাতিত প্রজারা সেই দরজা পর্যন্ত কোনক্রমেই পৌঁছতে পারত না। ধনকুবের আর বিত্তবানদের দরজা ছিল তালাবদ্ধ। নিঃস্বজনদের ক্ষুধা তাদের স্ত্রীদের নাঙ্গা বদন আর দুগ্ধপায়ী শিশুদের কান্নার অবিরাম আর্তনাদও বিত্তবানদের দরজা খুলতে পারেনি।

অনেক বড় সংস্কারক কঠিন প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে ময়দানে পদার্পণ করেছেন। অনেক বড় আইনপ্রণেতা পাহাড়সম হিম্মত ও স্বপ্ন নিয়ে ময়দানে এসেছেন। কিন্তু তারা জীবন সংসারের এই অসংখ্য তালা থেকে একটি তালাও খুলতে পারেন নি। কারণ এসব তালার প্রকৃত চাবি তাদের হাতে ছিল না। এই চাবি হারিয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। আর তালাতো তার নিজস্ব চাবি ছাড়া খোলা যায় না।

তারা তাদের নিজেদের তৈরী চাবি দ্বারা অবশ্য খোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই চাবি তালায় বসাতেই পারেন নি। অনেকে আবার তালাগুলোই ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু তালা ছিল এত শক্ত, উল্টো তাদের আসবাবপত্রই গুঁড়িয়ে গেছে। আহত বিক্ষত হয়েছে তাদের হাত।

ঠিক এই সময় সভ্য জগত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বাহ্যত হতমান গুমনাম ছোট্ট একটা পর্বতের ওপর মহান প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে রিসালাতের মহামহিম মর্যাদায় ভূষিত করলেন; আর বিশ্বমানবতা ফিরে পেল শত শত বছরের হারানো সেই চাবি যে চাবির অভাবে পৃথিবীর সেই কঠিনতম গ্রন্থিকে পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক মিলেও উন্মোচন করতে পারেন নি; যে সমস্যার জট খুলতে পারেনি পৃথিবীর নামী দামী দেশের সকল রাজধানী। আর সেই চাবি হলো ঈমান। আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান।

মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) 'গারে হেরা' হেরা গুহা থেকে এই চাবি নিয়ে নেমে আসলেন মানুষের সমাজে। শতবর্ষের তালাবদ্ধ সকল দরজা এক এক করে খুলে দিলেন তিনি। জীবনের সকল কপাট খুলে গেল। বদ্ধতার বদলে সর্বত্র পরিলক্ষিত হলো মুক্তি।

তিনি যখন নবুওয়াত ও রিসালাতের এই চাবিটি তালাবদ্ধ বিবেকের ওপর লাগালেন তখন বিবেকের সব গ্রন্থি আলগা হয়ে গেল। বিবেকের সকল বক্রতা, প্যাঁচ ও জটিলতা কেটে গেল। তার চিন্তায় উদ্যম এল। এখন সে তার নিজের ভেতর ও আবিশ্ব পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডলীতে আল্লাহর অসীম কুদরত দেখতে পায়। সৃষ্টির বিচিত্র লীলায় ডুবে সে আবিষ্কার করে তার সৃষ্টিকর্তাকে।

শত পূজ্যের পর্দা ভেদ করে আবিষ্কার করে নূরময় এক অদ্বিতীয় সত্তাকে। সে এখন মুক্ত বিবেক। তার চিন্তায় এখন শির্‌ক মূর্তিভজন আর ধারণাপ্রসূত পূজাপাটের কানাকড়ির দাম নেই, অথচ ইতোপূর্বে বিবেক এসব বিষয়ে অনুপ্রবেশ করার সাহসই করেনি, বরং শত শত বছর ধরে সে তার আসল থেকে বঞ্চিত বিতাড়িত ছিল। বিবেক ছিল বিবেকশূন্য।

এই চাবির পরশে মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) মানুষের আত্মার তালা খুলে দিলেন। জেগে উঠল তখন ঘুমন্ত হৃদয়। তার মৃত অনুভূতি ও চেতনায় চাঞ্চল্য এল। জীবন এল সবখানে। আত্মার বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত যে নফস এতদিন কেবল মন্দ কাজের আদেশ দিত, এখন আত্মার সক্রিয় সঞ্চালনে সেই নফস-ই হলো নাফসে লাওয়ামা। এখন আর সে মন্দ কাজের আদেশ করে না, বরং মন্দ কাজের তিরস্কার করে, নিন্দাবাদ করে। অবশেষে দেখতে দেখতে সেই নাফস-ই বনে গেল নাফসে মুতমাইন্না। এখন আর সেখানে অন্যায় প্রবেশের কোন পথ নেই। অপরাধ এখন তার জন্যে চূড়ান্ত অসহ্য যার ফলশ্রুতিতে এখন পাপী নিজেই মুহাম্মদুর রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে স্বীয় পাপের স্বীকৃতি জানিয়ে জীবনের কঠিনতম শাস্তি প্রার্থনা করে নিজেরই বিরুদ্ধে।

এক গোনাহগার নারী! নবীজীর দরবারে এসে পাথর মারার শাস্তি প্রার্থনা করেছেন নিজের বিরুদ্ধেই। রাসূল (সা.) শরীয়তসম্মত কারণেই তাঁর শাস্তি বিলম্বিত করেন। তিনি চলে যান তাঁর গ্রামের নিবাসে, অথচ তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে কোন সিআইডি নেই। তাকে পুনর্বার দরবারে উপস্থিত করার জন্যে কোন পুলিসও নেই। কিন্তু তিনি যথাসময়ে মদীনায় উপস্থিত। উপস্থিত হয়ে শাস্তি লাভের জন্যে রীতিমত পীড়াপীড়ি, অথচ সেই শাস্তি মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ কঠিন!

ইরান যখন বিজিত হলো তখনকার কথা! এক গরীব ফৌজী! তার হাতেই এসে পড়েছে কিসরার মুকুট। সময়ের সবচে' দামী সম্পদ। তিনি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে সেই মুকুট পৌঁছে দিচ্ছেন আমীরের খেদমতে। গোপনে দিচ্ছেন এই কারণে, যাতে আমানত আদায় হয় যথাযথভাবে আবার তার আমানতদারীরও প্রদর্শনী না হয়।

মানুষের হৃদয়গুলোতেও তালা ঝুলছিল। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না তাতে। আল্লাহর ভয়ও ছিল না। প্রাকৃতিক কোমলতা ও আর্দ্রতা কিছুই ছিল না। কিন্তু যখন তিনি তাঁর নবুওয়াতী চাবি বুলিয়ে দিলেন মুহূর্তে বদলে গেল হৃদয়ের অবস্থা। অতি সামান্য ঘটনা থেকেও বিরাট বড় শিক্ষা গ্রহণ করে। স্বীয় সত্তা ও

পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্ত যে কোন নিদর্শনই তাদের বিশ্বাস ও আত্মায় শক্তি যোগায়। নির্যাতনের বেদনাবিধুর দশা তাদের অন্তরে যাতনার ঝড় তোলে। এখন আর তারা অসহায় গরীব-দুঃখীকে ঘৃণা করে না, তাচ্ছিল্য করে না, বরং ভীষণভাবে ভালবাসে।

মানুষের সুপ্ত বন্ধ্যা প্রতিভায় যখন আঘাত করল এই চাবি, তখন এতদিন মানুষের অনিষ্ট সাধনে ঘর্মক্লান্ত প্রতিভাই হঠাৎ করে আভাময় হয়ে উঠল। প্রচণ্ড সয়লাবের মত তরঙ্গময় হয়ে উঠল তাদের সুপ্ত লুপ্ত সব শক্তি ও প্রতিভা। দিকভ্রান্ততার অন্ধকার থেকে উঠে এসে শুদ্ধ পথের যাত্রী হলো। ফলে এতোদিন যারা বকরী ভেড়ার ফেরী করে ফিরত তারাই এখন জাতির কর্ণধার হলো, জাতি থেকে বিশ্ব পর্যায়ের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করল তারাই। যিনি ইতোপূর্বে একটি গোত্র কিংবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন কিংবা ছিলেন খ্যাতনামা এক অশ্বারোহী যুবক, এখন তার নেতৃত্বেই দেশের পর দেশ জয় হতে লাগল, শক্তি ও দর্পে আকাশছোঁয়া খ্যাতির অধিকারী রাষ্ট্র ও শক্তি নত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করতে লাগল তারই সম্মুখে।

তিনি এই চাবি দ্বারা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালাও খুলে দিলেন। তালা খুলে দিতেই সেখানে সাড়া জাগল নব জীবনের। অণুতে-পরমাণুতে দোলা জাগল নতুন সাধের, নতুন স্বপ্নের, অথচ ইতোপূর্বে এখানে স্তূপ পড়েছিল বরফের। বিদ্যার উষ্ণতা না প্রতিষ্ঠানে ছিল, না ছিল শিক্ষকদের মধ্যে। শিক্ষার্থীদের মধ্যেও কোন আকর্ষণ ছিল না। আন্তরিকতা কিংবা আদৌ উন্মাদনা ছিল না কোথাও। তিনি (সা.) জ্ঞান-বিদ্যার মর্যাদার কথা সকলকে বললেন। জ্ঞানীদের মহান মর্যাদা ও সম্মানের কথা তুলে ধরলেন সকলের সামনে। ইসলাম ও বিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্কের কথাও বললেন। তখন সকলেই বিদ্যার প্রতি ইল্‌ম ও জ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগী হয়ে উঠল। তাদের ঝোঁক সৃষ্টি হলো বিদ্যা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি। তারা সক্রিয় সচেষ্ট হলো। দেখা গেল মুসলমানদের প্রতিটি নিবাস প্রতিটি মসজিদ একটি মাদরাসায় একটি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানই একজন শিক্ষার্থী এবং অন্যের জন্যে একজন শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। কারণ ইসলামে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা অসীম।

আদালতের রুদ্ধ কপাট খুলে দিলেন তিনি এই চাবি দিয়েই। আদালতের বন্ধ কপাট খুলে যেতেই সেখানকার সকল বিচারক ন্যায়বান বিশ্বস্ত বিচারকে পরিণত হলো। তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের অনুভূতি ব্যাঙময় হয়ে উঠল। মুসলমানগণ কেবলই সত্যের খাতিরে সত্য সাক্ষ্য দেয়াটা নিজেদের কর্তব্য বলে

ভাবতে লাগল। আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন ইনসাফ ও নীতির উচ্চারণ এমনিতেই সমুন্নত হলো। আল্লাহ্ ও ঈমানের অনুভূতি যখন জাগ্রত হলো তখন অন্যায়-অবিচার ও মিথ্যা সাক্ষ্য সবই বিলীন হয়ে গেল।

মানুষের সামাজিক লেনদেন তো রসাতলে গিয়েছিল! পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ব্যবধান ছিল বিস্তর। বিভেদ, স্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিক লাভ-লোকসানের এই দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা সমাজের সর্বত্র ঘনায়মান ছায়ার মত বিস্তার করেছিল। সর্বত্রই ছিল কেবল আত্মস্বার্থ। কিছু খরিদ করলে সাড়ে ষোল আনায় বুঝে নিতে আলসেমি করত না। আর দিতে গেলে ভাবত কেবল ঠকাবার কথা। পবিত্র কুরআনে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

"তারা যখন অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে তখন পরিপূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, আর যখন মেপে দেয় তখন দেয় পরিমাণে কম।"

মুহাম্মদ রাসূল (সা.) তাঁর নববী চাবির ছোঁয়ায় সমাজের এই ভয়ানক বদ্ধতা ও সংকীর্ণতাও খুলে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে গভীর ঈমান, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার দীপ্ত প্রত্যাশা, পরকালের প্রতি ভরাট কামনা ও শংকায় তাদের ভেতরগুলো পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে শুনিয়েছেন আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সকলকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে এবং সেই যুগল থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রচুর নারী ও পুরুষ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার উসিলা নিয়ে তোমরা পরস্পরে যাচ্না কর এবং আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখ। নিশ্চয় আল্লাহতা'য়ালা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা নিসা ঃ ১]

তিনি সমাজের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি কিছু দায়িত্ব আরোপ করলেন এবং এভাবেই তিনি পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালেন। প্রতিষ্ঠিত করলেন পূর্ণাঙ্গ ন্যায়, ইনসাফ, প্রেম-প্রীতি ও সততার

ওপর। অধিকন্তু তিনি মানব সমাজকে করে তুললেন নীতিসচেতন। সমাজের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সততা ও আমনতদারির গভীর অনুভূতি ও আল্লাহভীতির এমন শিকড়স্পর্শী চেতনা জাগ্রত করে তুললেন, সমাজের নেতৃশ্রেণী পর্যন্ত সাচ্চা পরহেজগার ও সরল জীবনের উন্নত নমুনায় রূপান্তরিত হলো। সমাজের নেতারা নিজেদেরকে সমাজের সেবক মনে করতে শুরু করেছে। সরকারপ্রধানরা নিজেদেরকে একজন এতীমের অভিভাবকের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারতেন না। নিজের ব্যক্তিমালিকানায় কিছু থাকলে সরকারী সম্পদের প্রতি কখনোই হাত বাড়াত না। তাও না থাকলে বেঁচে থাকার মত সামান্য ভাতার ওপরই তুষ্ট থাকত। এভাবেই রাজা-বাদশাহ ও ধনবান ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থিব সব কিছুর প্রতি বিরাগ আর পরকালের প্রতি অগাধ অনুরাগ সৃষ্টি হয়। তিনি তাদেরকে বলেছেন ঃ সম্পদের প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ। তিনি খরচ করবার জন্যে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন মাত্র। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ...

"আল্লাহ্ তার সম্পদে তোমাদেরকে যে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন তোমরা তা থেকে খরচ কর।" [সূরা হাদীদ ঃ ৭]

"আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে অসহায় লোকদেরকে দান কর।" [সূরা নূর]

আর যারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে না, সম্পদ সঞ্চিত গচ্ছিত করে রাখে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করেছেন এভাবে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِجَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَامَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। সেদিন বলা হবে, এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।"

[সূরা তাওবা ঃ ৩৪-৩৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় পয়গাম ও দাওয়াত দ্বারা যাদেরকে গড়ে তুলেছিলেন তারা যখন সমাজ প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হলেন তখন তাদের মধ্যে ছিল আল্লাহর প্রতি খাঁটি বিশ্বাস, সত্যের প্রতি অসীম প্রেম, আল্লাহর প্রতি সীমাহীন ভালবাসা, আমানত ও সত্যবাদিতার পতাকাবাহী, আখিরাতের জন্যে পার্থিব সব বিসর্জন দেয়ার প্রগাঢ় ক্ষমতা ও বস্তুর ওপর বিজয়ী আত্মিকতা। অধিকন্তু তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এই পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সকলই আমাদের জন্যে। কিন্তু আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুই পরকালের জন্যে।

এ কারণেই তারা যখন ব্যবসার ময়দানে অবতরণ করতেন তখন তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার ও সত্যবাদী বলেই প্রমাণিত হতেন। মজদুরী করলে তাতেও নেহাৎ মেহনতী ও নিষ্ঠাবানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। তাদের কারো কাছে বিত্ত থাকলে সেই সাথে আন্তরিকতা, দয়া ও দানশীলতাও সঞ্চিত থাকত। তাদের কেউ গরীব হলে একান্ত বিপদ ও ঝুঁকির মুহূর্তেও তারা আত্মমর্যাদাকে আহত করতেন না। আর বিচারকের চেয়ারে অধিষ্ঠিত হলে উপলব্ধি, বিশ্বাস ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ অবশ্যই রেখে যেতেন। রাজত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলে সেখানে অবশ্যই চিত্রিত হতো এক নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাবান শাসকের আলোকিত রূপ। মালিক ও মনিব হলে তারা হতেন দয়ার্দ্র কোমলমনা মালিক ও মনিব। চাকর হলে তার প্রতিটি পদক্ষেপে করে পড়ত চঞ্চলতা, সততা ও আনুগত্য। জাতির সম্পদের রক্ষক নিযুক্ত হলে সেখানে দিতেন একান্ত জাগ্রত সচেতন এক বিজ্ঞ রক্ষকের পরিচয়।

মূলত এদের ইট-পাথর দিয়েই নির্মিত হয়েছিল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সৌধ। এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি। এ কারণেই সেকালের সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল নাগরিকদের চরিত্র-স্বভাবের এক উন্নত বিকাশালয়। সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন গুণের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে। সেখানে ব্যবসায়ীর সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল। গরীব অসহায় জনদের আত্মমর্যাদাবোধ ও ক্লেশ সহ্য করার চিত্র সেখানে ছিল। মজদুরের পরিশ্রমী মন ও কল্যাণকামিতা ছিল। ধনবানদের বদান্যতা ও সহর্মিতার রূপরসও ছিল সেখানে। সেখানে বিচারকের বিচক্ষণতা ও ইনসাফ ছিল। শাসকের নিষ্ঠা ও সাধুতার আলো ছিল। মনিবের দয়ার্দ্রতা ও আন্তরিকতা সেখানে ছিল। গোলাম ও চাকরের আনুগত্য, কর্মচঞ্চলতা ও ধৈর্য ছিল সেখানে। সেখানে আরও ছিল প্রহরী ও সম্পদ রক্ষকের পরিপূর্ণ সতর্কতা দীপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ। অর্থাৎ রাজ্য ও প্রজা উভয়

দিক থেকেই ছিল সমৃদ্ধ ও কল্যাণপূর্ণ। প্রজাদের সকল সুন্দর গুণে আলোকিত উদ্ভাসিত ছিল সেই রাজ্য। রাজ্যের সর্বত্র সততা, স্বচ্ছতা, নিয়ামানুবর্তিতা ও শৃংখলা সমানভাবে বিরাজমান। জনগণের সম্পদ লুট করার পরিবর্তে তখন তাদেরকে বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা হতো প্রশাসন থেকে। আর এ কারণেই সমাজ ও নাগরিকের জীবন বৃক্ষের পত্রে পত্রে করে পড়ত বসন্তের যৌবন আর সর্বত্র অনুভূত হতো স্বর্গীয় স্বভাব সৌরভের অতুগ্র গন্ধ, মনমাতানো সুরভি।

হেরা গুহায় দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে এসব কথা ভাবছিলাম। আমি ভাবনা ও অতীতের স্মৃতির দরিয়ার এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলাম আমি ভুলেই গিয়েছিলাম নিজের অস্তিত্বের কথা। আমার ভাবনা-কল্পনা আমাকে আমার বর্তমান ও চারপাশের পৃথিবী থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমার ভাবনাগুলো তখন সেই হারানো দিনের সোনালী স্মৃতির ছবি আঁকছিল। সেই ছবিতে আমি অতীত দিনের বিমল কান্তি প্রাণভরে আস্বাদন করছিলাম। খুঁটে খুঁটে দেখছিলাম তার প্রতিটি অঙ্গকণা। আমার তখন মনে হচ্ছিল আমার চারপাশে ছেয়ে আছে সেই সোনালী দিনের সব আয়োজন। আমি সেই সুরভিত সমাজের স্বর্গীয় গন্ধ প্রাণভরে উপভোগ করছি। কল্পনার এই ভুবনেই মনে হলো সেই সময়ের কথা, সত্যিকার অর্থে যেই সমাজে আমি এখন বসবাস করছি যেমন পরিবেশে এখন আমি আছি সেই পরিবেশের কথা মনে হলো। তখন আমার মনে হলো আজও তো জীবনের সর্বত্র বেশ কিছু নতুন তালা ঝুলছে! চারপাশে কত বিচিত্র ধরনের সমস্যা! কত শত সংঘাত-দ্বন্দ্ব আর জটিলতা। আচ্ছা, সেই পুরানো চাবিটি দিয়ে কি এই নতুন তালাগুলো খোলা যায় না?

আমার মনে এই প্রশ্নটি নাড়া দিয়ে উঠল। আমি তখন ভাবলাম, আমাকে আগে এই তালাগুলো ভাল করে দেখে নিতে হবে। এর ধরন-প্রকৃতি না জানার আগে কিছু বলা ঠিক হবে না। অতঃপর আমি যখন এই তালাগুলো হাতে নিয়ে দেখলাম তখন বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমি দেখলাম, এগুলো কোন নতুন তালা নয়। এগুলো সেই পুরান তালাই। নতুন কেবল তার রং। সাথে কিছু জটিলতার যোগ হয়েছে। কিন্তু শেকড় সেই পুরানোই।

এখনও মূল সমস্যা ব্যক্তি। ব্যক্তির সমস্যাই সব সময় মূল সমস্যা ছিল। কারণ সমাজ সভ্যতার ভিত্তি নির্মিত হবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি হলো তার ইটস্বরূপ। সমাজ ও দেশ এই ইট দিয়েই নির্মিত প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এই ব্যক্তির সবচে' বড় সমস্যা হলো সে এখন বস্তু ও শক্তির বাইরে কোন কিছু মানতে প্রস্তুত নয়।

তার মতলব একটাই—মন ও প্রবৃত্তির অনুসরণে চাহিদা পূরণ। তার কাছে এই পার্থিব জগতের দাম প্রকৃত মূল্যের চাইতে অনেক বেশি। ভোগ ও বিলাসের পূজায় সে আত্মহারা। আল্লাহ্, রাসূল আর আখিরাতের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই। ব্যক্তি পর্যায়ের এই অধঃপতনই মূলত সমাজ ব্যবস্থার সকল অধঃপতন ও বিপর্যয়ের উৎস। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুর্ভাগ্যের মূল বিন্দুও এটাই।

পতিত এই ব্যক্তি যখন ব্যবসা করতে যায় তখন তার থেকে লোভ ও সঞ্চয়ের নিকৃষ্টতম রূপই প্রকাশ পায়। দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতির সময় মালপত্র গুদামজাত করে তারাই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এবং দ্রব্যমূল্যের চড়া গতির সময় তা বাজারে ছেড়ে দেয়। এতে তারা অধিক লাভবান হয় আর সাধারণ মানুষ মরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায়। এই ব্যক্তি যখন দরিদ্র হয়ে পড়ে তখন চেষ্টা করে নিজে পরিশ্রম না করে অন্যের পরিশ্রমের ফল বসে বসে ভোগ করতে। এরা শ্রমিক হলে চেষ্টা করে কাজে ফাঁকি দিয়ে মূল্য পারিশ্রমিক ষোলআনা বুঝে নিতে। এরা ধনী হলে সেই সাথে সেরা কানজুস, কৃপণ ও কঠিনহৃদয় হয়। হাতে ক্ষমতা আসলে সততার ধার ধারে না। মালিক হলে স্বার্থ আর অত্যাচারই তার ভূষণ হয়। এরা নিজের বাইরে কারও মধ্যে লাভ ও শান্তি দেখতে চায় না। কর্মচারী হলে কাজে ফাঁকি দেয়। সম্পদের সংরক্ষক নিযুক্ত হলে ধোঁকা ও চুরি করতে বিন্দুমাত্র আলসেমি করে না। মন্ত্রী কিংবা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হলে উদর পূজারী হিসেবেই কাটে তার জীবন। তাদের কেউ নেতা হলে নিজেকে বেশ প্রগতিশীল বলে প্রচার করলেও স্বীয় সম্প্রদায় ও দেশের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে না। অধিকন্তু সে নিজের দেশ ও জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কত দেশ ও জাতির সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে তার কোন হিসেবে থাকে না। আইন প্রণয়নের সুযোগ কখনো হাতে এলে জুলুম নির্যাতন আর ট্যাক্সের এমন বোঝা জাতির ওপর চাপিয়ে দেয় জাতি আর শির দাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। আবিষ্কারের ক্ষমতা মাথায় থাকলে আবিষ্কার করে কেবল বিধ্বংসী যন্ত্র। গ্যাস-ট্যাংক-কামান-গোলা-বারুদসহ বিষাক্ত ভয়ংকর সেই আবিষ্কার থেকে মানুষ তো স্বাভাবিক পৃথিবীর অন্য প্রাণীরাও মুক্তি পায় না। মানুষের বসতি হয় বিরান গণকবরস্থান।

এটা স্বাভাবিক কথা, ভালো মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ ও দেশ যখন সকল কল্যাণময় আলোকিত গুণের স্বচ্ছ দর্পণ হবে তখন মন্দ ও পতিত মানুষদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র হবে ভয়ানক ঘৃণিত কলংকিত এক বীভৎস চিত্র। এখানকার ব্যবসায়ীরা সম্পদ গুদামজাত করবে, লোভে ভোগে

বেসামাল হবে। অসহায়রা অবাধ্য হবে; মজদুর শ্রমিক কম শ্রমে অধিক পারিশ্রমিক প্রত্যাশী হবে; ধনীদের কার্পণ্য, শাসকের অত্যাচার, প্রভু ও মালিকদের দোর্দণ্ড প্রতাপ, চাকর-বাকরদের ধূর্তামি ও খেয়ানত সংরক্ষকদের চুরি ও চালাকি, উজীর-নাজিরদের স্বার্থপূজাই হবে সে সমাজের সাধারণ রূপ।

এটা মূলত সকল অনিষ্টের উৎস। সকল অস্থিরতা, বিপর্যয় ও বিশৃংখলার মূল হলো ব্যক্তি-চরিত্রের সমস্যা। ব্যক্তিসমস্যার বিস্ফোরণেই আজ বিশ্বময় মানবতা অস্থিরতার শিকার। আর এই ব্যক্তিসমস্যার মূল ব্যাধিটা হলো বস্তুপূজা। বস্তুই সকল কিছুর মূল শক্তি। এই ধারণাই সকল কিছু ঘুলিয়ে রেখেছে। কালো বাজারী, সুদ, ঘুষ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, কৃত্রিম সংকট তৈরি, গুদামজাতকরণ সবই এই বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের স্বাভাবিক ফসল। পৃথিবীর সকল চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী এসব সমস্যার যথার্থ সমাধান দিতে পারছে না। তারা একটা সমাধান আবিষ্কার করতে গেলে নতুন আরেকটা সমস্যায় আটকে যান। গ্রন্থি একটি উন্মোচিত হলে আরও দশটি বেঁধে যায়। আজ বরং একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না, তারা আজ সমস্যা উন্মোচনের বদলে নতুন সমস্যারই জন্ম দিয়ে চলছেন অর্থাৎ হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় যা হবার তাই হচ্ছে। একটি রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে তারা অগণন রোগের সৃষ্টি করছে। ডাক্তারের পরিচয় ঘটছে নতুন নতুন ব্যাধির সাথে। তার অভিজ্ঞতার পরিধিতো বাড়ছে। কিন্তু রোগীর দশা? আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তারা একবার মনে করেছেন একনায়কতন্ত্রই এসব সমস্যার মূল। তাই তারা একনায়কতন্ত্রকে কবর দিয়ে গণতন্ত্রকে প্রসব করলেন। কিন্তু এতেও যখন ব্যাধির কিছু হলো না তখন সেই সমাধিস্থ মৃত একনায়কতন্ত্র ও ডিক্টেটরশীপকেই টেনে বের করলেন, অথচ দেখা গেল সমস্যা আরও বেড়েছে। তারা ফিরে এলেন আবার গণতন্ত্রের কাছে। আবার কখনো ঝুঁকে গেছে পুঁজিবাদের দিকে, কখনো কমিউনিজমের কাছে, আবার কখনো দ্বারস্থ হয়েছে সমাজতন্ত্রের। যন্ত্রণার ডাকে ছোটাছুটি করেছেন অনেক। কিন্তু বেদনার উপশম হয়নি এক বিন্দু। ব্যাধি যা ছিল তাই রয়ে গেল। কারণ সকল চিকিৎসাই ছিল ত্বকের ওপরে ওপরে। সমস্যার শিকড় কেউ স্পর্শ করতে পারেনি অর্থাৎ যে ব্যক্তি থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি সেই ব্যক্তির অসুস্থতা, বিপর্যয় ও পচন শোধরাবার চেষ্টা কেউ করেনি। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এই বাস্তবতা উপলব্ধ হয়নি যার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র রুগ্ন ছিল, রুগ্নই রয়ে গেছে।

অবশ্য আমি বলব, আমাদের এই বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদগণ যদি এই কঠিন সত্য উপলব্ধিও করেন, তারা যদি প্রকৃত রোগের সন্ধান পেয়েও বসেন, তবুও তারা এর চিকিৎসা করতে পারবেন না। মানলাম তাদের কাছে ইল্‌ম প্রচারের সকল মাধ্যম তাদের হাতে আছে। আর এই যুগটাও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের যুগ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তাদের হাতে সেই শক্তি নেই যা দ্বারা মানুষকে মন্দ থেকে ভালোর দিকে ও ধ্বংস থেকে সৃষ্টির দিকে নিয়ে যেতে পারবেন। কারণ তাদের মন, মেধা ও বিশ্বাসের কোথাও রুহানিয়াত ও আত্মিকতার ছোঁয়া নেই। তাদের অন্তরে ঈমান নেই। অন্তরের আত্মার কোন খোরাক তাদের কাছে নেই। হৃদয়ে ঈমানের বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থাও তাদের হাতে নেই। বান্দা ও প্রভুর মধ্যে বন্ধন স্থাপন করবার ক্ষমতা তাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। এই নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বর জীবনের সাথে, আত্মাকে বস্তুর সাথে, বিদ্যাকে চরিত্রের সাথে গ্রন্থিত করার ক্ষমতা তাদের নেই। আত্মিক দরিদ্রতা, অন্ধ বস্তুবিশ্বাস আর বিবেকের অসার অহংকার তাদেরকে এমন স্থানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ধ্বংস ও বিনাশের শেষ তীরটিও তাদের ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে যার অনিবার্য পরিণতি বিশ্বমানব পরিবারের ধ্বংস; এই পৃথিবী রূপান্তরিত হবে এক বিরান গ্রহে। আল্লাহ্ না করুন, যদি পৃথিবীর যুদ্ধবাজ শক্তিগুলো এই ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের মাঠে নেমে পড়ে তাহলে মানুষের নব সৃষ্টি এই আধুনিক অস্ত্রলীলা, সভ্যতা ও মানবতার কবর রচনা করে ছাড়বে!

রহমত রূপে রাসূল (সা.)

ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের কথা। তখন ব্যাপক হারে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি এই মানুষ আত্মহত্যার জন্য কেবল উদ্যতই ছিল না, বরং উন্মত্ত এক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। আত্মহত্যার প্রতি তাদের প্রবণতাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যেন এ আত্মহত্যাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া। আত্মহত্যার জন্যে সে যেন মানত করেছে, কসম খেয়েছে। সে কসম যেন কোনক্রমেই ভাঙা যাবে না! পবিত্র কুরআন সে ভয়াবহ পরিস্থিতিরই চিত্রাঙ্কন করেছে অত্যন্ত নিপুণভাবে, যে চিত্রাঙ্কন অসম্ভব কোন সুদক্ষ শিল্পী, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক কিংবা ঐতিহাসিকের পক্ষে।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا۔وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۔

"আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ। তোমরা অবস্থান করছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন।" [সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩]

ঐতিহাসিক ও জীবনচরিতকারদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন! জাহেলী যুগের সঠিক ও যথার্থ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতে তারা সক্ষম হননি। আসলে এজন্যে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাদের প্রতি আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ। কেননা তখনকার সেই অবর্ণনীয় ভয়াবহ ও সঙ্গীন পরিস্থিতির সঠিক চিত্রাঙ্কন কলমের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল ভাষা ও সাহিত্যের নাগালের বাইরে। সুতরাং একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে তার যথার্থ চিত্রাঙ্কন কিভাবে সম্ভব?

মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবকালে জাহেলী যুগের সমস্যা কি শুধু সামাজিক বিপর্যয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের সমস্যা ছিল? শুধু কি মূর্তি পূজার সমস্যা ছিল? শুধু কি মদ-জুয়া, অশ্লীলতা, নগ্নতা, জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়ের-অবিচারের সমস্যা ছিল? নাকি জালিম শাসকের জুলুম ও অর্থনৈতিক শোষণের সমস্যা ছিল? সে সমস্যা কি শুধু নিরপরাধ ও নিষ্পাপ নবজাত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার সমস্যা ছিল? না! বরং আসল সমস্যা ছিল গোটা মানবতাকে মাটি চাপা দিয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করার সমস্যা।

অন্ধকার যুগ পেরিয়ে গেছে। সে যুগের হিংস্র মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মাটির নিচে। সেই লোমহর্ষক চিত্র এখন দৃষ্টির অন্তরালে। এখন কি করে আমরা তার চিত্রাঙ্কন করব? কিভাবে তা অনুভবযোগ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলে ধরব? শুধু বলতে পারি, সে ছিল জাহেলী যুগ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পৃথিবী! সভ্যতা-সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন এক আঁধার দুনিয়া। সে যুগের সে পৃথিবীর বাসিন্দা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না সে যুগকে। উপলব্ধি করতে পারবে না সে যুগের ভয়াবহতাকে। কোন চিত্রশিল্পী যদি এখন একটি ছবি আঁকে, যাতে গোটা মানব জাতিকে এক দারুণ সুদর্শন ও দৃষ্টিনন্দন মানুষের আকৃতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সমস্ত সৃষ্টিলোকের ভেতরে যার সৌন্দর্যের অপূর্ব ঝলক নজরে পড়েছে, যাকে আল্লাহ খেলাফতের তাজ পাঠিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টিলোকের মাঝে, যার আগমনে এই উজাড় ও বিরান পৃথিবী পরিণত হয়েছে বসন্ত বিরাজিত উদ্যানে। অতঃপর চোখের সামনে ভেসে উঠল আরেকটি চিত্র। একটু আগের সেই মানুষটি ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হচ্ছে এক গভীর পরিখায় যেখান থেকে উদ্‌গিরণ হচ্ছে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত। ঝাঁপ দেবার জন্যে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, এক্ষুণি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কয়েক মুহূর্ত পেরুতে না পেরুতেই ঝাঁপিয়েও পড়ল। হারিয়ে গেল ভয়ংকর অন্ধকারে, অনন্ত মৃত্যু বিভীষিকায়। তাহলে সম্ভবত চিত্রশিল্পীর এই চিত্রাংকনে রাসূলের আবির্ভাবকালীন জাহেলী যুগের কিঞ্চিত চিত্র ফুটে উঠতে পারে। এই বাস্তবতার দিকে ইশারা করেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে অত্যন্ত সংক্ষেপে, অথচ ই'জাযপূর্ণভাবে ঃ

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا -

"আর তোমরা ছিলে জাহান্নামের এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে, সেখান থেকে তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।"

এই বিষয়টি নবুওয়াতের ভাষায় আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "আমার এই দাওয়াত ও হিদায়াতের উপমা যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল, যখন তার আলো আশপাশে ছড়িয়ে পড়ল তখন পোকা-মাকড় ও কীটপতঙ্গ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অনুরূপ তোমরাও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত আর আমি তোমাদের বাহু ধরে তোমাদেরকে বাঁচাতে চাই" (সহীহ বুখারী)। আসলে মানবতার কিশতিকে নিরাপদে পাড়ে ভিড়ানোই ছিল মূল সমস্যা। কেননা মানুষ যখন সঠিক অবস্থায় ফিরে আসবে, যখন তার জীবনে আসবে স্বস্তি, ভারসাম্য ও সঠিক চেতনাবোধ, তখন মানুষের স্থাপত্যশিল্প, উন্নয়নশীলতা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূর্তিমান হয়ে

বিকশিত হবে তাদের সামনে যাদের আছে যোগ্যতা, যারা মানবতার বন্ধু ও সাহায্যকারী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, গোটা মানবতাই নবী-রাসূলদের কাছে ঋণী। তাঁরাই তো মানবতাকে উদ্ধার করেছেন সেই মহাবিপদ থেকে, যা নাঙ্গা তলোয়ারের মত মানবতার মাথার ওপর এক চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল। দুনিয়ার কোন্ বিদ্যাপীঠ, কোন্ দর্শন এবং কোন্ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারবে? সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমান পৃথিবী ও সাম্প্রতিক বিশ্বও তাঁদের কাছে ঋণী। কারণ তাঁরা মানবতাকে উদ্ধার না করলে কে পেত জীবনের স্বাদ ও স্বাধীনতার সুখ? কেননা পরিস্থিতি এমন নাযুক আকার ধারণ করেছিল, মানুষ অবস্থার নীরব ভাষায় বারবার শুনিয়ে দিয়েছে, সে এই পৃথিবীতে বসবাসের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। তার হৃদয় এখন পাষাণ, দয়ামায়াশূন্য। মানবতার জন্য এখন সে বহন করে না কোন করুণা ও রহমতের পয়গাম। সে নিজের বিরুদ্ধে এখন নালিশ জানাচ্ছে মহাপ্রভুর আদালতে, সাক্ষ্য দিচ্ছে নিজের বিরুদ্ধে, চূড়ান্ত রায়ের জন্য মোকদ্দমার কাগজপত্র পুরা প্রস্তুত। এক কঠিন শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করেছে, বেছে নিয়েছে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। সভ্যতা-সংস্কৃতি যখন স্বাভাবিক সীমারেখা অতিক্রম করে, বিস্মৃত হয়ে পড়ে চারিত্রিক উৎকর্ষের কথা, বরং আরো এক ধাপ সামনে বাড়িয়ে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করে বসে চারিত্রিক উৎকর্ষের অবদানকে, যখন মানুষ গাফেল হয়ে যায় যাবতীয় মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে, যখন সে জাগতিকতাকে বুকে আঁকড়ে ধরে উপেক্ষা করে অন্য সব বাস্তবতাকে, যখন সে পাশবিকতার দিকচিহ্নহীন দিগন্তে লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়ায়, যখন সে সকল প্রকার মানবীয় গুণের বদলে হিংস্র জনপদের আকৃতি ধারণ করে, যখন তার মাঝে জন্ম নেয় এক কাল্পনিক উৎস, যখন সে স্বীকার করে নেয় নফসে আম্মারার পূর্ণ বশ্যতা, যখন মানবতাকে ঘিরে ফেলে পাগলামির ঘোর আচ্ছন্নতা, তখনই (মানবতার সেই মহাদুর্দিনে) অপারেশন ও অস্ত্রোপচার, সমূলে কেটে ফেলেন বিষাক্ত অংশ, দূর করে দেন পাগলামির নেশা। কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকৃতি ও বিলুপ্তি দেশ ও রাজ্য হারানোর চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়াবহ। এক দুর্বল রোগী যদি পাগল হয়ে যায়, তাহলে তার কারণে আশপাশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু একটু ভেবে বলুন তো, গোটা মানবতাই যদি পাগল হয়ে যায়, যদি ভেঙে যায় হাজার বছরের লালিত সভ্যতা-সংস্কৃতি, দলিত-মথিত হয়ে যায় মানবতা ও ইনসানিয়াতের সবুজ কোমল দূর্বাগুলো, তবে সীমা থাকবে কি অশান্তি ও নৈরাজ্যের?

সম্ভব হবে কি এর কোন চিকিৎসা?

বিশ্বাস করুন! জাহেলী যুগে সভ্যত-সংস্কৃতি ও সুস্থ নগর জীবনের ওপরই শুধু বিপর্যয়ের ধ্বস নেমে আসেনি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নগর জীবন পরিণত হয়েছিল এক বিকৃত গলিত লাশে। মানুষ মানুষকে শিকার করত হিংস্র নেকড়ের মত। তারপর তার হৃদয়হীনতার সামনে যখন সে মানুষটি মৃত্যুর সাথে লড়াই করত, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করত তখন এই অমানবিক করুণ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও মজা লুটত তার নিষ্ঠুর দৃষ্টি, পাষাণ হৃদয়, ঠিক সেভাবে যেভাবে আমাদের কারো হৃদয় ফুল বাগান ও গাছপালার মনোরম দৃশ্যে ও ছায়া-ঘেরা পরিবেশে আনন্দে উদ্বেল হয়।

এবার দৃষ্টি ফেরান রোমান ইতিহাসের দিকে। দেখবেন তাদের বিজয় গাথা ও বীরত্বের ইতিহাস আলো ঝলমল। মন কেড়ে নেয় তাদের সুচারু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ রাজ্য পরিচালনা। সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও পিছিয়ে নেই তারা। কিন্তু অপর দিকে কেমন করে তাদের অমানবিকতা ও নিষ্ঠুর চিত্র তুরে ধরেছেন একজন ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক তাও একটু পড়ে দেখুন ঃ

"রোমানদের কাছে সবচেয়ে বেশি মজাদার ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হতো সেটি, যখন তরবারির যুদ্ধে দুই স্বগোত্রীয় পাহলোয়ানের মধ্যে পরাজিত ব্যক্তি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তে লাল হয়ে ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে আর তার মুখ থেকে শেষবারের মত উচ্চারিত হতো মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের ব্যথা করুণ গোঙানি। তখন তাদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না। মনে হতো তারা যেন তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এই মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে মজাদার দৃশ্য অবলোকন করছে। হাসি-উল্লাসের বিকৃত ধ্বনি তুলে তারা একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত আনন্দের আতিশয্যে। এই মৃত্যু পথযাত্রী অসহায় মানুষটির গোঙানি তাদের কানে যেন মধু ঢালছে অপূর্ব সংগীতের সুর লহরীর মত! এদিকে শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিস বাহিনীর কিছুই করার থাকত না। সব কিছু বেসামাল হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত।"[১]

মোটকথা তখন মানুষ ছিল না, ছিল মানুষের খোলস। মানবতার মোকদ্দমা চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় ছিল আল্লাহ্‌র আদালতে। ঠিক তখনই প্রেরিত হলেন মুহাম্মদ (সা.) আর ঘোষণা এল ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -

"হে নবী! তোমাকে আমি জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

১. দ্র. Ko. Lecky প্রণীত History of European Morals.

মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাব ঃ এক নতুন পৃথিবী

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগ ও আগামী দিনের অনাগত যুগ সম্পূর্ণরূপে মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব, তাঁর ব্যাপকভিত্তিক চিরন্তন দাওয়াত ও তাঁর চেষ্টা, সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কাছে ভীষণভাবে ঋণী। তিনিই নাঙ্গা তলোয়ারের নিচ থেকে মানবতাকে উদ্ধার করেছেন। অতঃপর মানবতার হাতে তুলে দিয়েছেন এক নতুন উপহার যা মানবতাকে দান করেছে এক নতুন জীবন, নতুন উদ্যম, নতুন শক্তি, নতুন সম্মান ও নতুন করে পথ চলার হিম্মত ও পাথেয়, আর সেই উপহারের বদৌলতেই মানবতা তাহযীব-তমদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সর্বোপরি ন্যায়নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতা এবং চরিত্র ও সমাজ দর্শনের মাপকাঠিতে নতুন করে মানুষ গড়ার কত হাজারো মঞ্জিল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা এখন ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মুহাম্মাদী (সা.) অবদানের কথা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করব যা মানব জাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, সংশোধন ও সংস্কারের পথ বাতলে দিয়েছে, গোটা মানব সম্প্রদায়ের মাঝে জাগ্রত ব্যবস্থা, ফেলে আসা পৃথিবীর সাথে কোন কিছুতেই যার বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুস্পষ্ট তাওহীদের আকীদা

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ও অনুগ্রহ এই, তিনি দুনিয়াকে দান করেছেন তাওহীদের আকীদা। স্বচ্ছ, পবিত্র ও নজীরবিহীন এক বিপ্লবী আকীদা। এই আকীদা শক্তি ও বিশ্বাসে ভরা জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হয়। এই আকীদা পাল্টে দেয় সব প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি, বিনাশ করে দেয় বাতিল প্রভুদের রাজত্ব।

এই আকীদা আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে কেউ দিতে পারেনি, পারবে না কেয়ামত পর্যন্ত। এই মানুষের ইতিহাস এক দীর্ঘ ইতিহাস; কাব্য, দর্শন, রাজনীতিতে যার রয়েছে প্রভূত দাবি-দাওয়া, যে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে অসংখ্যবার গোলাম বানিয়েছে, যে মরুর বুকে পাথুরে জমিনের বুক চিরে বইয়ে দিয়েছে কত ছলছল ঝর্ণাধারা, মাঝে মাঝে আবার দাবি করে বসেছে প্রভুত্বেরও। এই মানুষ মাথা ঠেকাত অতি সামান্য জড় বস্তুর সামনে, যার নেই উপকার কিংবা অপকার করার কোন ক্ষমতা এবং দেয়া ও ছিনিয়ে নেয়া ছিল যার পক্ষে অসম্ভব।

وان يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ـ

নিজ হাতে গড়া মূর্তিপূজা করত তারা, ভয় করত সেই মূর্তিকে, মঙ্গল কামনা করত তার কাছে। এই মানুষ জাহেলী যুগে পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, গাছপালা, জীবজন্তু, আত্মা-প্রেতাত্মা, মানুষ ও শয়তানের সামনেই শুধু সেজদায় লুটিয়ে পড়ত না, বরং ছোট্ট কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত তার আরাধ্যে পরিণত হয়েছিল। তার জীবন কাটত অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনায়, অবাস্তব ধ্যান-ধারণায়, নিরর্থক আশা-আকাঙ্ক্ষায় যার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল কাপুরুষতা ও দুর্বলতা, চিন্তা-চেতনার দৈন্য ও মানসিক অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাসশূন্যতা ও অস্থিতিশীলতা। তখনই এলেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) দান, করলেন তাদেরকে স্বচ্ছ-সুন্দর পবিত্র সাহস ও হিম্মতভরপুর জীবন ও শক্তি সঞ্চারী এক আকীদা! তাওহীদের আকীদা।

নিষ্কৃতি পেল তারা তাগূতের ভয় ও শংকা থেকে। তারা এখন ভয় করে শুধু আল্লাহকেই। জন্ম নিয়েছে তাদের অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস, উপকার ও অপকার এবং দেয়া ও ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর, শুধু তিনিই পারেন মানুষের প্রয়োজন পুরা করতে। তাদের কাছে পৃথিবীকে এখন আর আগের মত মনে হয় না। তাওহীদের এই নতুন আবিষ্কার ও এই নতুন পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সব কিছুই এখন তাদের সামনে বদলে গেছে। দাসত্বের শৃংখল থেকে তারা আজ মুক্ত ও স্বাধীন। তাদের হৃদয়ে নেই সৃষ্টির ভয়, নেই সৃষ্টির কাছে তাদের কোন চাওয়া ও পাওয়া। তাদের হৃদয় জুড়ে আজ প্রশান্তি আর প্রশান্তি! তাদের চিন্তা-চেতনায় আর কোন গোলমাল নেই। সৃষ্টিলোকের ভেতরে নিজের অবস্থান সম্পর্কে আজ তারা পূর্ণ সচেতন। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তারাই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, পৃথিবীর সরদার ও আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। প্রতিপালকের অনুসরণ ও মানবতার সেবার ভেতরেই আজ তারা খুঁজে পায় আপন অস্তিত্বের সার্থকতা। মহান স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নই এখন তাদের মহান দায়িত্ব ও একমাত্র ব্রত, যার ভেতর নিহিত রয়েছে মানবতার চিরন্তন বিজয় ও সাফল্য, দীর্ঘকাল ধরে যা থেকে পৃথিবী ছিল বঞ্চিত।

মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পর সারা পৃথিবী জুড়ে গুঞ্জরিত হলো তাওহীদের আকীদা (অথচ ইতোপূর্বে এই আকীদাই ছিল পৃথিবীর অন্যান্য আকীদার চেয়ে সবচেয়ে বেশী মজলুম ও অপরিচিত), পৃথিবীর সমস্ত দর্শন, মতবাদ, চিন্তা ও ভাবধারার ওপর বিরাট প্রভাব পড়ল এই নতুন আকীদার।

যে সব বড় মাযহাব বা ধর্ম শির্‌ক ও একাধিক উপাস্যের স্লোগানে মুখর ছিল, শেষ পর্যন্ত আকীদায়ে তাওহীদের প্রভাবে অনুচ্চ কণ্ঠে ও ফিসফিস করে হলেও এই নতুন আকীদার প্রভাবে তাদেরকে এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে, "আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই।" শুধু তাই নয়, রাতারাতি তারা শির্‌কের অপবাদ থেকে বাঁচার জন্যে নিজেদের শির্‌কী মতবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যার আশ্রয়

নিতে লাগল এবং তাকে আকীদায়ে তওহীদের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধানের কসরত চালাতে লাগল। ধর্মগুরুরা শির্কের কথা মুখে আনতে বেশ লজ্জাবোধ করতে লাগলেন। তখন সারা শির্কী পদ্ধতির ধারক-বাহকগণই চিন্তা-চেতনায়, বিশ্বাস ও অনুভূতিতে হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছিল। তাই মুহাম্মদ (সা.)-এর আকীদায়ে তাওহীদের এই উপহার ছিল বিশ্বমানবতার জন্য সবচেয়ে দামী উপহার।

ঐক্য ও সাম্য

নবীজীর দ্বিতীয় অনুগ্রহ এই, শতধাবিচ্ছিন্ন ও বহুধাবিভক্ত মানব সম্প্রদায়কে ঐক্য ও সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর আগমনের পূর্বেকার চিত্র একটু কল্পনা করুন। এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। সবার মাঝে সম্পর্কহীনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে। জাতীয়তাবাদ বন্দী হয়ে আছে সংকীর্ণতার নিগড়ে। পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবধান ও পার্থক্য ছিল মানুষ ও প্রাণী, স্বাধীন ও গোলাম এবং আব্দ ও মা'বূদের সম্পর্কের ব্যবধান ও পার্থক্যের মত। তখন একতা ও সাম্যের কোন ধারণাই তাদের ছিল না। তারপর নবীজী সবাইকে শুনিয়ে দিলেন সুদীর্ঘ কালের নীরবতাকে ভেঙে দিয়ে এবং স্তরে স্তরে জমে থাকা অন্ধকারকে ভেদ করে সেই বিপ্লবী ঘোষণা, যা হতবাক করে দিল মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আর পরিস্থিতি মোড় নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে।

ايها الناس ان ربكم واحد وإن اباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب - ان اكرمكم عند الله اتقاكم - وليس لعربى على عجمى فضل الابالتقوى -

"হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতৃপুরুষও এক। তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে। কোন অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোন আরবের কেবল তাকওয়া ছাড়া।" [কানযু'ল উম্মাল]

এই ঘোষণার রয়েছে দু'টি দিক যার ওপর নির্ভর করে শান্তি ও নিরাপত্তা সর্বকালে সর্বস্থানে। একটি হলো, আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। আর দ্বিতীয় হলো, মানুষের উৎসস্থল এক—অদ্বিতীয়। সুতরাং মানুষের ভাই দুই দিক থেকে। প্রথমত, তাদের প্রতিপালক এক আর এটিই মূল। দ্বিতীয়ত তাদের পিতৃপুরুষ এক।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

"হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভিক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ—সব কিছুর খবর রাখেন।"

বিদায় হজ্জের বিশাল জনসমুদ্রে নবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এই চিরন্তন বাণী।

সত্যি কথা বলতে কি, নবীজী যখন এই মহান ঐতিহাসিক ঘোষণা শোনানোর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তখন এই স্পষ্ট ও বিপ্লবী ঘোষণা শোনার জন্যে পৃথিবীর একেবারেই 'মুড' ছিল না। কেননা ভূমিকম্প থেকে এই ঘোষণা মোটেই কম বিধ্বংসী ও কম মারাত্মক ছিল না। কারণ কিছু কিছু জিনিস এমন যার প্রতিক্রিয়া আমরা ধীরে ধীরে সয়ে নিতে পারি অথবা আড়ালে থাকার কারণে কোন প্রতিক্রিয়াই অনুভূত হয় না। যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের কথাই ধরুন। আমরা যদি সরাসরি তা স্পর্শ করি তাহলে নিমিষেই আমাদেরকে ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে আর যদি আবরণের ওপর দিয়ে স্পর্শ করি তাহলে কোন বিপদাশংকাই নেই, আজ মানুষ পেরিয়ে এসেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং চিন্তা ও গবেষণার এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা। কিসের বদৌলতে? ইসলামী দাওয়াতের বদৌলতে, সর্বজনীন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বদৌলতে, ইসলামের অগণিত দাঈ, সংস্কারসেবী ও প্রশিক্ষণদাতাদের হাজারো ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানীর বদৌলতে। এসব কিছুর বদৌলতেই আজ এই বিপ্লবী ও ব্যতিক্রমী ঘোষণা নিত্যদিনের বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে, যে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই আজ জাতিসংঘের মঞ্চ থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্যাপী সর্বত্রই ধ্বনিত হচ্ছে মানবাধিকার ও সাম্যের কথা। এই বাস্তবতার কথা আজ কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় একটু নজর দিলে দেখা যায়, পৃথিবীতে প্রাক-ইসলামী যুগে এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল আসমান-যমীন। কোন কোন বংশ নিজের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছিল চন্দ্র-সূর্যের সাথে, কেউ বা আবার স্বয়ং আল্লাহর সাথে।

تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ـ

আল-কুরআন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে ইয়াহূদী-নাসারাদের ভ্রান্ত আকীদার কথা এভাবে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ـ

"মিসরীয় ফেরাউনরা নিজেদেরকে সূর্য দেবতার অবতার বলত আর হিন্দুস্তানের কতিপয় সম্প্রদায় নিজেদেরকে বলত সূর্য বংশ ও চন্দ্র বংশ। ইরানী বাদশাহগণ (যাদের উপাধি ছিল কিসরা) দাবি করত, তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রয়েছে খোদায়ী শোণিত ধারা। ইরানীদের কাছে তাদের গুণাবলী এভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, "উপাস্যদের মধ্যে রয়েছে এমন মানুষ যার কোন বিলুপ্তি নেই এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে এমন উপাস্য যার কোন দ্বিতীয় নেই। সমুচ্চ হোক তার কথা, উন্নত হোক তার সম্মান ও মর্যাদা! তিনি সূর্যের সাথে উদিত হন সূর্যালোক হয়ে আর ছাপিয়ে তোলেন অন্ধকার রাতকে উজ্জ্বল আলোকমালায়।"

অনুরূপ রোম সম্রাটদের মধ্যেও হতো অনেক 'ইলাহ'। তাদের যিনিই মসনদে আসীন হতেন, তিনিই তথাকথিত 'ইলাহ'-এ পরিণত হয়ে যেতেন আর তার 'লকব' হত August আর চীনারা নিজেদের অধিপতিদেরকে মনে করত ইবনু'স-সামা—আসমানের পুত্র বলে। তাদের ধারণা ছিল, আসমান পুরুষ ও যমীন নারী আর এই দুইয়ের সম্মিলনেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিলোক।

আরবরা নিজেদের ছাড়া অন্য সবাইকে ভাবত 'আজম'। কুরায়শরা মনে করত তারাই আরব গোত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। তারা সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলত। কোন আনুষ্ঠানিকতায়ই অন্য কোন গোত্রের সাথে তারা অংশ নিত না। হাজীদের সাথে প্রবেশ করত না আরাফাতে, বরং হারামে থেকে যেত এবং মুযদালিফায় অবস্থান করত আর বলত ঃ আমাদের কথা ভিন্ন। আমরা আহলুল্লাহ।

মানুষের সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা

মানব জাতির প্রতি রাসূলে আরাবির তৃতীয় অনুগ্রহ এই, তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন মানবতার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের শিক্ষা। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ ও মানবতা অপমান ও লাঞ্ছনার এক দুর্বিষহ জীবনের ওপর দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে গুণছিল নাজাত ও মুক্তির প্রহর। এই মানুষের চেয়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত, ধিকৃত

ও অবহেলিত কোন জীব আর পৃথিবীতে ছিল না। দেবতা মনে করে যে সব জীব-জানোয়ার ও গাছপালার পূজা করা হতো কিছু মনগড়া বিশ্বাস ও অনুভূতিকে কেন্দ্র করে, সেগুলো পর্যন্ত ছিল এই মানুষের চেয়ে অধিক মূল্যবান, সম্মানিত ও সুরক্ষিত। শুধু তাই নয়, এসব কল্পিত উপাস্যদের জন্য অনেক নিষ্পাপ মানুষকে বলি দেয়া হতো। তাদের তাজা খুন-গোশত পেশ করা হতো নৈবেদ্য হিসেবে দেবতাদের সামনে, তবু তাদের হৃদয় একটু কাঁপত না। তাদের পাষাণ হৃদয়ে উদ্রেক হতো না সামান্য মানবতাবোধ। কেনই-বা বলছি সেই চৌদ্দ শ' বছর আগের কথা। বিংশ শতাব্দীর এই সভ্য যুগেও তো হিন্দুস্তানসহ সভ্য হিসেবে কথিত দেশগুলোতে আমরা দেখে চলেছি এমন জঘন্য, বর্বর, লোমহর্ষক ও অমানবিক সব চিত্র।

তখন সেই জাহেলী যুগে এলেন আল্লাহর নবী। উদ্ধার করলেন মানবতাকে অপমান ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে, ফিরিয়ে দিলেন গৌরব ও হারিয়ে যাওয়া সম্মান-মর্যাদা, ফিরিয়ে দিলেন তার আত্মসম্মানবোধ ও গ্রহণযোগ্যতা। দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ এই পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড় ও মহান আর কিছু নেই। মানুষ সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। প্রেম-ভালবাসা পাওয়ার অধিক হকদার অন্য কিছু নয়, কেবল মানুষ।

মানুষই হেফাজতের অধিক দাবিদার। আল্লাহ্ নিজে বাড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান। ফলশ্রুতিতে এই মানুষই অর্জন করেছে তার খলীফা ও প্রতিনিধি হওয়ার গৌরব।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

"তিনি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে।" মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সমস্ত সৃষ্টির নেতৃত্ব দেয়ার ও সভাপতিত্ব করার অধিকার একমাত্র মানুষের।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ـ

"নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি। তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" মানুষের সম্মান ও মাহাত্ম্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আছে আল্লাহর নবীর এই বাণী ঃ

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهِ -

"সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই প্রিয়তম যে তার পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ করে।"

সামনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর যে হাদীসটি বিধৃত হচ্ছে মানবতার মাহাত্ম্যের ওপর এত বড় দলীল ও মানবতার সেবায় নিজেকে পেশ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এত বড় প্রমাণ আর নেই। লক্ষ্য করুন হাদীসের কথা ও মর্ম। তিনি বলেন ঃ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা-যত্ন করনি।" বান্দা আরজ করবে, "হে আল্লাহ্! এ কেমন করে সম্ভব! আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" তিনি বলবেন, "তুমি কি জান না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা-যত্ন করনি? তার পাশে দাঁড়ালে সেখানে তো তুমি আমাকেই পেতে।"

"হে আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে অন্ন দাওনি।" বান্দা তখন আরজ করবে, "প্রভু হে! কিভাবে সম্ভব, আপনি তো রাব্বু'ল আলামীন!" আল্লাহ্ বলবেন, "আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল। তুমি তাকে খেতে দাওনি। তোমার কি জানা ছিল না, তাকে খাওয়ালে আমাকে কাছে পেতে?" "হে আদম সন্তান! আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তোমরা আমায় পানি দাওনি।" বান্দা আরজ করবে, "হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আপনাকে পান করাব? আপনি যে তৃষ্ণা থেকে পবিত্র?" আল্লাহ্ বলবেন, "আমার অমুক বান্দা পিপাসার্ত ছিল, তুমি তার পিপাসা নিবারণ করনি। তোমার কি জানা ছিল না, তার পিপাসা মেটালে তা আমার কাছে পেতে?"

মানবতার মাহাত্ম্যের ও তার উন্নত অবস্থানের সাক্ষ্য বহনকারী এই ঘোষণার চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও পরিষ্কার কোন ঘোষণা কি কল্পনা করা যেতে পারে? এমন উন্নত অবস্থান ও মহান মর্যাদা মানুষ কি লাভ করতে পেরেছে সে কালের কিংবা এ কালের কোন ধর্ম দর্শনের অনুসারী হয়ে? নজীর আছে কি? আল্লাহর রহমত লাভ করতে হলে সৃষ্টিলোকের ওপর রহম করতে হবে। আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন ঃ

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء -

"যারা রহম করে তাদের প্রতিই রহমানের রহমত বর্ষিত হয়। পৃথিবীতে যারা আছে তোমরা তাদের প্রতি রহম কর, তবে আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করবেন।" একটু ভেবে দেখুন তো, ইসলাম-পূর্ব যুগে মানবতার এই মুক্তি সংগ্রামে, মানুষের মাঝে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এই জিহাদে বের হওয়ার পূর্বে কি ছিল পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি? একজন মানুষের কিছু মাতাল ইচ্ছার মূল্য ছিল হাজার হাজার প্রাণের চেয়েও বেশি। একেকজন রাজ্যপাল ও সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট বের হতো আর দেশকে দেশ কব্জা করে সেখানে বইয়ে দিত অমানবিকতার ঝড়ো হাওয়া। তাদের ইচ্ছার কাছে কত আযাদ মায়ের আযাদ সন্তানদের নিমিষেই বরণ করে নিতে হতো গোলামী-পরাধীনতার শৃংখল।

আলেকজান্ডার শুরু করল অভিযান যেন কাবাডি খেলতে খেলতে হিন্দুস্তান পর্যন্ত পৌঁছে গেল আর চলতি পথে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল কত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বেরিয়ে এল সিজার হিংস্র শ্বাপদের জিঘাংসা নিয়ে আর 'কাবার' করে দিল কত মানুষের ছন্দময় জীবন।

এই আমাদের চোখের সমানেই তো ঘটে গেল দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়কাণ্ড! এই যুদ্ধ দু'টোর তাণ্ডবলীলায় স্তব্ধ হয়ে গেছে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের জীবন স্পন্দন।

জাতীয়তাবাদের মিথ্যা বড়াই, রাজনৈতিক অহংকারবোধ, ক্ষমতা লিপ্সা ও বিশ্ব বাজারের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের উদগ্র বাসনাই কি এই যুদ্ধ টেনে আনেনি?

হৃদয়ে হৃদয়ে ছেয়ে গেল আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধের দীপ্তি!

আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে মানুষ নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তাদের মাঝে জন্ম নিয়েছিল 'নিখুঁত মানব প্রকৃতি' সম্পর্কে এক রকম পাপবোধ। এই ধারণা মানুষের মনে বেশ ভালভাবেই ঠাঁই করে নিয়েছিল, মানুষ জন্মগতভাবেই পাপী ও অপরাধী।

মূলত মানুষের নিখুঁত মানব-প্রকৃতি ও সুকুমার বৃত্তির এই দৈন্যদশা সৃষ্টি হওয়ার জন্যে কাজ করছিল যুগপৎ এশিয়ার কয়েকটি প্রাচীন ধর্ম এবং ইউরোপ, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বিকৃত খ্রীস্ট ধর্ম। হিন্দুস্তানের প্রাচীন ধর্মগুলো মানুষের সামনে পেশ করেছিল 'তানাসুখ'-এর দর্শন আর খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছিল এই স্লোগান, "মানুষ আসলে জন্মগতভাবেই পাপী আর ঈসা মাসীহ হলেন তাদের পাপের কাফ্ফারা ও প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ।"

এই জঘন্যতম আকীদা দু'টোর প্রসার ঘটিয়ে তৎকালীন দুনিয়ার সে আকীদার অনুসারী লাখো কোটি মানুষকে আপন সত্তা ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভীষণভাবে সন্দিহান করে তোলা হয়েছিল এবং তাদের ভবিষ্যত, পরিণাম-ফল ও আল্লাহর রহমত লাভের আশা-ভরসাকে তাদের মন থেকে মুছে দেয়া হয়েছিল। তখনই মুহাম্মদ (সা.) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি একটি নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ফলকের ন্যায়, আগে যাতে ছিল না কোন ধরনের লেখা ও চিহ্ন। পরবর্তীতে মানুষ তাতে আঁকে চোখ জুড়ানো সব নকশা ও চিত্র অর্থাৎ মানুষ নিজেই উদ্বোধন করে তার জীবন। আগামী দিনের কর্ম বিচারেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে, আপন কর্মগুণেই তার বিচার হবে। সে হবে জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী। অন্যের কর্মের ব্যাপারে সে মোটেই দায়ী নয়। পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় এই কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে, মানুষ কেবল নিজের কর্ম সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে।

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ـ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ـ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ـ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى ـ

"কিভাবে আছে যে, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।"
[সূরা নজম, আয়াত–৩৮]

১। তানাসুখ (জন্মান্তরবাদ) ঃ হিন্দুদের মাঝে ও প্রাচীন ধর্মের অন্য অনুসারীদের মাঝে প্রচলিত একটি 'আকীদা' যার মূল কথা হলো, মানুষের মৃত্যুর পর তার রূহ বা আত্মা অন্য প্রাণীর রূপ পরিগ্রহ করে। আর এই রূপান্তর ঘটে থাকে মৃত ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের শাস্তি কিংবা পুরস্কার হিসেবে। তবে যে প্রাণীতে মানুষের রূহ স্থানান্তরিত হবে তা মৃতের চেয়ে মর্যাদায় বড়ও হতে পারে, আবার ছোটও হতে পারে।

স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে এই ঘোষণা আবার ফিরিয়ে আনল তার হারানো বিশ্বাস ও অনুভূতি। ফলে সে এগিয়ে গেল সমুখপানে—দৃঢ়প্রত্যয়ী সংকল্প নিয়ে, বীরত্বব্যঞ্জক উদ্যমী মনোভাব নিয়ে, এগিয়ে গেল নির্ভীক ও নিঃশংক হয়ে, মানবতার এক নতুন পৃথিবী আবাদ করার লক্ষ্য নিয়ে। সুযোগের সদ্ব্যবহারে এখন সে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত নয়, সন্দিগ্ধ নয়। মুহাম্মদ (সা.) অপরাধ ও গোনাহকে ভুল-ত্রুটি ও পদস্খলনকে মানুষের জীবনের একটি আকস্মিক অবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন যাতে সে লিপ্ত হয়ে পড়ে কখনো অজ্ঞতাবশত, কখনো

অসতর্কতাবশত, আবার কখনো বা শয়তানের ধোঁকার শিকার হয়ে। নইলে সততা, সততার যোগ্যতা, অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া মানব স্বভাবের প্রকৃত দাবি ও ইনসানিয়াতের অলংকার। কোন ভুল হয়ে গেলে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাওয়া, পুনর্বার তা না করার দৃঢ় সংকল্পে বুক বাঁধা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ, তার মৌলিকত্বের বড় নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশ, সর্বোপরি তা হযরত আদম (আ.)-এর উত্তরাধিকার।

মুহাম্মদ (সা.) গোনাহগার ও পাপীদের সামনে, পাপাচার ও অনাচার ও অনাচারে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের সামনে খুলে দিয়েছেন তওবার এক প্রশস্ত দরজা। ব্যাপকভাবে ডেকেছেন তাদেরকে তওবার দিকে। তুলে ধরেছেন তাদের সামনে তওবার ফযীলত ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা, যে বিস্তৃতি উপলব্ধি করে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তিনি দ্বীনের এই বিশেষ ও মহান রুকনটিকে উম্মতের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাই তাঁর অন্যান্য সুন্দর নামের মধ্যে একটি নাম হলো نبى التوبة (তওবার নবী)। কেননা বিগত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুনাহ-খাতার জন্য একমাত্র বাধ্যতামূলক পন্থা হিসেবেই শুধু মানুষকে তিনি তওবার দিকে ডাকেন নি, বরং তওবার মান ও মাহাত্ম্যকে তুলে ধরেছেন উম্মতের সামনে। ফলে তওবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে 'বিলায়াতে'র দরজা লাভ করার জন্য এক শ্রেষ্ঠ ইবাদতে পরিণত হয়ে গেছে, অথচ এই বিলায়াতই আবেদ-যাহিদ-এর কাছেও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের নিকট চিরকালের ঈর্ষা করার জিনিস।

আল-কুরআনেও আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন তওবার ফযীলত ও তাঁর রহমতের বিস্তৃতির কথা। তওবা করলে গোনাহগারের গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে এমন চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অবাধ্য ও গোনাহগার বান্দাদেরকে, কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে যুদ্ধে হেরে যাওয়া হৃদয়গুলোকে আল্লাহর রহমতের দামান আঁকড়ে ধরার এবং দয়া ও করুণার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এমনভাবে ডেকেছেন এবং তাঁর তরংগায়িত ও সর্বব্যাপী রহমতকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় আল্লাহ্ পাক শুধু সহনশীল, দয়ালু ও দানশীলই নন, বরং তিনি ভীষণ ভালোবাসেন (যদি আমার এই প্রকাশভঙ্গী ঠিক হয়) তওবাকারীদেরকে।

এবার পড়ুন কুরআনের আয়াতগুলো, অনুধাবন করুন তাঁর দয়া, করুণা ও মহব্বতের সেই নিঃসীমতা, যা আয়াতের শব্দে ঝরে ঝরে পড়েছে, আলো ছড়াচ্ছে।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু"।
[সূরা যুমার, আয়াত-৫৩]

অপর এক আয়াতে গুনাহ্গার পাপী মানুষের উল্লেখ প্রসংগে নয়, বরং অত্যন্ত শক্তিশালী, উত্তম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জান্নাতী মানুষের আলোচনা প্রসঙ্গে গুনাহ থেকে তওবাকারী মানুষের উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ -

"তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ সৎ কর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন এবং যারা কোন অশ্লীল কার্য করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না।

"ওরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত যার পাদদেশ নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং সৎ ক্রাকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!"

এই আয়াতের চেয়েও আরো চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি চোখে পড়ে নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ্ এই আয়াতে তাঁর পুণ্যবান বান্দাগণের এক নূরানী তালিকা তৈরি করেছেন আর তা উদ্বোধন করেছেন আবেদ-যাহিদের বদলে তওবাকারীদের দিয়ে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

"তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগুযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদ-কারী, রুকূ ও সেজদা আদায়কারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী ও আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হিফাজতকারী (এরাই মু'মিন) এবং (হে পয়গাম্বর!) আপনি মু'মিনদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"
[সূরা তওবা, আয়াত ১১২]

গোনাহ করার পর তওবাকারী ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তার যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয় তা ফুটে উঠেছে তাবূক যুদ্ধে কোন সংগত কারণ ছাড়াই পিছিয়ে পড়া তিন সাহাবীর তওবা কবুল করার কুরআনী ঘোষণায়। আয়াতে উক্ত তিন সাহাবীর আলোচনার আগে খোদ আল্লাহর নবী ও সেই সব আনসার-মুহাজিরের আলোচনাও করা হয় যারা তাবূক অভিযানে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তারপর যুদ্ধে পিছিয়ে পড়া তিনজনের কথা উল্লেখ করা হয়। কারণ হলো, এই তিনজন যাতে একাকিত্ব অনুভব না করেন এবং কোন প্রকার হীনমন্যতা ও নীচ অনুভূতি তাদেরকে কষ্ট না দেয় আর দুনিয়াবাসীর কাছেও যাতে কেয়ামত পর্যন্ত এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, এই তিনজনও সেই মুবারক জামাতেরই সদস্য। সুতরাং লজ্জার কিছু নেই।

আছে কি ধর্ম, চরিত্র, প্রশিক্ষণ ও সংস্কার-সংশোধনের কোন ইতিহাসে তওবা করার এমন চিত্তাকর্ষক, সুন্দর, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী কোন নমুনা? এবার লক্ষ্য করুন কুরআনী আয়াত ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَّعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ - ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوا-اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

"আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে অনুগমন করেছিল যখন তাদের একদলের চিত্তবৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি; নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(সূরা তওবা ঃ আয়াত ১১৭-১১৮)

আল্লাহ্ আরো ঘোষণা করেছেন, তাঁর রহমত সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে ঃ

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ-

"আমার রহমত প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত" (সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৬)।

এক হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

ان رحمتى سبقت غضبى -

"নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী।"

আল্লাহ্ নৈরাশ্যকে কুফুরী, মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার শামিল হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, হযরত ইয়া'কূব (আ.)-এর ভাষায় ঃ

انه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون -

অন্যত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ -

"পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কে নিরাশ হয়?"

[সূরা হিজ্‌র ঃ আয়াত-৫৬]

এভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) তওবার ফজিলত বর্ণনা করে এর প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করে ঘোষণা করলেন আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার কথা এবং আল্লাহর ক্রোধ ও জালালিয়াতের ঘোষণা ও তার বিস্তৃতিতে ভীতসন্ত্রস্ত, নিরাশ ও হতোদ্যম হৃদয়গুলোকে শোনালেন এক নতুন জীবনের পয়গাম। হতাশাঘেরা জীবনে সঞ্চার করলেন এক নতুন স্পন্দন, নতুন তৎপরতা। লাঞ্ছনা ও অভিশপ্ত দুনিয়ার আঁধার থেকে বের করে তাদেরকে নিয়ে গেলেন সম্মান-মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপনের এক আলোকোজ্জ্বল নতুন পৃথিবীতে।

সমন্বয় সাধনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

প্রাচীন ধর্মগুলো, বিশেষত খ্রীস্ট ধর্ম মানব জীবনকে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল ঃ দীন ও দুনিয়া। আর ভূমণ্ডলকে ভাগ করেছিল দু'টি স্তরে। এক স্তরে কিছু সংখ্যক মানুষ মশগুল থাকবে কেবল দ্বীন নিয়ে, অপর দিকে কিছু লোক ব্যস্ত থাকবে শুধু দুনিয়া নিয়ে।

এই দু'টি স্তর শুধু পরস্পর বিচ্ছিন্নই ছিল না, উভয়ের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিরাট বাধা ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এক দলের সাথে আরেক দলের কোন যোগাযোগ ও মিল ছিল না, বরং পারস্পরিক যুদ্ধ-কলহ ও হানাহানির এক সিলসিলা বিদ্যমান ছিল, বিরাজমান ছিল একে অপরের রক্তে হাত লাল করার এক উন্মত্ত জিঘাংসা। এদের প্রত্যেকেই দ্বীন-দুনিয়ার একত্রীকরণ ও সহাবস্থান অসম্ভব মনে করত। তাই যখনই কোন মানুষ এই দু'টি পক্ষের কোন একটিকে গ্রহণ করতে চাইত অপরিহার্যভাবেই তখন তাকে অপর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন হয়ে পড়তে হতো, বরং অপর পক্ষের বিরুদ্ধে তাকে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করতে হতো। এ যেন একই সঙ্গে দুই নৌকায় পা রাখা! দুনিয়াদারদের মনোভাব ছিল এই, আসমান যমীনের স্রষ্টার দিক থেকে মুখ না ফেরালে ও পরকাল সম্পর্কে বেখবর না হলে অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধন ও সমৃদ্ধি সাধন কোনভাবেই সম্ভব নয়। মন থেকে আল্লাহর ভয় না তাড়ালে এবং নৈতিক, চারিত্রিক ও দ্বীনী শিক্ষা বর্জন না করলে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতাই টিকে থাকতে পারে না।

আর অপর দল মনে করে, "বৈরাগ্যবাদকে আঁকড়ে না ধরলে এবং দুনিয়ার সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন না করলে দ্বীনদার হওয়ার প্রশ্নই আসে না।" বলা বাহুল্য, যা কিছু সহজ মানুষ তাই পছন্দ করে এবং প্রকৃতিগতভাবে তা মেনে নিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। দ্বীনের অর্থ যদি এই হয়, দুনিয়ার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ থেকে মোটেই ফায়দা হাসিল করা যাবে না, তবে তা মানব প্রকৃতির সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ হতে পারে না, বরং তা হবে নির্দোষ ও নির্মল মানব প্রকৃতিকে গলা টিপে হত্যা করার শামিল। আর দ্বীনের এই তথাকথিত ব্যাখ্যার পরিণতিতেই তৎকালীন যুগের সভ্য, ধীমান, যোগ্য ও শিক্ষিত সমাজের একটি বিরাট অংশ দ্বীনের পরিবর্তে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় এবং দুনিয়াদারী নিয়ে ভীষণভাবে মেতে ওঠে। ফলে তিরোহিত হয়ে যায় তাদের হৃদয়-মন থেকে আধ্যাত্মিকতায় সফলতা অর্জনের ও উন্নত নৈতিকতা বিনির্মাণের সমস্ত আশা-ভরসা। যারা ব্যাপক হারে দ্বীন বর্জন করেছিল তারা এই ভেবে বসেছিল, বাস্তবিকই দ্বীনের সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক। আর গির্জাকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড যে দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে এমনটি ভাবতে মানুষকে বাধ্য করেছিল তা বলাই বাহুল্য। ফলে প্রশাসন ক্রমশই ক্রুদ্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল দ্বীনের প্রতিনিধিত্বকারী এই গির্জার প্রতি। তখন মানুষ হয়ে পড়েছিল বাঁধনমুক্ত উন্মত্ত হাতির ন্যায় আর সমাজ ব্যবস্থা হয়েছিল দিকচিহ্নহীন মরুর বুকের লাগামহীন উটের ন্যায়।

দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যকার এই দুস্তর ব্যবধান ও তার অনুসারীদের দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলেই দরজা খুলে যায় ধর্মহীনতা ও আল্লাহদ্রোহিতার যার প্রথম ও প্রধান শিকার ছিল পাশ্চাত্য দুনিয়া এবং সেই সব সম্প্রদায় যারা চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যকে মুরুব্বী হিসেবে গ্রহণ করেছিল কিংবা পাশ্চাত্যের আনুগত্য শর্তহীনভাবে মেনে নিয়েছিল।

আর পূর্বেই বলা হয়েছে, এর জন্য সর্বতোভাবেই দায়ী ছিল সীমালংঘনকারী ও কট্টরপন্থী ফাদার ও পাদ্রীরা যারা মানুষকে দ্বীন সম্পর্কে ভুল তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করে দ্বীনের এক অবাস্তব, অসংগত, হিংস্র ও ভয়ানক চিত্র তুলে ধরে মানুষকে দ্বীন সম্পর্ক ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

এই নাযুক পরিস্থিতিতেই আবির্ভাব ঘটল হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর। ঘোষিত হলো, মানুষের সঠিক কর্মকাণ্ডের সাথে দ্বীনের কোন বিরোধ নেই, থাকতে পারে না। মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের বুনিয়াদই হলো মানুষের মূল লক্ষ্য। ইসলাম এই বিষয়টিকেই একটি ছোট ও গভীর অর্থবহ শব্দে প্রকাশ করেছে। শব্দটি হলো النية। "নিয়ত"—লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مانوى -

"নিয়তের ওপরই সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে। মানুষ যা নিয়ত করবে তারই ফল সে লাভ করবে।"

মানুষের যাবতীয় কাজের উদ্দেশ্যই যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর হুকুম পালন, তাহলে এসব কাজ তাকে পৌঁছে দেবে আল্লাহ্‌র নিকটতম সান্নিধ্যে, ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সর্বোচ্চ চূড়ায়। ফলে তার সমস্ত কর্মই পরিগণিত হবে তখন 'খালিস দ্বীন' হিসেবে। পার্থিব আবিলতার সামান্যতম স্পর্শও তাতে থাকবে না, হোক না সে কাজ জিহাদ ও লড়াই? হোক না সে কাজ দেশ শাসন ও রাজ্য পরিচালনা, হোক না সে দুনিয়ার বৈধ বস্তুসমূহ থেকে খিদমত গ্রহণ কিংবা মনের চাহিদা পূরণ কিংবা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে চাকরি অনুসন্ধানের চেষ্টা-তদবির কিংবা দাম্পত্য জীবনের সুখ-সম্ভোগের। নিয়ত ঠিক থাকলে এ সবই বিবেচিত হবে ইবাদত হিসেবে। পক্ষান্তরে নিয়ত ঠিক না থাকলে বড় বড় ইবাদত, যথাঃ নামায, রোযা, হিজরত, জিহাদ, তাসবীহ-তাহলীল—সবই পরিগণিত হবে দুনিয়াবী কাজ হিসেবে। তার জন্য কোন সওয়াব তো মিলবেই না, বরং এই ইবাদতই তার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পঞ্চম অনুগ্রহ এই, তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যকার এই দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন দল দু'টিকে অবিরাম হিংসা, হানাহানি ও জিঘাংসা থেকে মুক্ত করে গলায় গলায় মিলিয়ে দিয়েছেন, আবদ্ধ করেছেন ভালোবাসা ও সম্প্রীতির এক সুগভীর দৃঢ় বন্ধনে, উপহার দিয়েছেন শান্তি ও ঐক্যের এক নতুন পৃথিবী।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) একাধারে বাঁশীর (সুসংবাদ প্রদানকারী) ও নাযীর (ভীতি প্রদর্শনকারী)। তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন এই মহান দু'আ ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে বাঁচাও জাহান্নামের আযাব থেকে।" তিনি আরো ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু কেবল জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশেই নিবেদিত।"

মানব জীবন কিছু বিচ্ছিন্ন ও বিপরীতমুখী এককের সমষ্টি নয়, বরং তা হলো এমন এক সত্তার নাম, জীবনের ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও অবিচল আস্থা বাস্তব জীবনের হাজারো কর্মব্যস্ততা মোটেই যা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং নিষ্ঠা থাকলে, নিয়ত সহীহ্ থাকলে, আল্লাহর সন্তুষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য হলে আর এ সবই নবী-রাসূলগণের আনীত মাপকাঠিতে উতরে গেলে প্রমাণিত হবে, আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি নবীজীর কাছ থেকে একতা ও সাম্যের শিক্ষা। নবীজী মিটিয়ে দিয়েছেন দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যকার সকল বাধা-ব্যবধান। তিনি মানুষের গোটা জীবনকে ইবাদতে পরিণত করেছেন আর সমগ্র পৃথিবীকে পরিণত করেছেন ইবাদতগাহে। পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু মানবতার হাত ধরে তিনি তাদের নিয়ে গেছেন নিষ্ঠা ও সততার এক বিস্তৃত অঙ্গনে।

সেই পুণ্য কাফেলায় রয়েছেন ফকীর-মিসকীনের পোশাকে কত রাজা-বাদশাহ! আবার রাজা-বাদশাহ ও আমীরগণের লেবাসে রয়েছেন কত আবেদ যাহিদ ও আল্লাহর পেয়ারা বান্দা!

এঁরা ধৈর্য ও সহনশীলতার সুউচ্চ পর্বতমালা! ইল্‌ম ও জ্ঞানের উচ্ছল ঝর্ণাধারা! এঁদের রজনী ভোর হয় ইবাদত-বন্দেগীর নিবিড়তায় আর দিবসে হয় এঁরা শাহসওয়ার! আল্লাহর পথের সৈনিক। কিন্তু কোথাও কোন বিরোধ নেই, কোন জটিলতা নেই, নেই কোন শূন্যতা।

মনযিলে মকসুদ

মুহাম্মাদ (সা.)-এর ষষ্ঠ অনুগ্রহ কিংবা তাঁর ঘটানো ষষ্ঠ বিপ্লব হলো, তিনি মানুষকে উপযুক্ত ও সম্মানজনক এক মনযিলের পথ দেখিয়েছেন যেখানে ব্যয় হবে তার সর্বশক্তি। তিনি তাদেরকে সন্ধান দিয়েছেন এক বিশাল বিস্তৃত মহাশূন্যের, যেখানে সে উড়ে বেড়াবে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায়। নবীজীর আগমনের পূর্বে মানুষ নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। সে জানত না কোথায় যেতে হবে তাকে এবং কোথায় শেষ হবে তার এই যাওয়া। সর্বোত্তম ও বাস্তবভিত্তিক এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি যেখানে অনায়াসে বিলিয়ে দেয়া যেতে পারে তার শক্তি-ক্ষমতা, চেষ্টা-সাধনা ও তার ভেতর ঘুমিয়ে থাকা প্রতিভা? না, কিছুই সে জানত না। সে বন্দী ছিল মনগড়া, কল্পিত, মরীচিকাময় কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থ ও হীন উদ্দেশ্যের নিগড়ে। সে ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পৃথিবীর এক বাসিন্দা। এই জীবনকে কেন্দ্র করেই ব্যয়িত হতো তার সকল শক্তি ও মেধা। বিপুল অর্থবল,

অসীম শক্তিবল, কিছু সংখ্যক মানুষের ওপর মোড়লিপনা ও আধিপত্য লাভ ও কোন ভূখণ্ডের মালিক হতে পারাই ছিল সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর একজন বাসিন্দার সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া। জাহিলী সমাজে সেই গণ্য হতো একজন সর্বোচ্চ সফল ব্যক্তি হিসাবে। বল্গাহারা জীবনের বাঁধনমুক্ত আমোদ-প্রমোদ, নারী কণ্ঠের মধুঢালা সুর লহরী, উপাদেয় ও বিলাসী খাবার, বুলবুলির মিষ্টি আওয়াজ, ময়ূরের পেখমের দৃষ্টিকাড়া সৌন্দর্য ও চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যাওয়াই ছিল তার স্বপ্নসাধ।

অপরদিকে কিছু মানুষ ধরনা দিয়ে ঘুরে বেড়াত তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের কাছে। তাদের বুদ্ধি ও মেধা উৎসর্গীকৃত হতো তাদের নৈকট্য লাভের পেছনে এবং তাদের অমূলক প্রশস্তি গেয়ে। অত্যাচারী শাসকবর্গের নাচের পুতুল হয়ে তারা কেবল নাচত। কিছু মূল্যহীন নিরর্থক সাহিত্যকে বুকে চেপে রেখে তারা লাভ করত সান্ত্বনা। তখন এলেন মুহাম্মাদ (সা.)। নির্ধারণ করে দিলেন মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মানুষের মাঝে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করলেন, তার চেষ্টা-সাধনা, তার বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাস এবং তার মুক্ত স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হলো আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ, তাঁর গুণাবলী, তাঁর কুদরত, হিকমত ও তাঁর বিশাল-বিস্তৃত অন্তহীন সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য ও চিরন্তনতার সম্যক পরিচিতি লাভ, তাঁর প্রতি অবিচল ঈমান ও দৃঢ় আস্থা রাখা, তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিতে আসে বিজয় ও সাফল্য এই দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করা। সদাসর্বদা সন্তুষ্ট থাকা তাঁর প্রতি, বিশ্বাস রাখা তাঁর সীমাহীন কুদরতের প্রতি, তাঁর সেই একত্বের প্রতি যা মিলন ঘটাতে পারে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অগণিত অংশের ভেতর, কখনো বিপরীতমুখী অংশের মাঝে এবং নিজের রূহ্ বা আত্মাকে সর্বদা তাঁর যিকিরে সজীব ও শক্তিশালী রাখা। তারপর এই সবের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে নৈকট্য ও ইয়াকীনের মহিমান্বিত জগতে প্রবেশ করা, সর্বশেষে উপনীত হওয়া সেই স্থানে যেখানে নূরের ফেরেশতারাও পৌঁছতে পারে না। এটাই মানুষের আসল সৌভাগ্য, তার পূর্ণত্বের শেষ ধাপ, তার হৃদয় ও আত্মার মিরাজ।

জন্ম হলো নতুন পৃথিবী—নতুন মানুষ!

মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের বরকতে ও তাঁর মহান শিক্ষার বদৌলতে বদলে গেল পৃথিবী, বদলে গেল পৃথিবীর রসম-রেওয়াজ ও প্রশাসনিক কাঠামো। মানবতার উত্তরণ ঘটল গ্রীষ্মের খরতাপ, লু হাওয়া, প্রচণ্ড দাহ ও দুর্ভিক্ষঘেরা এক ভয়ংকর ঋতু থেকে এমন এক ঋতুতে যেখানে গলাগলি করছে ফুল আর বসন্ত, যেখানে উদ্যান ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছলছল প্রবাহের উচ্ছল ঝর্ণাধারা। তাঁর

আগমনে পাল্টে গেছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের হৃদয়গুলো আপন প্রতিপালকের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। মানুষ ব্যাপকভাবে ধাবিত হলো আল্লাহ্ অভিমুখে। মানুষ সন্ধান পেল অপরিচিত এক নতুন স্বাদের, অজানা এক নতুন রুচির, অজ্ঞাত এক নতুন ভালোবাসার।

আগের সেই নিস্তেজ ঘুমন্ত হৃদয়গুলো জেগে উঠল ঈমানের উষ্ণতায়, মায়া-মমতার পরশে। সবার মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে নতুন উদ্যম, নতুন তৎপরতা। মানুষ দলে দলে বেরিয়ে এসেছে সিরাতু'ল-মুস্তাকীম তালাশের জন্য, সম্মান ও মর্যাদার চূড়ায় আরোহণের জন্য। দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে সকলেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য ব্যাকুল, উন্মুখ। আরব, আজম, মিসর, তুর্কী, ইরান, খোরাসান, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, হিন্দুস্তান, আলজেরিয়া, পূর্ব হিন্দুস্তান সবাই এই ঊর্ধ্বে জগতের ইশক-মুহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসায় বেকারার দেওয়ানা। মনে হচ্ছে, মানবতা যেন চেতনা ফিরে পেয়েছে, দীর্ঘ ও গভীর নিদ্রাশেষে চোখ মেলে তাকিয়েছে। কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকাকালীন যে সুদীর্ঘ সময় কেটে গেল তার ক্ষতি পূরণের ধারাবাহিকতায়ই তখন মানবতার একেকটি গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিলেন আল্লাহর পথের অসংখ্য দাঈ, রব্বানী, মুখলিস, নিষ্ঠাবান মুজাহিদ, সংস্কারক, প্রশিক্ষক, আরিফে রব্বানী, আবেদ-যাহিদ, সৃষ্টির শোক-ব্যথার সমভাগী, মানবতার কল্যাণে আত্মোৎসর্গীকৃত ও নিবেদিতপ্রাণ এবং আরো এমন সব মনীষী ও ব্যক্তিত্ব, নূরের ফেরেশতাকুলের কাছেও যাঁরা ঈর্ষার বিষয়। তাঁরা সবাই মিলে কি করলেন? বিরান ও অনাবাদী হৃদয়গুলোকে আবাদ কলেন আল্লাহ্ প্রেমের মশাল জ্বেলে। বইয়ে দিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও হিকমত-মারেফাতের হাজারো সালসাবিল। নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করলেন জুলুম-নিপীড়ন, অন্যায়-অবিচার এবং দুশমনী ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদদীপ্ত এক প্রচণ্ড দ্রোহ। নির্যাতিত, অবমানিত ও লাঞ্ছিত মানবতাকে শিক্ষা দিলেন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আর উপেক্ষিত, বিতাড়িত ও অসহায় মানব গোষ্ঠীকে টেনে নিলেন সেই বুকে, যা আবাদ হয়ে আছে শুধু প্রেম-ভালোবাসা ও মায়া-মমতায়।

মানবতার সেবায় নিবেদিত এই মুবারক জামাত থেকে পৃথিবী কখনো বঞ্চিত হয়নি। এঁরা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন সর্বদা, সব জায়গায়। সংখ্যায় এঁরা অগণিত অথবা এঁদের সংখ্যা নিরূপণই অসম্ভব। এঁদের কোয়ানটিটির কথা বাদ দিয়ে আসুন এঁদের কোয়ালিটির আলোচনায়। উল্টে যান ইতিহাসের পাতা, দেখবেন তাঁদের উন্নত চিন্তা, জাগ্রত বিবেকবোধ, প্রশান্ত আত্মা, তীক্ষ্ণ ধী ও নির্মল স্বভাব-চরিত্র। আরো দেখবেন কেমন করে এঁরা আর্ত মানবতার ব্যথায় ব্যথিত হতেন এবং নিজেকে তাদের সেবায় বিলিয়ে দিতেন। সৃষ্টিলোকের

দুঃখ-দুর্দশায় তাঁদের পবিত্র আত্মারা বিগলিত হতো সমবেদনায় সহমর্মিতায়। মানবতার মুক্তির স্বার্থে নিজেদেরকে যে কোন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতেন তাঁরা হাসি মুখে। আর তাঁদের পবিত্র আত্মারা বিগলিত হতো সমবেদনায় সহমর্মিতায়। আর তাঁদের আমীর ও শাসকগণ ছিলেন পূর্ণ দায়িত্বসচেতন ও আমানতদার। একদিকে রাত জেগে জেগে ইবাদত-বন্দেগীতে থাকতেন মশগুল, অপরদিকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিও রাখতেন সতর্ক দৃষ্টি। শাসক-শাসিতের মাঝে কোথাও কোন অমিল বা বিরোধ ছিল না। সবাই তাঁদের অনুগত।

আরেকটু উল্টে যান ইতিহাসের পাতা। অবাক হবেন তাঁদের ইবাদত, দুনিয়াবিমুখতা, দু'আ ও মুনাজাত, চারিত্রিক উৎকর্ষ, মাহাত্ম্যবোধ, ছোট ও দুর্বলদের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমবোধ, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তাঁদের মধুর বিনম্র আচরণ, দয়া ও করুণা এবং জানের দুশমনকে অকপটে ক্ষমা করে দেয়ার কাহিনী পড়ে। মনে হবে কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব না তাঁদের উর্বর কল্পনা ও তাঁদের বিরল প্রতিভার সিঁড়ি বেয়ে সেই চূড়ায় উপনীত হওয়া, যেখানে উপনীত হয়েছিলেন এঁরা বাস্তবতার সিঁড়ি বেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, অবিচ্ছিন্ন সূত্র ও সনদ আমাদের সংরক্ষণে না থাকলে এবং নির্ভরযোগ্য ইতহাসের সাক্ষ্য না পেলে অনায়াসে এই সত্য ঘটনাকে কল্পকাহিনী ও উপকথা বলে চালিয়ে দেয়া যেত। সত্যি, এই মহান ইনকিলাব, এই গৌরবদীপ্ত নতুন যুগের সূচনা মুহাম্মাদ (সা.)-এর অন্যতম মু'জিযা ও তাঁর এক মহাঅনুগ্রহ। সর্বোপরি তা ইলাহী রহমতের এক মহাদান যা সীমাবদ্ধ নয় স্থান-কাল-পাত্রের কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে। মহান আল্লাহ্ সত্যি বলেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" [সূরা ২১ ঃ আয়াত-১০৭]

মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন?

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও হিকমতের ফয়সালা ছিল, মানবতার হেদায়াত ও নাজাত তথা পথ প্রদর্শন ও মুক্তির এই সূর্য যদ্দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগতে আলো বিস্তার লাভ করে, জাযীরাতুল আরবের দ্বিগ্বলয় থেকে উদিত হবে যা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে অন্ধকার ভূভাগ আর যে ভূভাগের এই প্রখর আলোক-রশ্মির প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক।

আল্লাহ তা'আলা এই দাওয়াতের জন্য আরবদেরকে নির্বাচিত করেন এবং তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের তাবলীগ তথা প্রচার-প্রসারে যিম্মাদের বানান এজন্য যে, তাদের হৃদয়পট ছিল একেবারেই স্বচ্ছ ও নির্মল। পূর্ব থেকে কোন অঙ্কিত ছবি কিংবা চিত্র এতে ছিল না যা মোছা কঠিন হতো। এর বিপরীতে রোমক, পারসিক অথবা ভারতীয়দের, যাদের নিজেদের উন্নতি-অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শনের ব্যাপারে বিরাট গর্ব ছিল, আর এর দরুন তাদের ভেতর এমন কিছু মানসিক গ্রন্থি ও চিন্তাগত জটিলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা দূর হওয়া সহজ ছিল না। আরবদের দিল ও দিমাগ তথা মন-মস্তিষ্কের নিষ্কলঙ্ক পট কেবল সেই মামুলী ও হাল্কা রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিল যা তাদের মূর্খতা, অশিক্ষা ও বেদুঈন জীবন তার ভেতর অঙ্কিত করে দিয়েছিল যা ধোয়া ও মুছে ফেলা এবং তদস্থলে নতুন চিত্র অংকন করা খুবই সহজ ছিল। বর্তমান শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তারা "অকাট্য ও নির্ভেজাল মূর্খতা"র শিকার ছিল, আর এটাই ছিল সেই ভুল যার প্রতিবিধান হতে পারত। অপরাপর সুসভ্য ও উন্নত জাতিগোষ্ঠী ছিল মিশ্রিত তথা ভেজাল মূর্খতার ভেতর লিপ্ত যার চিকিৎসা ও প্রতিবিধান এবং তা ধুয়ে নতুন হরফ লেখা সব সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে।

এই আরবরা তাদের আপন প্রকৃতিতে ছিল সমুজ্জ্বল। মজবুত ও লৌহসম সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল তারা। যদি হক কথা তাদের উপলব্ধিতে ধরা না দিত তাহলে তারা এর বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে তুলে নিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করত না। আর যদি সত্য স্বচ্ছ সুন্দর দর্পণের ন্যায় তাদের সামনের পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ত তাহলে তা তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করত, প্রাণের অধিক ভালবাসত, তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরত এবং এর জন্য প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতেও এতটুকু দ্বিধা করত না।

এই আরবীয় মন-মানসিকতা সুহায়ল ইবন আমরের সেই কথার ভেতর প্রতিফলিত হয় যা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের সময় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল। সন্ধি চুক্তির সূচনা হয়েছিল নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা هذا ماقضى عليه محمد رسول الله অর্থাৎ এ সেই ফয়সালা যা আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সা.) করেছেন। এতে সুহায়ল বলে ওঠে ঃ والله لوكنا نعلم انك رسول الله ما مددناك عن البيت ولا قاتلناك অর্থাৎ আল্লাহর কসম! যদি আমরা জানতাম ও মানতাম, আপনি আল্লাহর রসূল তাহলে কখনো আপনাকে আল্লাহর ঘর যিয়ারতে বাধা দিতাম না, আর আপনার সঙ্গে লড়াই-সংঘর্ষেও প্রবৃত্ত হতাম না। এই একই মন-মানসিকতা ইকরীমা (রা.) ইবন আবী জাহলের কথায়ও ফুটে ওঠে যখন ইয়ারমুক যুদ্ধ প্রবল তুঙ্গে। তখন তাঁর ওপর প্রতিপক্ষের প্রবল চাপ। রোমক সৈন্যরা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে হযরত ইকরীমা (রা.)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন ঃ জ্ঞানবুদ্ধির দুশমনেরা! (যত দিন পর্যন্ত আমার মাথায় এ সত্য আসেনি) আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মোকাবিলায় সর্বত্র প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে মুখোমুখী হয়েছি। আর আজ আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে যাব? এরপর তিনি হাঁক ছেড়ে বলে ওঠেন ঃ এমন কেউ আছে, যে আমার হাতে মৃত্যুর শপথ নিতে পার? এতে কিছু সংখ্যক লোক এগিয়ে এলেন এবং বায়আত নিলেন। এরপর সকলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন, অতঃপর আহত হয়ে শাহাদত লাভ করলেন।[১]

আরবের লোকেরা ছিল বড়ই বাস্তবতাপ্রিয়, চিন্তাশীল, মননশীল, ধীরস্থির প্রকৃতির, স্পষ্টভাষী, কঠোরপ্রাণ ও সহিষ্ণু। তারা না প্রতারিত করত আর না নিজেদেরকে প্রতারণার মধ্যে রাখা পছন্দ করত। তারা সত্য ও পরিপক্ব কথায় অভ্যস্ত, কথার সম্মান রক্ষাকারী ও সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল। এর একটি সুস্পষ্ট নমুনা ও প্রমাণ আমরা দেখতে পাব আকাবার দ্বিতীয় বায়আতে যার পরই হিজরতের সূচনা হয় মদীনা তায়্যিবার দিকে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আকাবা উপত্যকায় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণের উদ্দেশে সমবেত হয় তখন আব্বাস ইবন উবাদা আল-খাযরাজী স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে খাযরাজের লোকেরা! তোমাদের কি জানা আছে, তোমরা মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.)-এর হাতে কোন্ বিষয়ের ওপর বায়আত গ্রহণ করতে যাচ্ছ? উত্তরে তারা বলল ঃ আমরা জানি। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাঁর হাতে সাদা-কালো সকল

১. তারিখে তাবারী, ৪খ. ৩৬ পৃ.।

বর্ণের মানুষের সাথে যুদ্ধের ওপর বায়আত করছ (অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যুদ্ধের শপথ নিতে চলেছ)। যদি তোমরা ভেবে থাক, তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হবে, ধ্বংস ও বরবাদ করা হবে, তোমাদের অভিজাত সন্তান ও গোত্রের নেতৃবর্গ নিহত হবে, সেক্ষেত্রে তোমরা তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা সরে দাঁড়াবে, তাহলে শুরুতেই এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাক আর তা এজন্য, যদি এমন কিছু কর তবে আল্লাহর কসম! দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই তোমরা লজ্জিত ও অপমানিত হবে। আর তোমাদের সিদ্ধান্ত যদি এই হয়ে থাকে, যেই বস্তুর জন্য তোমরা তাঁকে দাওয়াত দিয়েছে তা তোমরা পূরণ করবে, এতে তোমাদের গোটা বিত্ত-সম্পদ তছনছ হয়ে গেলেও তোমাদের নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায় মারা গেলেও তোমরা পরওয়া করবে না, তবে তোমরা তাঁর হাতে হাত দিও। সেক্ষেত্রে আল্লাহর কসম! এতে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই তোমাদের জন্য সাফল্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তারা সকলেই সমস্বরে বলল ঃ আমরা আমাদের বিত্ত-সম্পদের ধ্বংস ও নেতৃবর্গের মৃত্যু সকল কিছুর বিনিময়েও আপনার হাতে বায়আত করতে চাই। কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি পাব? আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন ঃ জান্নাত। তারা বলল ঃ আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি দস্ত মুবারক সামনে বাড়িয়ে দিলে সকলেই বায়আত করল।[১]

প্রকৃত ব্যাপার এই, তারা সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিল যেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তারা রাসূল আকরাম (সা.)-এর হাতে বায়আত নিয়েছিল। হযরত সা'দ ইবদ মু'আয (রা.) তাঁর বিখ্যাত উক্তির মধ্যে সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহর কসম! (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আপনি যদি চলতে চলতে বারকুল গিমাদ[২] অবধি পৌঁছে যান তখনও আমরা আপনাদের সাথে চলতে থাকব। যদি আপনি সমুদ্র পার হতে চান তবে সেক্ষেত্রেও আমরা আপনার সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।[৩]

অটুট সংকল্প ও সুদৃঢ় এই ইচ্ছাশক্তি ও সততা, কর্মের স্থিরতা, সত্যের সামনে মস্তক অবনত করে দেয়ার মেযাজ ও মানসিকতা সেই বাক্য থেকেও স্পষ্ট প্রতিভাত যা মুসলিম ফৌজের বিখ্যাত সিপাহসালার উকবা ইবনে নাফে (রা.) উচ্চারণ করেছিলেন, যখন বিজয়ের পর বিজয়ের মাধ্যমে সম্মুখে অগ্রসর হতে

১। সীরাতে ইবন হিশাম, ১ম খ., ৪৪৬ পৃ.।

২। বারকুর গিমাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। একটি মত, এটা ইয়ামনের একটি দূরবর্তী এলাকা। সুহায়লী বলেন, এর দ্বারা আবিসিনিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এর উদ্দেশে এই, যদি দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত গমন করেন তবুও আমরা আপনার সঙ্গে থাকব, সঙ্গ পরিত্যাগ করব না।

৩. যাদুল- মাআদ, ২খ. সীরাত ইবনে হিশাম, খ. বোখারী ও মুসলিমের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

গিয়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্র তাঁর পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় তিনি বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! এই মহাসমুদ্র আমার অগ্রযাত্রার পথের প্রতিবন্ধক। নইলে আমর মন চায় সমান্তরাল গতিতে আমি সামনে এগিয়ে যাই এবং জলে-স্থলে তোমার নামের মহিমা গাই।[১]

এর বিপরীতে গ্রীস, রোম ও পারস্যের লোকেরা যুগ স্রোতে ভেসে যেতে ও হাওয়ার অনুকূলে পাল তোলাতে অভ্যস্ত ছিল। কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ি তাদের ভেতর আন্দোলন সৃষ্টি করতে ছিল অক্ষম। নীতিপরায়ণতা ও সত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ তাদের ভেতর ছিল না। কোন দাওয়াত বা আহ্বান ও আকীদা বিশ্বাস তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ও তাদের আবেগ-অনুভূতির ওপর এভাবে ছাপ ফেলত না যার জন্য নিজেদের সত্তাকে তারা বিস্মৃত হতে পারে এবং নিজেদের আরাম- আয়েশ ও পার্থিব ভোগ-বিলাসকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

আরবগণ সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভোগ-বিলাস ও আরামপ্রিয়তা থেকে সৃষ্ট এসব রোগ-ব্যাধি ও খারাপ অভ্যাস থেকে ছিল মুক্ত যার চিকিৎসা বড় কঠিন। এটা কোন ঈমান-আকীদার জন্য উত্তাপ সৃষ্টিতে ও আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় মানুষের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়।

তাদের ভেতর সত্যবাদিতা ছিল, আমানতদারিও ছিল, ছিল বীরত্বও । মোনাফেকি, গাদ্দারী ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাদের প্রকৃতি ছিল সামঞ্জস্যহীন। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে জীবন বাজি রেখে লড়াকু যোদ্ধা, অশ্বপৃষ্ঠে অধিকক্ষণ অতিবাহিতকারী, কঠোর প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সহ্য শক্তির অধিকারী সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহপ্রিয় যা এমন এক সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত যাকে দুনিয়ায় কোন বড় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে যেতে হবে, বিশেষত সেই যুগে যখন লড়াই-সংঘর্ষ ও অভিযান পরিচালনার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের সাধারণ প্রচলন ঘটতে থাকে।

দ্বিতীয় বিষয়, তাদের চিন্তাধারাগত ও কার্যকর সমূহ শক্তি ও স্বভাবজাত প্রাকৃতিক যোগ্যতাসমূহ নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল এবং কাল্পনিক দর্শন, অনুকারী যুক্তিতর্কের কচকচানি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি, ইলমে কালামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মও নাজুক অধ্যায়সমূহে অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক গৃহযুদ্ধগুলোতে তা বিনষ্ট হয়নি। এটি একটি উর্বর এবং এই দিক দিয়ে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জাতিগোষ্ঠী ছিল তাদের জীবন উত্তাপ, আবেগ-উদ্দীপনা, আনন্দ-প্রফুল্লতা, অটুট সংকল্প এবং লৌহসুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ছিল ভরপুর।

১. কামিল, ইবনে আছীর, ৪খ. সাসানী আমলে ইরান, পৃ. ৫৩৫-৩৬।

স্বাধীনতা ও সাম্য, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে ভালবাসা, অনাড়ম্বর ও সারল্য তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে ছিল। তাদেরকে কখনো বিদেশী শক্তির সামনে মাথা নত করতে হয়নি। এই জাতি গোলামী, একজন আরেক জনের ওপর ছড়ি ঘোরাবে এবং প্রভুত্ব করবে এরূপ অর্থের সঙ্গে অপরিচিত ছিল। তারা ইরানী ও রোমক রাজতন্ত্রের গর্ব ও অহমিকা এবং মানুষ মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখবে এরূপ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এর বিপরীতে পারস্য সম্রাটদেরকে (যারা আরব উপদ্বীপের প্রতিবেশী ছিল) অতিমানব জ্ঞান করা হতো। যদি পারস্য সম্রাট রক্ত মোক্ষণ করাতেন কিংবা কোন ঔষধ ব্যবহার করতেন তবে রাজধানীতে ঘোষণা প্রদান করা হতো, আজ মহামান্য সম্রাট রক্ত মোক্ষণ করিয়েছেন কিংবা ঔষধ ব্যবহার করেছেন। এই ঘোষণার পর শহরে কোন পেশাজীবী আপন পেশায় নিমগ্ন হতে কিংবা কোন সরকারী কর্মকর্তা বা সভাসদ কাজ করতে পারত না।[১] যদি কখনও সম্রাটের হাঁচি আসত তবে তাঁর জন্য কোন মঙ্গলবাণী উচ্চারণের অধিকার ছিল না। যদি তিনি নিজে কোন মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করতেন তবুও এর সমর্থনে কিছু বলা যেত না। যদি তিনি কখনও কোন উজীর কিংবা আমীরের বাসভবনে গমন করতেন তবে এই দিনটিকে খুবই অস্বাভাবিক ও গুরুত্ববহ মনে করা হতো। সেই দিন থেকে সেই খান্দানের নতুন বর্ষপঞ্জী শুরু হতো এবং চিঠিপত্রে নতুন তারিখ বসানো হতো। একটি নির্ধারিত সময়সীমার জন্য তার ট্যাক্স মাফ করা হতো। উল্লিখিত ব্যক্তিকে নানা রকমের সম্মান, পুরস্কার, ক্ষমা ও পদোন্নতি দ্বারা ভূষিত করা হতো কেবল এজন্য, সম্রাট পদধূলি দ্বারা তাকে ধন্য ও অনুগৃহীত করেছেন।[২]

এ সেই সব আদব, বন্দেগী ও সম্রাটকে তাজীম প্রদর্শনের আবশ্যকীয় শর্তের অতিরিক্ত যেগুলো প্রদর্শন করা সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা, দরবারে সভাসদবর্গ ও অপরাপর সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য ছিল। যেমন সম্রাটের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা (অর্থাৎ বুকের ওপর হাত রেখে আদবের সাথে মাথা নিচু করে দেয়া), তাঁর সামনে এভাবে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা যেভাবে নামাযে আল্লাহর সামনে কেউ দাঁড়ায়। এ সেই সম্রাটের আমলের কথা বলা হচ্ছে যিনি নওশেরওয়ানে 'আদিল বা ন্যায়বিচারক নওশেরওয়া' নামে পৃথিবী খ্যাত অর্থাৎ খসরু ১ম (৫৩১-৫৭৯ খৃঃ)। এ থেকে পরিমাপ করা যেতে পারে, ইরানের সেই আমলে কুখ্যাত ছিলেন। মুক্ত চিন্তা ও মতামত প্রকাশ (সমালোচনা নয়) বিস্তৃত

১. দ্র. সাসানী আমলে ইরান, ৫১১ পৃ.।
২. সাসানী আমলে ইরান।

সম্রাটদের অবস্থা কি হবে যারা জুলুম-নিপীড়ন ও নির্দয়তার ক্ষেত্রে স্ব স্ব ইরানী সাম্রাজ্যে প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক তাবারী 'ন্যায়বিচারক সম্রাট নওশেরওয়া'র একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন যদ্দারা আমরা পরিমাপ করতে পারি, ইরানী রাজতন্ত্রে মতামত ও চিন্তার স্বাধীনতার ওপর কত কঠিন বাধা-নিষেধ আরোপিত ছিল এবং শাহী দরবারে মুখ খোলার কি মূল্য পরিশোধ করতে হতো। ঘটনাটি 'সাসানী আমলে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক তাবারীর সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

"সম্রাট একটি কাউন্সিল সভার আয়োজন করেন এবং রাজস্ব বিভাগের পরিচালক/সচিবকে নির্দেশ দেন জমির খাজনার নতুন ভাষ্য সজোরে পাঠ করে শোনাতে। তিনি তা পাঠ করলে সম্রাট খসরু (নওশেরওয়াঁ) উপস্থিত লোকদেরকে দু'বার জিজ্ঞেস করেন ঃ কারো কোন আপত্তি নেই তো? সকলেই ছিল নিশ্চুপ। যখন সম্রাট তৃতীয়বারের মত একই প্রশ্ন করলেন তখন একজন দাঁড়িয়ে সসম্মানে জিজ্ঞেস করল ঃ সম্রাটের ইচ্ছা কি এই, অস্থাবর জিনিসের ওপর স্থায়ী ট্যাক্স বসাবেন যা কাল-পরিক্রমায় অবিচার ও বে-ইনসাফীতে পর্যবসিত হবে? এতে সম্রাট ক্রোধে চিৎকার করে বলে ওঠেন ঃ ওহে অভিশপ্ত বেআদব! তোর পরিচয় কি? কোত্থেকে এসেছিস তুই? সে উত্তরে জানাল, সে রাজস্ব কর্মকর্তাদের একজন। সম্রাট তখন নির্দেশ দেন কলমদানি দিয়ে পিটিয়ে তাকে মেরে ফেলতে। এরপর পরিচালক/সচিবদের সকলেই তাকে কলমদানি দিয়ে পেটাতে শুরু করে। ফলে বেচারা সেখানেই মারা যায়। এরপর সকলেই বলল ঃ সম্রাট! আপনি যে খাজনা আমাদের ওপর ধার্য করেছেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ানুগ হয়েছে।"[১]

ভারতবর্ষে সম্মান ও সম্ভ্রমের অপমান ও অবমাননা এবং সেসব পশ্চাৎপদ শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন (যাদেরকে বিজয়ী আর্য জাতিগোষ্ঠী দেশীয় আইন একটি নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে অভিহিত করেছিল এবং যারা গৃহপালিত

১. এজন্য আরবী ভাষায় একটি স্থায়ী বাগধারা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বলা হতো ঃ كفر فلان অর্থাৎ অমুক নত হয়ে নিজ হাত বুকের ওপর স্থাপন করে শ্রদ্ধাবশে মাথা নুইয়ে দিল। এটা ছিল ইরানের সাধারণ রেওয়াজ এবং সেখান থেকেই এই পরিভাষা সৃষ্টি হয় এবং আরবী ভাষায় প্রবেশ করে। লিসানুল আরব গ্রন্থে আছে, كفر এর অর্থ ইরানীদের তাদের সম্রাটকে সম্মান করা এবং আহলে কিতাবদের تكفير এই আদাব তসলীম হিসেবে মানুষ তাঁর মাথা নুইয়ে দেবে। তারা জারীরের সেই কবিতা থেকে দলিল পেশ করত فضعوا السلاح والتكفير লিখেছে, যেমন কোন গ্রাম্য কৃষক আপন মুখ্য ও যিম্মাদারে সামনে বুকে হাত বেঁধে সম্মান প্রদর্শনার্থে মাথা নুইয়ে দেয় (লিসানুল-আরব, ৭ম খণ্ড, ৪৬৬ كفر শিরো)।

পশু থেকে কেবল এ দিক দিয়ে ভিন্ন ছিল, এরা দু'পায়ে ভর দিয়ে চলত এবং দেখতে মানুষের মত) কল্পনাতীত ছিল উক্ত আইনে এটি নিয়মিত ধারা হিসেবে বর্ণিত ছিল, যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে মারার উদ্দেশে হাত ওঠায় কিংবা লাঠি ওঠায় তবে তার হাত কেটে দিতে হবে। যদি লাথি মারে তবে তার পা কেটে দিতে হবে। যদি সে দাবি করে, সে ব্রাহ্মণকে লেখাপড়া শেখাতে পারে, তাকে ফুটন্ত তেল পান করানো হবে। এই আইনের দৃষ্টিতে কুকুর, ব্যাঙ, গিরগিটি, কাক, উল্লু ও অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য শ্রেণীর কাউকে হত্যা করলে তার জরিমানা ছিল একই রূপ।[১]

রোমকরাও এ ব্যাপারে ইরানীদের থেকে বেশি কিছু ভিন্ন ছিল না, যদিও নির্লজ্জতা ও মানবতাকে অপমানিত-অপদস্ত করার ক্ষেত্রে এই সর্বনিম্ন পর্যায়ে তারা পৌঁছতে পারেনি। একজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক Victor Chopart তদীয় The Roman World নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"রোম সম্রাট কাইজারকে উপাস্য মনে করা হতো। বিষয়টি মৌরছী ও পারিবারিকভাবে ছিল না, বরং যিনিই সিংহাসন ও রাজমুকুটের মালিক হতেন তাকেই খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হতো যদিও তার ভেতর এমন কোন নিশানী কিংবা চিহ্ন থাকত না যা তাকে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হবার দিকে ইঙ্গিত দেয়। Augustus-এর শাহী উপাধি এক সম্রাট থেকে অপর সম্রাট অবধি সংবিধান ও আইন অনুযায়ী স্থানান্তরিত হতো না, বরং রোমক সরকারী সংসদের কাজ কেবল এতটুকুই ছিল, এমন প্রতিটি নির্দেশ যা তরবারির তীক্ষ্ম ধারের জোরে প্রচারিত হবে তা প্রচারিত হতে দেয়া। এই রাজত্ব ও বাদশাহী ছিল কেবল এক ধরনের সামরিক একনায়কতন্ত্রেরই রূপ।"[২]

যদি এর তুলনা করা হয় আরবদের সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মসম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে, যা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে তাদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে এ দুই জাতিগোষ্ঠীর মেযাজ এবং আরব ও অনারব সমাজের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। তারা কখনোও কোন সময় তাদের বাদশাহকে ابيت اللعن ও عم صباحا (অর্থাৎ আপনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকুন এবং আপনার প্রভাত কল্যাণময় হোক)-এর মত শব্দ সমষ্টি দ্বারা সম্বোধন করত। এই স্বাধীনতা ও আত্মপরিচিতি, আপন মান-সম্ভ্রমের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ আরবদের মধ্যে এই পরিমাণে

১. সাসানী আমলে ইরান, ৫১১ পৃ.।

১. মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

ছিল, তারা তাদের বাদশাহ ও আমীরদের কোন কোন দাবি ও ফরমায়েশ পূরণ করতেও অনেক সময় আপত্তি করত। এই সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত হয়েছে, একবার এক আরব বাদশাহ বনী তামীমের এক ব্যক্তির নিকট একটি ঘোটকী, যার নাম ছিল সিকাব, চেয়ে বসে। লোকটি ঘোটকী দিতে পরিষ্কার অস্বীকার করে এবং নিম্নোক্ত বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করেঃ

ابيت اللعن ان سكاب علق + نفيس لا تعار ولاتباع

فلا تطمع ابيت اللعن فيها+ومنعكها بشئ يستطاع

"হে রাজন! এ বহু দামী ও সুন্দরী ঘোটকী; একে না ধারে দেওয়া যায়, না বিক্রয় করা যায়। আপনি একে পাবার জন্য চেষ্টা করবেন না; আপনার হাত থেকে একে ফেরানো আমার পক্ষে সম্ভব।" দীওয়ান-ইহসাম, বাবুল-হামাসা, পৃ. ৬৭।

এই স্বাধীনতা, আত্মশাসন, আত্মার সমুন্নতি, আভিজাত্য ও অটুট মনোবল সর্বস্তরের জনগণের মধ্যেই বর্তমান ছিল এবং নারী-পুরুষ সকলের মধ্যে পাওয়া যেত। এর একটি নমুনা আমরা হীরার শাসনকর্তা আমর ইবন হিন্দ-এ হত্যার ঘটনায় দেখতে পাই। আরব ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমর ইবন হিন্দ বিখ্যাত আরব ঘোড়সওয়ার ও কবি 'আমর ইবন কুলছুমকে দাওয়াত দেন এবং আগ্রহ ব্যক্ত করেন, তাঁর (কবির) শাসনকর্তার মায়ের সঙ্গে দাওয়াতে যেন শরীক হন। অনন্তর 'আমর ইবন কুলছুম বনু তাগলিবের একটি জামা'আতের সঙ্গে জযীরা থেকে হীরা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তাঁর মা লায়লা বিনতে মুহালহিরও বনু তাগলিবের কিছু সংখ্যক দায়িত্বশীল লোকের সঙ্গে রওয়ানা হন। 'আমর ইবন হিন্দের তাঁবু হীরা ফুরাতের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়। একদিকে 'আমর ইবন হিন্দু আপন তাঁবুতে প্রবেশ করেন এবং অপরদিকে লায়লাও হিন্দ তাঁর মাকে বলে দিয়েছিলেন, যখন খাবার পরিবেশন করা হবে তখন নওকরদের একটু আলাদা করে দেবে এবং কোন প্রয়োজন দেখা দিলে লায়লাকে দিয়ে তা করিয়ে নেবে। অতঃপর আমর ইবনে হিন্দ দস্তরখান বিছানোর নির্দেশ দিলেন, এরপর খাবার পরিবেশ করলেন এর ভেতর হিন্দ লায়লাকে সম্বোধন করে বলল, বোন! এই পাত্রটা আমাকে একা উঠিয়ে দাও তো! লায়লা বলল, যার প্রয়োজন সে নিজেই উঠিয়ে নিক। এরপর হিন্দ দ্বিতীয়বার চাইল এবং পীড়াপীড়ি করতে থাকল। এ সময় লায়লা চিৎকার করে উঠল, হায়! কী লজ্জা ও অপমান! ওহে বনু তাগলিব! এই আওয়াজ আমর ইবন কুলছুম শুনতেই তাঁর

চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে। তিনি এক লাফে 'আমর ইবন হিন্দের সামনে ঝুলন্ত তরবারি টেনে নেন এবং তা দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। সেই সাথে বনু তাগলিব তাঁর তাঁবু লুট করে এবং জযীরার দিকে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই আমর ইবন কুলছুম সেই বিখ্যাত কাসীদা পাঠ করেন যা "ঝুলন্ত সপ্তক" (সাব 'আঃ মু'আল্লাকা ঃ)-এর অন্তর্গত।[১]

ঠিক এমনই একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যখন হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে পারসিক সেনাপতি রুস্তমের দরবারে গিয়েছিলেন। রুস্তম পূর্ণ জাঁকজমক ও শাহী ঠাঁটবাটের সঙ্গে স্বীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) আরবদের অভ্যাস মাফিক রুস্তমের পাশাপাশি স্থাপিত কুরসীতে গিয়ে বসে পড়েন। তাঁর দরবারীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে টেনে নিচে নামিয়ে আনে। এতে তিনি বলেনঃ আমরা খবর পেয়েছিলাম তোমরা নাকি খুবই বুদ্ধিমান! কিন্তু আমার চোখে তোমাদের চেয়ে বেওকুফ আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা আরবরা তো সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকি। আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে গোলাম বানায় না একমাত্র যুদ্ধাবস্থা ছাড়া। আমার ধারণা ছিল, তোমরাও তোমাদের জাতির সঙ্গে ঠিক তেমনি সাম্যের আচরণ করে থাকবে। এর চেয়ে এই ভাল ছিল, তোমরা আমাকে প্রথমেই অবহিত করতে, তোমরা একে অপরকে নিজদের খোদা বানিয়ে রেখেছ এবং এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে নিষ্পত্তি হবে না। এমতাবস্থায় আমরা তোমাদের সঙ্গে এই আচরণ করতাম না, আর তোমাদের নিকটও আগমন করতাম না। কিন্তু তোমরা নিজেরাই আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছ।[২]

আরব উপদ্বীপে শেষ নবী প্রেরণের দ্বিতীয় কারণ হলো, আরব উপদ্বীপেও মক্কা মুআজ্জামায় কা'বার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এজন্যই নির্মাণ করেছিলেন যেন তাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং এই জায়গাটি চিরদিনের তরে তাওহীদের দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ -

১. The Roman World. London 1928. p. 418.
২. কিতাবু'শ শির ওয়াশ-শু'আরা, ইবন কুতায়বা, পৃ. ৩৬।

বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) গ্রন্থে ব্যাপক পরিমাণ বিকৃতি সত্ত্বেও "বাক্কা[১] উপত্যকা" শব্দটি অদ্যাবধি বর্তমান, কিন্তু অনুবাদকগণ একে 'বুকা' উপত্যকা বানিয়ে দিয়েছেন এবং একে নির্দিষ্ট জ্ঞাপকের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট জ্ঞাপকে পরিণত করেছেন। مزامير داؤد এর সমষ্টি যা আরবী ভাষায় এসেছে তা এই ঃ

طوبى لاناس عزهم بك طرق بيتك فى قلوبهم
عابرين فى وادى البكاء يصيرونه ينبوعا ـ

"বরকতময় ও পবিত্র সেই মানুষ যার ভেতর তোমার পক্ষ থেকে শক্তি নিহিত, যাঁর অন্তরে রয়েছে তোমার ঘরের রাস্তা যিনি বুকা উপত্যকা অতিক্রমরত অবস্থায় তাকে একটি কুয়া বানান" (গীত সংহিতা, ৮৪ ঃ ৫,৬,৭; পবিত্র গ্রন্থ, বৃটিশ এন্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি)।

কিন্তু ইহুদী পণ্ডিতগণ কয়েক শতাব্দী পর অনুভব করতে সক্ষম হন, এই অনুবাদটি ভুল। অনন্তর Jewish Encyclopaedia-তে এই স্বীকারোক্তি বর্তমান, এটি এক নির্দিষ্ট উপত্যকা যেখানে পানি পাওয়া যেত না। যারা উল্লিখিত কথা লিখেছেন তাদের মস্তিষ্কে এমন একটি উপত্যকার ছবি ছিল যার ছিল বিশেষ কুদরতী অবস্থা, যার প্রতিনিধিত্ব তারা উল্লিখিত শব্দ সমষ্টি দ্বারা করেছেন।[২]

ঐসব সহীফার ইংরেজী অনুবাদকগণ অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবী অনুবাদকদের তুলনায় অধিকতর বিশ্বস্ততা ও সর্তকতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁরা "বাক্কা" শব্দটিকে মূল সহীফার ন্যায় আবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় হুবহু অবশিষ্ট রেখেছেন এবং ইংরেজী "b" অক্ষরে না লিখে বড় "B" অক্ষরে লিখেছেন যা সাধারণত মূলভ-এর ক্ষেত্রে লেখা হয়ে থাকে। ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ[৩]

Bleases is the man whose strength is in three in whose heart are the ways of them, who passing through the valley of Baca make it a well psalm 84. 5-6.

---

১. তারীখে তাবারী, ৪খ. ১০৮।

১. বাক্কা পবিত্র মক্কার অপর নাম। বাক্কা ও মক্কা উভয় নামই ব্যবহৃত হয়। এজন্য আরবী ভাষায় মীম ও বার মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে থাকে; যেমন لازم ও لازب এবং مليط ও بليط।

৩. Vol, ii. p 415।

মুবারকবাদ সেই সব লোকের প্রতি যাদের সম্মান ও শক্তি রয়েছে তোমার সাথে, যাদের অন্তরে তাদের রাস্তা রয়েছে যা বাক্কা উপত্যকা অতিক্রম করবে এবং তাকে একটি কুয়া বানাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আবির্ভাব ছিল হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সেই দোয়ার ফল যা তাঁরা কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে ও তা নির্মাণ করার সময় করেছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে থেকে তাদের নিকট এক রসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা বাকারা ঃ ১২৯]

আল্লাহ তা'আলার এক চিরন্তন নিয়ম এই, তিনি তাঁর মুখলিস (একনিষ্ঠ), সাদিকীনীন (সত্যনিষ্ঠ) ও আপন মহান সত্তার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমা ভিক্ষার আঁচল বিস্তারকারীদের দোয়া অবধারিতভাবে কবুল করে থাকেন। আম্বিয়াই কিরাম ও নবীয়ে মুরসালদের সম্মান তাঁদের চেয়েও উচ্চে।

আসমানী সহীফা ও সত্য সংবাদসমূহ এসব উদাহরণে ভরপুর। স্বয়ং তাওরাতে এর প্রমাণ বিদ্যমান, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই দোয়া কবুল করেন। পুস্তকে (২০) পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে ঃ

"এবং ইসমাঈলের অনুকূলে আমি তোমার কথা শুনলাম। দেখ, আমি তাকে প্রাচুর্য দান করব, তাকে সৌভাগ্যশালী করব এবং তাকে খুব বর্ধিত করব; তার থেকে বার জন সর্দার জন্ম নেবে এবং তাকে বিরাট বড় জাতি (قوم) বানাব।"

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতেন, انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى

"আমি ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া ও ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদের ফসল।"[১] তাওরাত (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বা পুরাতন নিয়ম-এর বিকৃতি সত্ত্বেও অদ্যাবধি এর সাক্ষ্য মিলবে, এই দোয়া কবুল হয়। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক (১৫-১৮) মূসা (আ.) -এর ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى له تسمعون -

"খোদাওয়ান্দ তোমার প্রভু, তোমার রব, তোমার নিমিত্ত তোমারই ভেতর থেকে তোমারই ভাইদের থেকে আমার মত একজন নবী পাঠাবেন; তোমরা গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর কথা শুনবে।" اختوك (তোমার ভাই) শব্দ নিজে থেকেই বলে দিচ্ছে, এর দ্বারা বনী ইসমালকেই বোঝানো হচ্ছে, বনী ইসরাঈলের চাচার বংশধর। উক্ত সহফিতেই দুটি শ্লোকের পর এই বাক্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

قال لى الرب قد احسنوا فيما تكلموا اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فه فيكلمهم بكل ما اوصيه به -

"আর খোদাওয়ান্দ আমাকে বললেন, তারা যা বলেছে তা ভালই বলেছে। আমি তাদের নিমিত্ত তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে তোমার মত একজন নবী পাঠাব, আর আমি আমার বাক্য তার মুখে নিক্ষেপ করব এবং যা কিছু আমি তাকে বলব সে তা সব তাদেরকে বলবে।" [যাত্রা পুস্তক–২,২৮ ঃ ১৭-১৮]

اجعل كلامى فى فمه (আমি আমার কথা তার মুখে নিক্ষেপ করব) এই বাক্যটি মুহাম্মদ (সা.)-কে নির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেননা তিনিই একমাত্র নবী যাঁর ওপর আল্লাহর কালাম শব্দগত ও অর্থগতভাবে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তার ঘোষণাও দিয়েছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না; এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়।" (সূরা নাজম ঃ ৩-৪)

১. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দুরিয়াবাদকৃত তফসীর মাজেদী, কাজী সুলায়মান মুনসুর পূরীর "রাহামাতুল্লিাত আলামীন", ১ম খণ্ড থেকে গৃহীত।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ -

"কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না, সামনের থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।"

[হামীম আস-সাজদা ঃ ৪২]

এর বিপরীত বনী ইসরাঈলের নবীদের সহীফাসমূহ আদৌ এ দাবি করে না, সেগুলো শব্দগত ও অর্থগতভাবে আল্লাহর কালাম। তাদের পণ্ডিতগণ সে সবকে তাদের নবীদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। Jewish Encyclopaedia - তে বলা হয়েছে ঃ "ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম)-এর প্রথম পাঁচটি পুস্তক (যেমন প্রাচীন ইয়াহূদী ধর্মীয় বর্ণনাসমূহ আমাদেরকে বলে) মূসা নবীর রচনা। শেষ আটটি শ্লোক বাদে [যেগুলোতে মূসা (আ.)-র ইনতিকালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে] রিব্বী (ইয়াহুদী 'আলিম) এই বৈপরীত্য ও একে অপরের থেকে ভিন্ন বর্ণনার ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যা এসব সহীফায় এসেছে এবং এর মধ্যে আপন প্রজ্ঞা ও মেধার সাহায্যে সংস্কার- সংশোধন করে থাকে।"[১]

ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের সম্পর্ক যতখানি, যেগুলোকে "নিউ টেস্টমেন্ট বা নতুন নিয়ম" বলা হয়, সেগুলো শব্দগত ও অর্থগতভাবে আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে দূরতম সম্পর্কও নেই। এ ব্যাপারে তারাই সন্দেহ নিরসন করতে পারেন যারা এগুলো পড়ে দেখেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই, এসব পুস্তক জীবনী ও কাহিনীমূলক পুস্তক হিসেবেই অধিক প্রতিভাত। আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব হিসেবে, যার ভিত্তি হয় ওহী ও ইলহাম, তা এতে খুবই কম দৃষ্ট হয়।[২]

এর পরের নম্বরে আসে জযীরাতুল আরবের তথা আরব উপদ্বীপের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের যা একে দাওয়াতের কেন্দ্র হিসেবে সর্বাধিক উপযোগী রূপ দান করেছে, যেখানে থেকেই এই দাওয়াত ও পয়গাম সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দেয়া যায় এবং পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা যায়। একদিকে এটি এশিয়া মহাদেশের একটি অংশ, অপরদিকে তা আফ্রিকা মহাদেশ, এরপর

১. Jewish Encyclopaedia; Vol. 8. p. 589.

২. বিস্তারিত দ্র. লেখকের منصب نبوت এর ৭ম খণ্ড বক্তৃতা ختم نبوت এর আসমানী সহীফা কোরআন জ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে নামক অধ্যায়।

ইউরোপেরও কাছাকাছি এবং এসব সেই এলাকা যা সভ্যতা ও কৃষ্টি, জ্ঞান ও শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শনের সর্বদাই কেন্দ্র থেকেছে এবং যেখানে বিরাট বিস্তৃত ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে। অতঃপর এই এলাকা বাণিজ্যিক কাফেলার অতিক্রমস্থলও ছিল যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের লোক একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতো। এটি ছিল কয়েকটি মহাদেশের সঙ্গমস্থল এবং এক জায়গার নির্দিষ্ট বস্তুসামগ্রী ও উৎপাদিত দ্রব্য, যেখানে এর প্রয়োজন পড়ত, সেখানে স্থানান্তরিত করত।[১] এই আরব উপদ্বীপ দু' বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মাঝে অবস্থিত ছিল খ্রীস্টান শক্তি ও অগ্নি উপসাক শক্তি, প্রাচ্য শক্তি ও পাশ্চাত্য শক্তি। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তারা নিজস্ব স্বাধীনতা ও আপন ব্যক্তিত্বের সর্বদাই সংরক্ষণ করেছে এবং নিজেদর কতিপয় সীমান্ত এলাকা ও কয়েকটি গোত্র ব্যতিরেকে তারা কখনো ঐ সব শক্তির অধীনতা স্বীকার করেনি। আরব উপদ্বীপ বিনা প্রশ্নে নির্দ্বিধায় নবুওতের এমন এক বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারত যা আন্তর্জাতিক রেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, মানবতাকে সমুন্নত মঞ্চ থেকে সম্বোধন করবে, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক চাপ ও বিদেশী প্রভাব থেকে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন হবে।

এই সমস্ত কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আরব উপদ্বীপ ও মক্কা মুকাররামাকে রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাব, আসমানী ওহীর অবতরণ ও দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রচারের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রে ও সূচনাবিন্দু হিসেবে নির্বাচিত করেন।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ـ

"আল্লাহই বেশী জানেন তাঁর পয়গাম কোথায় এবং কাকে সোপর্দ করা হবে।" [সূরা আনআম ঃ ১২৪]

---

১. ড. হুসায়ন কামালুদ্দীন রিয়াদ ভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি। তিনি এক সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন, তিনি এক নতুন ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে উপনীত হয়েছেন, যদ্দারা প্রমাণিত হয়, মক্কা মুকাররামা পৃথিবীর শুষ্ক অংশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তিনি তাঁর গবেষণার সূচনা করেছেন এমন একটি চিত্র দ্বারা যেখানে মক্কা মুকাররামা থেকে পৃথিবীর অপরাপর স্থানের দূরত্ব দেখানো হয়েছিল। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প মূল্যের এমন একটি যন্ত্রের নির্মাণ যা কেবলার দিক নির্ধারণ করবে। ইতোমধ্যে তাঁর কাছে এই সত্যও দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে গেছে, মক্কা মুকাররামা ঠিক দুনিয়ার মাঝখানে অবস্থিত। এই গবেষণা দ্বারা তাঁর সামনে এই রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে, মক্কা মুকাররামাকে বায়তুল্লাহর কেন্দ্র ও আসমানী হেদায়াতের সূচনাবিন্দু বানাবার মধ্যে আল্লাহর কি রহস্য ও কুদরত নিহিত ছিল। (দৈনিক আল- আহরাম, ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং)

সভ্যতা ও মানবতার উৎকর্ষ সাধনে নবুওয়াতের অবদান

[১৯৬২ ডিসেম্বর শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায-এর আমন্ত্রণে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ]

স্থানের উপযোগিতা

সুধি! আমরা ও আপনারা এখন যে স্থানে সমবেত হয়েছি, এখানে সবচেয়ে কল্যাণকর আলোচনা, মানবতার বিকাশে নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা ও সভ্যতায় এর অপিরিসীম অবদান সম্পর্কে আলোচনা রাখার জন্য উৎকৃষ্টতম স্থান। এখানে আলোচনা করা হবে বিশেষ বিশেষ আম্বিয়া-ই-কিরাম সম্পর্কে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়তের সম্মানে অলংকৃত করেছেন। আলোচনা করা হবে আল্লাহর কাছে তাঁদের স্বীকৃতি, তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান, সৃষ্টির ওপর তাঁদের অতুলনীয় অবদান ও জীবনের শিরা-উপশিরায় তাঁদের গভীর প্রভাব সম্পর্কে। অবশেষে ইমামুল মুরসালীন খাতামুন্নবিয়ীন (সা.) সম্পর্কে কল্যাণকর আলোচনা হবে, আল্লাহতা'আলা যাঁকে সর্বশেষ রিসালত, সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন নবুয়তের সম্মানে অনন্য করেছেন, যাঁকে দান করা হয়েছে স্থায়ী কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, সনাতন ও সার্বজনীন শরীয়ত এবং সুরক্ষিত ও চিরঅম্লান কিতাব। আর মানবকুলের সৌভাগ্য ও মুক্তি (শ্রেণীগত ও ভাষাগত তারতম্য সত্ত্বেও) তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন ও তাঁর পদাংক অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে, যাঁর হিজরত ও সর্বশেষ বাসস্থানের জন্য এমন এক পূত ও পবিত্র নগরীকে চয়ন করা হয়েছে, যেখানে ওহী ও রিসালাতের মাধ্যমে আসমানের সাথে যমীনের শেষবারের মত মিলন ঘটে।

সুতরাং এ সম্মানিত জায়গায় কিছু বক্তব্য রাখার যাঁর সুযোগ হবে এবং যিনি এ সম্মান লাভ করবেন, তাঁকে এ মহান ও নাজুক দায়িত্বের প্রতি পুরোপুরি সচেতন হতে হবে, তিনি কেমন স্থান থেকে বক্তব্য রাখতে চলেছেন। এই 'মাকামে মাহ্মূদ' বা প্রশংসনীয় জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট দিকগুলো এড়িয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অন্য কোন আলোচ্য বিষয় স্থির করা কি তার জন্য সঙ্গত হবে? এটা ঈমান, বিবেক ও ইহ্সানেরও দাবি। আরব কবি সম্ভবত এর প্রেক্ষাপটেই বলেছেন ঃ

ولمانزلنا منزلا طله الندى -
اتيقا ولبستانا من النور جاليا -
اجدلنا طيب المكان وحسنه -
منى فت منئه فكنت الامانيا -

এবং আমরা যখন এক শিশির সজীব ও নয়ন জুড়ানো স্থান ও ফুলের কুঁড়িতে সুশোভিত বাগানে অবতরণ করি, তখন স্থানের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা জাগিয়ে দেয় আমাদের মনে একগুচ্ছ আশা। আমাদের সেসব আশার প্রাণ ছিল পক্ষান্তরে তুমি-ই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব

মুসলিম বিশ্বের যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা স্বয়ং রাসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, নবুওয়তের নিয়ামত যথাযথ অনুধাবনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। আল্লাহ্ পাক এই নিয়ামতের চেয়ে বড় কোন নিয়ামত আর একটিও নাযিল করেন নি। আর সে নিয়ামতের সকৃতজ্ঞ মূল্যায়ন তার সক্রিয় সমর্থক ও আহ্বায়কদের মধ্যে হবে এবং জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেখানে অজ্ঞতা, আল্লাহদ্রোহিতা ও বিপ্লবের পতাকা চতুর্দিকে পতপত করছে, সেখানে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুহাম্মদী পতাকা ও তার আদর্শ শিবিরের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হবে এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করবে, হোক তা গবেষণা ও বিশ্বাস্য বিষয়ক অথবা কর্ম, শৃঙ্খলা, চরিত্র ও সামাজিক বিষয় কিংবা কৃষ্টি-কালচার ও রাজনৈতিক বিষয়ক।

যে কোন ইসলামী জ্ঞান-গবেষণাগারের শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অনুরাগীদের সার্বক্ষণিক আচার-অনুষ্ঠান ও তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু থাকতে হবে নবুয়ত, নবুয়তের কর্মধারাকে অন্য সব চিন্তা ও দর্শন, মত ও পথ, ধ্যান-ধারণার যাবতীয় ঢং, জীবনের সমস্ত রং এবং মানবতা ও সভ্যতার হরেক অভিপ্রায়ের ওপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেয়া।

আজকালকার ইসলামী গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব ইল্‌মী কর্মসূচীর দিকে মনোনিবেশ করে চলেছে এবং যেসব বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের দাবিদার হচ্ছে ঐ মৌলিক দায়িত্বটা এসব থেকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য। কেননা যদি কোন বিরামহীন ও সত্যিকার ফায়সালা দানকারী সংঘাত নামে কিছু থাকে, তবে সেটা হচ্ছে নবুয়ত ও জাহিলিয়াতের বা অজ্ঞতার সংঘাত। এ জাহিলিয়াতের নেতৃত্ব দিচ্ছে পাশ্চাত্য জগত। আর সে ইসলাম (সত্য ধর্ম) যার পতাকাবাহী হবে একমাত্র মুসলমান অবশিষ্ট রয়েছে। এ সংঘাত ছাড়া বাকী সব সংঘাত হচ্ছে কৃত্রিম ও গৃহযুদ্ধ। যে যুদ্ধে একই গোত্রের লোক সাধারণ বস্তু নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ে কিংবা স্বল্প বুদ্ধির দরুন শিশুদের ন্যায় ঝগড়ায় মেতে ওঠে। কিন্তু চিন্তা ও গবেষণার দ্বন্দ্ব আবহমানকাল ধরে জাহিলিয়াত ও নবুয়তের মধ্যেই বিরাজ করছে।

এসব দিকের আলোকে ও এখানকার মহতী অধিবেশনের সূচনা (যেগুলোর আজ প্রথম দিন) উল্লিখিত দিকধারা অনুপাতে হওয়া যথোচিত হবে, যেহেতু এটা রাসূলল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র শহর, ইসলামের সূতিকাগার, ঈমানের প্রাণকেন্দ্র ও ওহী নাযিল হওয়ার স্থান আর নবুয়তের সুদীর্ঘ সফর ও বিরাট ইতিহাসের শেষ গন্তব্যস্থল।

এ যুগে আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা

আর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি বড় বড় বিজ্ঞানাগার, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, ইল্‌মী সমিতিগুলো, জাতিসংঘ ও এর বিশ্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো তথা সর্বত্রই এই আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ সৌভাগ্য, শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানবতার আজ চরম দুর্গতি দেখা দিয়েছে এবং আধুনিক সভ্যতার দুর্ভাগ্য এই, এ সভ্যতার যারা ধারক ও বাহক তারা নবুয়ত ও নবীদের (আ.) শিক্ষার চরম বিদ্রোহী সেজেছে। তারা জীবন ও সভ্যতার নীলনকশা নবুয়তের আদর্শের বহির্ভূত পথে পরিচালিত করতে চাচ্ছে। আর পোষণ করছে আল্লাহর অবদানের প্রতি অহংকার ও অনীহা, যা প্রদত্ত হয়েছিল উম্মী নবীকে, ভাব-ভঙ্গিতে তারা অতীত বর্বর সমাজগুলোর সে অহংকারাত্মক উক্তিটারই পুনরাবৃত্তি করছে, কুরআনে পাকের ভাষায় বিবৃত হয়েছে ঃ ابشر يهدوننا "আমাদেরই মত মানুষ কি আমাদেরকে হিদায়াত দিতে চলেছে?" এমন একজন উম্মী আমাদেরকে কি জ্ঞান শেখাবে? এরূপ একজন নিঃস্ব ফকীর আমাদেরকে কি সুখী স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে? আমাদেরকে কি সুসভ্য করে গড়ে ওঠাবে মরুভূমির এ যাযাবরটি?

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিংবা প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি আমরা এসব জিনিস ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তুলে ধরতে সক্ষম না হই, তাহলে কি কখনো সম্ভব হবে না, কমপক্ষে মদীনার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটিকে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করা? আর কেনই বা হবে না? এতো সেই মদীনা মুনাওয়ারা, যা সব সময়ে আধ্যাত্মিকতার ও নেহায়েত সুদক্ষদের বীজ বপনের উর্বর ক্ষেত্র এবং মুবারক সংরক্ষিত ভূমি যা তাদের জন্য যুগে যুগে সুফলা সাব্যস্ত হয়ে এসেছে। যে নগরী আল্লাহ্‌পাকের নিম্নোক্ত বাণীরই সত্যিকার বাস্তবায়ন ঃ

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ -

"এবং (লক্ষ্য কর) যমীন খুবই উর্বরা, এ এর প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে উত্তম ফলনই দিচ্ছে।" [সূরা আ'রাফ ঃ ৫৮]

এখানে যা আলোচিত হয়েছে সারা বিশ্বে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

আল-কুরআনের আলোকে নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম

মুতাকাল্লিম বা কালামশাস্ত্রবিদগণের আত্মা থেকে নিষ্কৃতি প্রার্থনার মাধ্যমে আমি এ মন্তব্যটুকু করতে বাধ্য হচ্ছি, মূলত 'ইলমে কালাম ও 'আকাঈদের কিতাবাদি নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরামের ব্যাপারে নিতান্তই সংকীর্ণ ও সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। এ সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নবুয়তকে একদিকে এমন গতিহীন ও প্রাচীরাবদ্ধ ভাবধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা আকাঈদের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে জীবনের অন্যান্য দিকের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য কালামশাস্ত্রের তদানীন্তন বাধ্যবাধকতা ও সীমিত পাঠ্য পদ্ধতি অবলম্বনের একটা সুনির্ধারিত পাঠ্য পরিক্রমার আবশ্যকতাও যে ছিল সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ কারণেই আমরা নবুয়ত ও আম্বিয়া বিষয়দ্বয়কে কুরআনের আলোকে ও কুরআনের দৃষ্টিতে দেখা বাঞ্ছনীয় মনে করি। এ প্রজ্ঞাময় কিতাবেরই নির্দেশিত লক্ষ্যে নবুয়তের সম্ভাব্যতা, নিগূঢ় তথ্য, এর সুপরিসর দিগন্ত ও গভীরতা সম্পর্কে ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। আজ চিন্তা করার দরকার হয়ে পড়েছে জীবনের ওপর নবুয়তের মাধ্যমে নাযিলকৃত মৌলিক বিষয়গুলো এবং হৃদয় ও দৃষ্টি, চরিত্র ও অভিরুচির ওপর এটার প্রভাব ও প্রতিফলন নিয়ে। আজ গবেষণা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সমাজ ও সভ্যতার একটা নীল নকশা নিয়ে, এমন কি এই কুরআনের গঠনমূলক অবস্থানগুলোকে নিয়ে বর্বরতার পাশাপাশি একটি অনুপম ও অনন্য সভ্যতার ভিত্তি রাখার উদ্দেশে।

অনুপ্রেরণাদায়ক ও প্রিয় আলোচ্য বিষয়

আমরা যখন যে উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করি, তখন সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এমন কিছু দৃশ্য ও রাজকীয় রূপরেখা মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যার সমতুল্য আকর্ষণীয় সৃষ্টি দ্বিতীয়টি নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। নবী (আ.)-গণের আলোচনায় কুরআন গবেষণা করলে দেখা যায় তাঁদেরই জীবন প্রণালী, তাঁদেরই খুশি ও সুসংবাদ এবং তাঁদেরেই ভালবাসা দিয়ে এই কুরআন পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন এই কুরআন প্রেমাস্পদের হৃদয়গ্রাহী ঘটনা ও সুমধুর আলোচনা গ্রন্থ! এতে যত দীর্ঘ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনা হোক না কেন এবং যত রঙ-বেরঙ ও শাখা-প্রশাখাই টানা হোক না কেন, খুবই কম মনে হয়।

لذيذ بود حكايت در از ترگفتم ـ

"যা উপস্থাপিত করেছি, আসল মূল ঘটনাটি তার চেয়ে অধিক দীর্ঘ ও চিত্তাকর্ষক ছিল।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি বিবেক, সঠিক রুচি ও ভালবাসার ন্যূনতম অধিকারী হবেন, তিনি এ আলোচনায় প্রাণভরা আনন্দ পাবেন, অনুধাবন করবেন এক অপূর্ব তৃপ্তি।

এবারে শুনুন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা কেমন ভালবাসা ও মাধুর্যের সাথে করা হচ্ছে ঃ

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ - اِجْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَإِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ - ثُمَّ اَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম মানুষদের পথিকৃৎ এবং আল্লাহর অনুগত ছিলেন। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাঁকে যেমন ইহলোকে দান করেছি সৌন্দর্য তেমনি পরকালেও তিনি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন সত্যবাদীদের। অতঃপর আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম, আপনি ইবরাহীমের নিখুঁত দীনের অনুসরণ করুন। ইবরাহীম মুশরিকদের কাতারভুক্ত নন।" [সূরা নাহ্ল ঃ ১২০-১২৩]

অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ পাঠ করুন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ إِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهِ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَ إِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ط وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَ

هَدَ يْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ـ فَاِنْ يَّكْفُرْبِهَا هٰٓؤُلَاءِ فَقَدْوَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ـ

"এবং এটা আমার যুক্তি, যা দিয়েছিলাম ইবরাহীমকে তাঁর সমাজের মুকাবিলায়। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। অবশ্যই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী এবং তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। তাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করলাম এবং এর পূর্বে নূহকেও সঠিক পথে চালিয়েছিলাম। এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। অনুরূপই আমি নিষ্ঠাবানদেরকে তাদের কর্মের সুফল দিয়ে থাকি। এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসমাঈল, আল-ইসায়া, ইউনুস ও নূহকেও। তাঁদের প্রত্যেককেই আমি নিখিল বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এবং তাদের কতিপয়ের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতৃবৃন্দকেও দিয়েছি সে শ্রেষ্ঠত্ব। তাদেরকে নবী হিসেবে মনোনীত করে সঠিক ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছি। এটাই মহান আল্লাহর প্রদর্শিত পথ। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান এর মাধ্যমে হিদায়ত দান করেন। যদি তারা শির্ক করত তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান বরবাদ হতো। এরাই তারা যাদেরকে প্রদান করেছি আসমানী কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত। সুতরাং মক্কাবাসিগণ যদি এগুলোর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, আমি সেক্ষেত্রে এমন এক সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করেছি যারা এগুলোকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে না।" [সূরা আল-আন'আম ঃ ৮৩-৮৯]

নির্বাচিত সৃষ্টি ও মানবতার নিষ্কলুষ আদর্শ

কুরআন মজীদ আম্বিয়া-ই-কিরামকে কখনো কখনো স্মরণ করেছে ইস্তিফা (মনোনয়ন), ইজতিবা (চয়ন), মহব্বত ও সন্তুষ্টির শব্দ দ্বারা, আবার কখনো কখনো তাঁদেরকে উন্নত প্রশংসাবলী, যৌক্তিক, চারিত্রিক ও আমালী যোগ্যতার যথাযথ বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসব দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়, নবীগণই সৃষ্টির নির্যাস, মানবতার নিষ্কলঙ্ক আদর্শ ও আল্লাহ্ পাকের বার্তা বহন ও দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য ও নৈপুণ্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গই হয়ে থাকেন।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ـ

"রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় রাখা যায়, এ সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।" [সূরা আল-আন'আম ঃ ১২৪]

হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ـ

"আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৫১)

আরো বলা হয়েছে ঃ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا

"এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমকে বন্ধু করে নিয়েছিলেন।"

[সূরা আন-নিসা ঃ ১২৫]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ ـ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে ইবরাহীমের পুণ্য স্মৃতি টিকিয়ে রেখেছি, ইবরাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! পুণ্যবানদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরই একজন ছিলেন।"

[সূরা আস-সাফফাত ঃ ১০৮-১১১]

এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ

"অবশ্যই ইবরাহীম নিতান্ত ধৈর্যশীল, কোমল-প্রাণ ও আল্লাহঅভিমুখী ছিলেন।" [সূরা হুদ ঃ ৭৫]

এদিকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ـ

"তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে অতীব প্রিয় ছিলেন।" [সূরা মারইয়াম ঃ ৫৫]

হযরত মূসা (আ.)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ـ

"আর আমি তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরি করেছি।" [সূরা ত্বহা ঃ ৪১]

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِنِّيْ - وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ -

"এবং মূসা! আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করেছি। (তোমার সাথে মানুষ সদাচরণের জন্য) যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।" [সূরা তাহা ঃ ৩৯]

তাঁর সম্পর্কে আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ -

"আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" [সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৪]

হযরত দাউদ (আ.)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ - اِنَّهٗ اَوَّابٌ -

"এবং আমার বান্দাহ শক্তিধর দাউদকে স্মরণ করুন। অবশ্যই তিনি (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারীদেরই একজন ছিলেন।" [সূরা সাদ ঃ ১৭]

তাঁরই যোগ্য উত্তরসুরি সন্তান হযরত সুলায়মান (আ.)-এর স্মরণে বলা হয়েছে ঃ

نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗ اَوَّابٌ -

"সুলায়মান নেহায়েত উত্তম বান্দা ছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যাবর্তনকারীদের একজন ছিলেন।" [সূরা সাদ ঃ ৩০]

অনুরূপ হযরত আইয়ুব (আ.)-এর মর্যাদাসম্পন্ন এক জামাত নবী (আ.)-এর প্রতি ভালবাসা, সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের উচ্চাঙ্গের গুণাবলী বিশেষ ভঙ্গিতে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَ الْاَبْصَارِ* اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ - وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ -

"এবং আমার কতিপয় ক্ষমতাবান ও বিচক্ষণ বান্দা, যেমন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করুন। আমি তাঁদেরকে পরপারের ইয়াদের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ দিয়ে অলংকৃত করেছি। এবং তাঁরা আমার নিকট মনোনীত ও নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।" [সূরা সাদ ঃ ৪৫-৪৭]

এ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও যে আপনারা কুরআন পাকের তাত্ত্বিক গবেষণা করে থাকেন এবং আমার আলোচনা আপনাদের কাছে অভিনব কিংবা নতুন কিছু যে উপস্থাপন করবে এমন কিছু নয়, তথাপি এ মনোরম ও আনন্দদায়ক আলোচনা মঞ্চে আমার বক্তব্যটা দীর্ঘায়িত করার কারণ হচ্ছে এই, আল্লাহ্ পাকের কাছে নবী (আ.)-দের সম্মান, মর্যাদা ও তাঁদের সম্পর্কে কুরআনের ভাষায় উচ্চারিত উচ্চাঙ্গের প্রশংসাবলী ও গুণাবলী আপনাদের হৃদয় সমীপে তুলে ধরা। কুরআন তাঁদেরকে আদর্শ চরিত্র, উত্তম ও উন্নত গুণাবলীর দিশারী বলে ঘোষণা করেছে।

কুদরতী প্রশ্ন

এ পার্থিব জীবনে জ্ঞান অর্জন, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার চাহিদা মোচন একমাত্র ইন্দ্রিয়রাজি ও বুদ্ধিগত যোগ্যতার ওপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ এ ইন্দ্রিয়শক্তির নির্দেশানুযায়ীই মানব জীবন অতিবাহিত হয়ে থাকে। এ জাগতিক জীবনে ইন্দ্রিয়রাজির নিরিখে একটা প্রশ্নঃ নবুয়তের সিলসিলা ও আম্বিয়া-ই-কিরামের মহত্ত্ব কতটুকু? অপরাপর সুধী ও বুদ্ধিজীবী থেকে কি বৈশিষ্ট্য দ্বারা নবীগণ শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে থাকেন? কেনই বা তাঁদের এ অধিকার, তাঁরা কিছু তত্ত্ব নিয়ে পর্যলোচনা করবেন, আর এমন এমন সংবাদ দেবেন, যা সূক্ষ্ম অনুভূতির নাগালেও আসে না, না সেখানে মেধাসম্পন্ন বিবেকের আরোহণ সম্ভব? অথচ সবাই একই সমাজে লালিত। একই ভূখণ্ডে জীবনাতিপাত করে চলেছে। এর কারণ কি, এরা অবলোকন করে ফেলবেন এমন অদৃশ্য কিছু যা তাঁদেরই সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানী ও মহামনীষী পর্যন্ত পারবেন না? অথচ সে অদৃশ্য জিনিসসমূহ প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রদীপ্ত হয় আর তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবে পরিণত হয়।

বস্তুত এটি একটি প্রাকৃতিক ও কুদ্‌রতী প্রশ্ন যা আবহমানকাল ধরে নতুন নবীর আবির্ভাবের সাথে সাথে জনমনে পয়দা হয়ে আসছে। মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করেছে। বিশ্বনবী (সা.) নবুয়তের সম্মানে বিভূষিত হয়ে তাব্‌লগি ও শুদ্ধিকরণের দায়িত্বে যখন নিয়োজিত হন, তখন তাঁকেও সে প্রশ্নের একান্তই মুখোমুখী হওয়ার কথা। নবী (সা.) সে পরিবেশে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যে দূরদর্শিতার সাথে উক্ত সমস্যাটির সমাধান দিয়েছিলেন, তা তাঁর অনন্য মু'জিযাসমূহের অন্যতম বৈ কিছু নয়।

আরব সমাজ, বিশেষ করে মক্কা-মরুতে বসবাসকারিগণ দীর্ঘকাল যাবত সূক্ষ্ম মাসআলা, ইলমী পরিভাষা, দর্শন ইত্যাদি থেকে হাত গুটিয়ে জীবন কাটিয়ে আসছিল, তবে আবার মন-মানসিকতার তীক্ষ্ণতা, সুষ্ঠু বিবেচনা, সত্যের প্রতি

শ্রদ্ধাবোধ ও ন্যায়ের সামনে শির অবনত করার জন্য তারা ছিল তখন বিশ্বসেরা। এ পার্থিব জীবনে নবীগণের মর্যাদা কতটুকু? অপরাপর যারা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়রাজি বিনে জ্ঞান হাসিলের অন্য মাধ্যম হতে বিমুখ, এদের মাঝে একমাত্র নবীগণেরই অদেখা তত্ত্বাবলী প্রকাশ করার অধিকার থাকে কিভাবে? নবী (সা.) উপরিউক্ত জিজ্ঞাসাটার এমন ফায়সালা প্রদান করেছেন, যেখানে আরববাসীদের সে বিশেষ গুণটির পুরোপুরি মিল লক্ষ্য করা যায়। তারা সে প্রজ্ঞাজনিত প্রকাশভংগী প্রতিপক্ষ ভাষাবিদ ও দর্শনশাস্ত্রবিশারদদের সহস্র যুক্তির চেয়ে ছিল অধিকতর সক্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী। এর জন্য তাঁর গৃহীত কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি শ্রোতৃমণ্ডলীদের সুষ্ঠু মানসিকতা, জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধি এবং স্থান ও পাত্রের পুরো সামঞ্জস্য বজায় রেখে সন্নিবেশিত হয়েছিল। আম্বিয়া-ই-কিরামদের সবার অবস্থা মূলত এমনই ছিল। তাঁরা স্বীয় নবুয়তের সত্যতা প্রমাণে বানোয়াট লৌকিকতা, অলংকার জ্ঞান ও ইশারা-ইঙ্গিতের ধার ধারতেন না, বরঞ্চ তাঁরা ছোট ও সাধারণ বিষয় দ্বারা বহু মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বের করে দেখিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে একে তো ছিল না সাংবাদিকতা, ছিল না বেতারযন্ত্রের ব্যবস্থাপনা, এমন কি ছিল না স্বরকে একটু উচ্চ করা বা ছড়ানোর মেশিনটিও। এমন একটি যুগে মক্কা মরুর সমস্ত বাসিন্দাকে এক জায়গায় এক সুনির্দিষ্ট সময় একত্র করার কি ব্যবস্থা হতে পারে? কিভাবে তাদের মন-মস্তিষ্কে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যদ্দারা তারা স্বীয় অভিরুচির মোহ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে সবাই এক হয়ে নবী (সা.)-এর দিকে (ত্রাণের জন্য) ছুটে আসবে?

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন আরব সমাজেই প্রতিপালিত একজন সদস্য। পূর্ব থেকেই তাদের আচরণাদি, প্রথা ও রীতিনীতির সাথে তাঁর বেশ সম্পৃক্ততা ছিল, এমন কি তিনি ওসব রীতিনীতির মোহ তাদের মানসিকতা ও সমাজের শিরা-উপশিরাই কতটুকু শিকড় গেড়ে বসেছিল, সে সম্পর্কেও ওয়াকিফ ছিলেন। সে সুকঠিন ও সূক্ষ্ম কাজে মহানবী (সা.) তাঁর অভিজ্ঞতাকে পুরো সদ্ব্যবহার করেছিলেন। আরবদের চিরাচরিত প্রচলন ছিল তাদের কেউ কোন বিপদ আঁচ করলে, যেমন শত্রুর আকস্মিক আক্রমণের আশংকা অথবা শত্রুপক্ষের সুযোগ তল্লাশী ইত্যাদি, সাথে সাথে ছোট পাহাড়ের চূড়া কিংবা গুহায় আরোহণ করত এবং উচ্চৈঃস্বরে এই বলে চিৎকার করে উঠত, "ইয়া সাবাহ" (ধ্বংস ধ্বংস), "ইয়া সাবাহ" (শত্রু শত্রু)। এই বিকট ধ্বনি শোনামাত্রই সমাজের লোকজন আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ত, হাতিয়ার গুছিয়ে নিত এবং বিপদ বা শত্রু প্রতিহত করার নিমিত্ত এগিয়ে আসত। সে ভয়ংকর বস্তুটি কি ছিল, যা এক সঙ্গে তাদের

সবাইকে বিষাদাচ্ছন্ন করে তুলত এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তায় কুঠারাঘাত হানতঃ তা একটাই ছিল—শত্রু, যার লশকর এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিচ্ছিল। উট ও অন্যান্য জীবজন্তুকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সার্বিক ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টা করছিল তাদের। আরব উপজাতি ও মরুবাসিগণ এই একটিমাত্র বিপদের সাথেই জীবনে পরিচিত হয়ে আসছিল আবহমানকাল ধরে। সুতরাং তারা যখনি ওসব শব্দ শুনত, সেই একটি অর্থই তারা ধরে নিত।

ওসব পার্থিব অসুবিধা ও ভয়াবহতার গুরুত্ব যে অনস্বীকার্য তা স্বীকৃত বটে; কিন্তু নবীগণের দূরদৃষ্টির সামনে তা তুচ্ছ। কারণ তাঁরা বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তার অস্তিত্ব, গুণাবলী ও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার ভয়াবহ পরিণতি সংক্রান্ত বিষয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সজাগ থাকেন তাঁরা বর্বরতাচ্ছন্ন বিষাক্ত জীবন সম্বন্ধেও, যার মধ্য দিয়ে তদানীন্তন মক্কাবাসিগণ কালাতিপাত করছিল। তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতেন আরবের বর্বরতাক্লিষ্ট সমাজে অনুপ্রবিষ্ট অনাচার ও দুশ্চরিত্রতা সম্পর্কেও। "তারা প্রতিমা পূজা করত, মৃত জীব খেত, অশ্লীলতায় মত্ত থাকত দিবি এবং আত্মীয়দের সূত্রবন্ধন ছিন্ন করত অহরহ। জ্বালাতন করত প্রতিবেশীদেরকে। বিত্তশালীরা প্রায়ই দুর্বলদেরকে শোষণ করে বেড়াত।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপলব্ধি করলেন, দুশমন তো মূলত বাইরে নয়, বরঞ্চ তা আসন জুড়ে আছে জনগণের মন-মস্তিষ্কে, আকাঈদ ও চরিত্রে। যত বহিঃশত্রু আছে তদপেক্ষা এ দুশমন অধিকতর ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক। অনিষ্টের এ স্রোতধারা প্রবহমান তাদেরই সত্তা এবং তাদেরই অভ্যন্তর থেকে যা বাহ্যিক ক্ষতি সাধনকারী কার্যকলাপ থেকে প্রকট, যেগুলোর উদাহরণ তারা বর্বরতার দীর্ঘ কালে স্থাপন করে আসছিল অথবা আরবীয় গোত্রীয় জীবনে অহরহ যেগুলোয় তাদের আক্রান্ত হতে হয়েছিল, তাদের প্রবৃত্তিজনিত আত্মদ্রোহিতা প্রতিটি শত্রু গোত্র অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শত্রু ছাউনি অপেক্ষা বহু ক্ষতিকর ছিল। তাদের এ অভিশপ্ত জীবন-প্রণালী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ক্রোধানলকে তীব্র করে তুলছিল। কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের নাস্তিকতাকে আদৌ অনুমোদন করেন না। বসুন্ধরায় কিঞ্চিৎ কোলাহল সৃষ্টি হোক, তাও তিনি চান না।

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের সময়ের জাহিলী যুগের এই চিত্রটি যথাযথভাবে তুলে ধরেছিলেন হযরত জাফর ইবন আবূ তালিব (রা.)। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সমীপে তাঁর পরিবেশিত ভাষণের কিয়দংশ পেশ করা হলো।

সাফা পাহাড়ের উপকণ্ঠে

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) ঊষালগ্নে সাফা পাহাড়ে তশরীফ আনলেন। এটি মক্কারই সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে আগমন করে তিনি উচ্চ স্বরে আওয়ায দিলেন, "ইয়া সাবাহাহ্", "ইয়া সাবাহাহ্।" মরুবাসীদের মনে একথা চিরন্তন সত্য হিসেবে গাঁথা ছিল, এই আওয়ায উচ্চারিত হয় যথাস্থলে ও বিপদসংকুল পরিবেশে। আর সাধারণত এতে মিথ্যা, প্রতারণা অথবা হাসি-তামাশার লেশটুকুও থাকে না। মক্কাবাসীদের এ সুবিদিত আওয়ায এমন এক ব্যক্তিত্বের কণ্ঠ থেকে আজ বের হচ্ছিল, যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। তাঁকে তারা সাদিক (সত্যবাদী) ও বিশ্বস্ত উপাধিতে বিভূষিত করেছিল পূর্বেই। সে আওয়াযের রহস্য তারা খুবই জানত। কারণ অভিজ্ঞতা ও ঘটনা প্রবাহের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস তাদেরই সামনে উপস্থিত ছিল। তারা সে আওয়াযের দিকে অগ্রসর হতে একটুও কুণ্ঠাবোধ না করে সমবেত হয়ে গেল। কেউ নিজেই এল আবার কেউ প্রতিনিধি প্রেরণ করল।[১]

সবাই একত্র হলে রাসূল (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে বনী 'আব্দুল মুত্তালিব! হে বনী ফিহ্‌র! হে বনী কা'ব! তোমাদের অভিপ্রায় কি? আমি তোমাদের সামনে যদি এই ঘোষণা দিই, এই পাহাড়ের পাদদেশে একদল অশ্বারোহী সেনা লুক্কায়িত আছে এবং তোমাদের অজান্তে তারা তোমাদের ওপর আক্রমণের প্রহর গুণছে, তোমরা আমার এ ঘোষণায় আস্থা রাখবে কি? রাসূলে আরবী (সা.) যাদেরকে সম্বোধন করেছিলেন এবং যাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তারা 'অশিক্ষিত' ও 'অনুন্নত' ছিল। তারা ফালসাফা ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেনি এবং তারা কোন বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করায় অভ্যস্ত ছিল না, বরঞ্চ (আমি পূর্বেই বলেছি) তারা ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও কর্মঠ। আল্লাহ্ পাক বিবেক ও মুক্তবুদ্ধি (Common sense)-এর এক বিরাট অঙ্গ তাদেরকে দান করেছিলেন। তারা তাই অবস্থান ও পরিবেশটি পর্যবেক্ষণ করল। ভাষণদাতা যেই স্থানটিতে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেটার প্রকৃতিগত অবস্থা অবলোকন করল।

তারা ভাবল এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা ও শুভকামিতা পরীক্ষিত হয়েছে একাধিকবার, এখন তিনি একটা ছোট পর্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট, তিনি সামনে তো দেখতে পাচ্ছেনই, তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী রয়েছে, সাথে সাথে এ পর্বতের পাদদেশে সে প্রান্তটিও দেখতে পাচ্ছেন, এখানের শ্রোতাদের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছতে অক্ষম। তারা তখন কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয়ের পক্ষপাত না করে উপলব্ধি করতে পেরেছে, যার মর্যাদা এমন হবে, তার অধিকার আছে

১. আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮।

পাহাড়ের পাদদেশে লুক্কায়িত শত্রু কিংবা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক-সংকেত পেশ করার। আর যাদের সামনে পাহাড়টি প্রতিবন্ধক, তাদের এ অধিকার থাকতে পারে না বা তাঁকে মিথ্যে বলে আখ্যায়িত করার ও তাঁর দেয়া খবরটি এ বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয়ার যে, তারা সংকেতদাতার সাথে তা প্রত্যক্ষ করায় শরীক রয়নি। প্রকারান্তারে বিরাজমান অন্তরায় সৃষ্টিকারী পাহাড়টিই তাদের অবস্থা ও ভাষণদাতার অবস্থার মাঝখানে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর পাহাড়ের চূড়ায় দণ্ডায়মান ভাষণদাতাকে অন্যদিকে দৃষ্টি দান ও সাক্ষ্য প্রদানের একক সুযোগ দিয়ে দিয়েছে।

আরববাসিগণ নিরপেক্ষমনা ছিল। তারা ছিল সুনিপুণ ও সত্যপ্রিয়। প্রতিউত্তরে তারা বলল, "হ্যাঁ! আমরা এ জাতীয় ঘোষণা করতে পারি না। আমাদের তা মেনে নিতেই হবে।"

নবুওয়তের দর্শনগত রূপ

নবী (সা.) নবুয়তের এ বিরল আল্লাহপ্রদত্ত হিকমত, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনন্য প্রতিভা দ্বারা নবীগণ নবুয়তের অনুপম মাহাত্ম্য ও অতুলনীয় মর্যাদার রূপরেখা অংকন করে আরববাসীদের সামনে উপস্থাপন করলেন। নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এই তথ্যটির দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন—নবীগণ অবলোকন করেন এমন এক জগৎ, যা তাঁদের সমসাময়িক আর কেউ পারেন না। তাঁরা এমন ঘটনাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিতে সক্ষম, অন্যান্য নায়ক ও সংস্কারকগণ যার স্বাক্ষর পেশ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। আর তা এজন্য, তাঁরা নবুয়তের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে আছেন। মানুষ হিসেবে অনুভূতির পবিত্রতা ও স্বভাবগত শালীনতার কারণে দৃষ্ট বিশ্বকে তাঁরা সুস্থ বুদ্ধি ও সুষ্ঠু চিন্তার মানুষের মতই দেখে থাকেন। অধিকন্তু আল্লাহপ্রদত্ত নবুয়ত (আল্লাহর খুশি অনুযায়ী) যেহেতু অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে তাই তাঁরা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নবুয়তের জগতের অদৃশ্য রহস্যাবলীও অবলোকন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ -

"বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, (তবে) আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" [সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১১০]

একজন মানুষ যত বড় মেধাসম্পন্ন বিজ্ঞ কিংবা বিশেষজ্ঞই হন না কেন, তার জন্য এটা সম্ভব হবে না, নবীগণ মিথ্যারোপ করবে অথবা তাঁদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়াদিকে প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা এরা নবীগণের পর্যবেক্ষণে অংশীদার ছিল

না। যেসব জিনিস আম্বিয়া-ই-কিরাম দেখতে পান, এরা তা দেখে না। যেমনি পাহাড়ের নিম্নদেশে দণ্ডায়মান কারো জন্য কোন অবস্থাতেই সমীচীন হবে না পর্বতশৃঙ্গে আরোহীর উক্তিতে আপত্তি উত্থাপন করার এবং পর্বতের পেছনের খবরাদি ও পর্বতের পাদদেশে সংঘটিত ঘটনাবলীকে উপেক্ষা করার।

তাইতো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়রাজির গোলকধাঁধায় আক্রান্ত কেউ যদি এঁদের বিরুদ্ধে মেতে ওঠে এবং প্রমাণ পেশ করার পেছনে লেগে যায়, তখনি তাঁরা অবাক চিত্তে সার্বিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে ওঠেন ঃ

اَتُحَآجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِى -

"তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন।" [সূরা আন'আম ঃ ৮১]

নবুয়তের প্রথম যুগের সব নিরক্ষর আরববাসী সেসব দার্শনিক ও পণ্ডিতবর্গ অপেক্ষা অধিকতর বিচক্ষণ সাব্যস্ত হয়েছে, যারা আম্বিয়া ও রাসূলগণের খবরগুলো ও তথ্যরাজি একমাত্র এজন্যই উপেক্ষা করে দেয়ার চেষ্টা করছে, তারা কেন তা দেখবে না? সেসব জিনিস তাদের অজান্তে থাকবে কেন?

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَالَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ -

"আসল কথা হলো, যে বিষয়ের জ্ঞান তারা আয়ত্ত করেনি তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর রহস্য তাদের নিকট অনুদ্‌ঘাটিত।" [সূরা ইউনুস ঃ ৩৯]

এ প্রকৃতিগত, যুক্তিগত ও অনিবার্য স্বরগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একান্ত নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হলেন। সর্বশেষ স্তরে উপবিষ্ট হয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ

فانى ان هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد -

"আমি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।"

মহানবী (সা.) তাদেরকে সে বাস্তব ও স্থায়ী বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করলেন, যা বিরাজমান ছিল তাদের দৈনিক কর্ম পদ্ধতিতে, যার অনুসরণে কাটছিল তাদের জীবনধারা। তিনি তাদেরকে সতর্ক করলেন সেসব ভ্রান্ত ও অনর্থক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও, যেগুলো তাদের মন-মানসিকতায় বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। সেসব প্রতিমা সম্পর্কেও তাদেরকে সজাগ করলেন, যেগুলোর তারা অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিল। যেসব বিধ্বংসী চরিত্র ও রীতিনীতি তারা আঁকড়ে ধরেছিল, সেগুলো সম্পর্কেও তিনি দিলেন এক নতুন অনুভূতি। এক কথায় তারা তখন এক চরম

মূর্খতার ভেতর দিয়ে কাল যাপন করে আসছিল। শিক্ষা ও ঈমানবিমুখ ছিল তাদের মানসিকতা ও স্বভাব। ইনসাফ যে কি বা আল্লাহ্-ভীতি কাকে বলে, তা তো বুঝতই না তারা, যদ্দরুন সমাজ জীবনে বয়ে এসেছিল তখন ব্যাপক হাহাকার, সংকীর্ণতা, ব্যাকুলতা, মানসিক অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ ভয়াবহতা।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মফল তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা রূম ঃ ৪১]

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

"গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২১]

"অথচ এ জীবনের পর রয়েছে আর একটি শাস্তির জীবন। সে শাস্তির তুলনায় ইহলৌকিক শাস্তি ও কষ্টদায়ক জিনিস একেবারেই তুচ্ছ ও সামান্য।"

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ج

"এবং পরকালের শাস্তি তো কঠোর!" [সূরা আর-রাদ ঃ ৩৪]

وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى -

"পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিকতর স্থায়ী।"
[সূরা তাহা ঃ ১২৭]

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى -

"পরকালের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক।"
[সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ১৬]

সুধী ও বিজ্ঞ সমাজ ঐসব ক্রিয়া ও গুণ সম্বন্ধে জানতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন বস্তুর স্বভাব ও গুপ্ত সম্পর্কে অবহিত হয়ে তারা পরিজ্ঞাত বিষয়াদির এক মূল্যবান কোষাগার রচনা করে দিয়েছেন। ফলে উত্তরসুরিদের এতে বহু উপকার

হয়েছে। এ মহান কাজ যাঁরা সম্পাদন করেছেন, তাঁদের পরিশ্রম, তাঁদের ত্যাগ ও সাধনা, সফলতা ও সম্মানের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়। পরিশোধ করা হয় তাদের জয়ধ্বনির পাওনাটুকু, অথচ আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব, গুণাবলী, আদেশ-নিষেধ, তাঁর সন্তুষ্টি, আকীদা ও বিধি-নিষেধের বৈশিষ্ট্য ও শুদ্ধাশুদ্ধি, ভাল ও মন্দ চরিত্রের ফলাফলের দীক্ষা, আখিরাতের প্রতিদান, শান্তি ও অশান্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের যথাযথ পরিচিতি প্রদানের জন্য নবীগণকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী মনোনীত করেছেন। এই নশ্বর জীবনের পরের অবস্থানসমূহ ও তখন যা ঘটবে, যেমন হাশর, নশর, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান, সুফল ও প্রতিশোধের জ্ঞান অর্জন করার জন্য আম্বিয়া-ই-কিরামই হচ্ছেন একক মাধ্যম।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ـ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ـ

"তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানাধার, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত।" [সূরা জ্বিন ঃ ২৬-২৭]

আম্বিয়া-ই-কিরাম (দরুদ ও সালাম তাঁদের ওপর) নবুয়তের পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁরা দেখেন এই জগতকে। সাথে সাথে দেখে থাকেন অদেখা এক জগতকেও। আর মানবতা, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে অদূর ভবিষ্যতে কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে গেরিলা হামলা সম্পর্কে সতর্ক সংকেত তাঁরাই দিয়ে থাকেন। ঢাকা পড়া ধ্বংসাত্মক পরমাণু ও ক্ষতিকর জিনিসগুলোকেও ধরিয়ে দেন তাঁরাই। ভীতি প্রদর্শন করেন তাঁরা আপন সমাজকে নেহায়েত হৃদ্যতা, প্রেম, দয়া ও একনিষ্ঠতার সাথে। এদিকে যখন কেউ তাদের এই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার খর্ব করতে অপচেষ্টা করে এবং এহেন সুস্পষ্ট বিষয়টাতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মাহাত্ম্য ও বিশ্বস্ততাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে, তখন তাঁরা সৌহার্দ্য ও একনিষ্ঠতা নিয়ে পরিতাপ ও বেদনাদায়ক কণ্ঠে বলে ওঠেন ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا قف مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ـ

"বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দু-দু'জন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ-তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নন। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।" [সূরা সাবা ঃ ৪৬]

হিদায়তের একমাত্র মাধ্যম

এরই প্রেক্ষাপটে কুরআন একাধিকবার তাগিদ দিচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মৌল গুণাবলীর যথাযথ চিহ্নিতকরণে মনোনীত হয়েছেন একমাত্র নবীগণ। আল্লাহর সঠিক মা'রিফাত, যা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার নাগাল থেকে পূত-পবিত্র, ভুল ধারণা কিংবা সঙ্গতিহীন ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত, আর তা অর্জনের একক মাধ্যম তাঁরা-ই। তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ বিনে অন্য কোন সূত্র দ্বারা সে মা'রিফাত লাভ করা সম্পূর্ণ দুরূহ। শুধু যুক্তি-জ্ঞান এর কিঞ্চিৎ দিশা দিতেও অপারক এবং ধী-শক্তি ও মেধা এক্ষেত্রে অচল। তা চারিত্রিক ভারসাম্যের ব্যবস্থাও হতে পারে না। বুদ্ধিমত্তার তীব্রতা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অকেজো। জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুসন্ধান যেমনি সে পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ, অভিজ্ঞাতার কোষাগারও তেমনি সেক্ষেত্রে একেবারেই শূন্য। আল্লাহপাক জান্নাতবাসী কতিপয় সত্যবাদী অভিজ্ঞ মনীষীর ভাগ্য দ্বারা এ তথ্যটির বিশ্লেষণ দিচ্ছেন–যেখানে মিথ্যা বর্ণনা ও অতিরঞ্জিত কিছুর কোন প্রকার স্থান নেই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا قف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ـ

"প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আমাদেরকে আল্লাহ্ পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না।" [সূরা আ'রাফ ঃ ৪৩]

কুরআন সুস্পষ্টভাবে এ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে, নবীগণই সঠিক মা'রিফাত অর্জনের একমাত্র মাধ্যম এবং তাঁরাই আল্লাহর পরিচিতি লাভের দিশারী ছিলেন। সেই গন্তব্যস্থলে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে অনেকটা সক্ষম তাঁরাই।

لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ـ

"আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী এনেছিল।"

[সূরা আ'রাফ ঃ ৪৩]

এসব কথা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, আম্বিয়া-ই-কিরামের আবির্ভাবের ফলেই এটি সহজ হতে পেরেছে। এজন্য আল্লাহর মা'রিফাত অর্জন করা, তাঁর সন্তুষ্টি ও বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া আর সে মুতাবিক নিজেদেরকে সুশোভিত করা সম্ভব হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে জান্নাতের প্রবেশপত্র নেয়া সম্ভব হয়েছে।

বুদ্ধি ও অনুভূতির ঊর্ধ্বের তথ্যাবলীর অনুসন্ধানে মানুষের বিবেক ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো যে কতটুকু নিষ্ক্রিয়, ক্ষীণ, সীমিত ও আস্থা স্থাপনের অনুপযোগী এ সম্পর্কে কতিপয় বাহ্যিক শীর্ষস্থানীয় ও আধ্যাত্মিক তথ্যবিশারদের উক্তি ও পর্যালোচনা পরিবেশন করা সমীচীন মনে করি।

হযরত শায়খ আহ্‌মদ সরহিন্দী-মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) [মৃ. ১০৩৪ হিজরী] স্বীয় তত্ত্ববহুল মাকতুবাতে (রচনাবলী) এ প্রসঙ্গটি একাধিকবার টেনেছেন, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নবীগণ (আ.)-এর সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শন ছাড়াও বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারে, তাঁর অস্তিত্ব যে একান্ত জরুরী ও আবশ্যক—এ অনুভূতিও যোগাতে পারে বটে, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে তাঁর মৌলিক গুণাবলীর সঠিক পরিচিতি, তাঁর পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, নিখুঁত একত্ববাদ ইত্যাকার বিষয়ে অবগত হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর রচনালিপিতে বলেন ঃ

সারকথা ঃ এই বুদ্ধিশক্তি সে অমূল্য দৌলতের দ্বারোদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং মহান আম্বিয়া-ই-কিরামের হিদায়াত ছাড়া সে রত্নাগারের দিশা পেতে বুদ্ধিশক্তি একেবারেই অক্ষম।"[১] পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসও একথারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে, শুধু বিবেক ও যুক্তি-প্রমাণ কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের ওপর নির্ভরশীলগণ আল্লাহর মা'রিফাত ও তার মৌলিক গুণাবলী সাব্যস্তকরণ ও উত্তম কর্মগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে কতই না হোঁচট খেয়েছে! আর লিপ্ত হয়েছে তারা অবর্ণনীয় গোমরাহী ও মূর্খতায়।[২] মুজাদ্দিদ সাহেব স্বীয় রচনাবলীতে প্রমাণ করেছেন, যেমনিভাবে বুদ্ধির স্তর ইন্দ্রিয়রাজির ঊর্ধ্বে, তেমনিভাবে নবুয়তের স্তরও বিবেকের ঊর্ধ্বে, অথচ কোন জিনিস যুক্তির পরিপন্থী হওয়া এবং যুক্তি ঊর্ধ্বে হওয়া এক কথা নয় কিছুতেই। আল্লাহর পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিফ হওয়া নবুয়তের মধ্যে সীমিত এবং আম্বিয়াদের অবহিত ও তা'লমি দানের ওপর তা পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাঁরা মা'রিফাতে ইলাহীর ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের মূর্খতার নিদর্শনগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছেন যদ্দরুন মানব বিবেক-শক্তি অনুশোচনা না করে পারে না। অনুরূপ তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক ও তথাকথিত সংস্কারকগণের বিস্ময়কর অজ্ঞতার শিক্ষণীয় চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩]

অনুরূপ তিনি খাজা বাকী বিল্লাহর দু'জন গৌরবোজ্জ্বল সন্তান খাজা আবদুল্লাহ ও খাজা 'উবায়দুল্লার নামে প্রেরিত অন্য আরেকটি মাকতূব তথা রচনালিপি ২৬৬/১-এর মধ্যে অত্যন্ত বিশ্লেষণের সাথে প্রমাণ করেছেন, নবীগণের আবির্ভাব আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলী ও বিধি-নিষেধের যথোচিত

১. মাকতুবাত–৩/২৩।
২. বিস্তারিত জানার জন্য গ্রন্থকারের প্রণীত কিতাব 'মাজহাব ও তামাদ্‌দুন' দ্রষ্টব্য।
৩. তাফসীরের জন্য তারই সুদীর্ঘ মাকতুব যা খাজা ইব্‌রাহীম কাদিয়ানীর নামে প্রেরিত হয়েছিল দ্রষ্টব্য। মাকতুব নং–২৩/৩।

পরিচিতি প্রদানের একক ও অনিবার্য উপায়। তিনি এও সাব্যস্ত করেছেন, বুদ্ধি ও কাশ্‌ফ্ উভয়টির নির্মলতা ও নিষ্কলুষতা অসম্ভব। এ দু'টি জিনিস জড়দেহের প্রভাব, মনস্তাত্ত্বিকতা, চারিত্রিক কলুষতা ও সৃষ্টিজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সার্বিক মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধি ও কাশফের মধ্যস্থতা এবং এগুলো থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো, বিধি-বিধান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সেসব দুর্বলতার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে এবং সেগুলোর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে প্রকাশ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব সিদ্ধান্তই পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে, যা তাদের নিকট বিদিত হয়ে আসছে যা বাহ্যিক অথচ তা একেবারেই বাস্তবতার পরিপন্থী ও স্বীকৃত মাত্র। তাদের নিজস্ব সমর্থনের দরুন অনেকক্ষেত্রেই শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মাঝখানে তারতম্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.)-এর রচনাবলী এ জাতীয় তত্ত্ব ও দর্শনে পরিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সেসব রচনা অধ্যয়ন করা একান্তই কর্তব্য এবং ঈমানের জ্যোতি বৃদ্ধিকারক।

আল্লাহ্ পাক কুরআনের এক শানদার 'সূরা আস্-সাফফাত' (মুশরিকদের পথভ্রষ্টতাসমূহ, ভ্রান্ত ধারণা ও আল্লাহর সঙ্গে অশোভনীয় ব্যাপারে সম্পৃক্ততা খণ্ডন করা হয়েছে সূরাটিতে)-কে এরই বর্ণনায় সমাপ্ত করেছেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ط وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"তারা যা আরোপ করে তা হতে মহান ও পবিত্র আপনার প্রতিপালক, শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি এবং প্রশংসা সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লহরই জন্য।" [সূরা সাফফাত ঃ ১৮০-১৮২]

উপরিউক্ত তিনটি আয়াত যেন সুসংবদ্ধ শিকলের কড়া, যা পরস্পর একত্রে গাঁথা। কেননা আল্লাহ্ পাক স্বীয় অস্তিত্বকে মুশরিকদের অবাঞ্ছিত ও অমার্জিত উক্তি থেকে পবিত্র ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি শুধু, বরঞ্চ এর সাথে সাথে আম্বিয়া-ই-কিরাম সম্পর্কেও আলোচনা টেনেছেন। কারণ তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পূর্ণ পবিত্রতা ও মহত্ত্বকে সঠিকভাবে অভিব্যক্ত করেছেন। বিবৃত করেছেন তাঁরা তাঁর অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলীকে একটা একটা করে। আল্লাহ্ পাক এজন্য সপ্রশংস সালাম পাঠালেন তাঁদের উদ্দেশে। স্রষ্টার সঠিক পরিচিতি সৃষ্টি সমীপে উপস্থাপন ও তাঁর মৌলিক গুণাবলী সমুজ্জ্বল করার অনিবার্য বাহনই হচ্ছে নবীগণের কণ্ঠ। তাঁদের আবির্ভাব বয়ে এনেছে সৃষ্টিকুলের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ, বিশেষ করে তা হচ্ছে মানব জাতির অসীম ইহ্সান। এটি আল্লাহর রবূবিয়াত, রহমত ও হিকমতেরও এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

এজন্যই নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তিনি ইতি টানলেন ঃ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য শোভনীয়, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক।" [সূরা সাফফাত ঃ ১৮২]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) সে তত্ত্ব পরিব্যাক্ত করতে গিয়ে তাঁর এক রচনায় লিখেছেন, "আম্বিয়া-ই-কিরাম হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাঁদেরকে সোপর্দ করা হয়েছে এক মহাদৌলত। আওলিয়াদের বিচরণ যেখানে ক্ষান্ত, আম্বিয়া-ই-কিরামের বিচরণ সেখান থেকে মাত্র শুরু। এর ব্যতিক্রম নয় মোটেই। নবুয়তের অনুসরণে ফরযসমূহ দ্বারা নৈকট্য হাসিল হয়। সাগরের তুলনায় একটা ফোঁটার অস্তিত্ব যেমন, বিলায়াতের গুণাবলী নবুয়তের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় তেমনও নয়।[১] আম্বিয়া-ই-কিরাম ও নবুয়তের মর্যাদা সম্বন্ধে মুজাদ্দিদ সাহেবের ও তাঁর এক পূর্বসূরী প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মাখদূমুল মালিক শায়খ শরফুদ্দীন য়াহ্য়া মুনীরী (র.) তাঁদের রচনাবলীতে অতীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। মুজাদ্দিদ সাহেব লেখেন, "ওয়ালীগণ তাঁদের লক্ষ্যস্থল সংকীর্ণ হওয়ার দরুন সৃষ্টির দিকে পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে পারেন না (বিধায় নবীগণের মত তাঁদের দ্বারা সর্বব্যাপী খিদ্মত ও হিদায়াতের কাজ নেয়া যেতে পারে না)। নবুয়তের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। নবীগণ তাঁদের অন্তরের প্রসারতা ও দৃষ্টির উদারতার ফলে স্রষ্টার দিকে যখন লক্ষ্য রাখতে যান, সৃষ্টির দিকেও লক্ষ্য রাখতে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হন না। তদ্রূপ তাঁদের আবার সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে স্রষ্টার ধ্যানে কোন কন্টক দেখা দেয় না।"[২]

মাখ্দুম সাহেব বলেন, "আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর একটা নিশ্বাস মাত্র আউলিয়াগণের সমস্ত জীবনের চেয়েও উৎকৃষ্ট। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর শুধু মাটির দেহটিও পবিত্রতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে আউলিয়া-ই-কিরামের অন্তর ভেদজ্ঞান ও আরাধনার সমতুল্য। অন্যরা সাধনা করে যেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারেন না, আম্বিয়া-ই-কিরামের মাটির দেহটি অনায়াসেই সেখানে পৌঁছে যায়।"[৩]

১. মাকতূবাত ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮; প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩।
২. মাকতূবাত ঃ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২।
৩. মাকতূব ঃ বিংশতম খণ্ড।

গ্রীক দর্শনের ব্যর্থতার কারণ

এরই ফলশ্রুতিতে যে কেউ আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর অনুসৃত আদর্শ-বহির্ভূত অন্য কোন পন্থায় যখনি কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলী ও মহিমান্বিত নামসমূহের পরিচিতি হাসিল করতে চায় এবং এ ধরার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের অবস্থা, আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর অনুশাসন ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয় সমাধানের অপচেষ্টা চালায় তার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ঠিক তেমনি ব্যর্থ হবে, সে যদি তার স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, গবেষণা, প্রতিভা ও মেধা কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা দ্বারা এ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের অহমিকায় অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে তাতে তার অর্জন হবে ধৃষ্টতা আর পথভ্রষ্টতা। আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণীতে তাদেরই আসল রূপ তুলে ধরা হয়েছে ঃ

هَآاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ـ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

"দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তোমরাই তো সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।"

[সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৬]

গ্রীকদের প্রাচীন স্রষ্টা-দর্শন ও এর উদ্ভাবক ও বিশেষজ্ঞদের অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতার মূল কারণ এটাই। তাদের নজিরবিহীন মেধা ও প্রতিভা, ইল্‌ম ও সাহিত্যিক অগ্রযাত্রা, তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাব্য চর্চা, সমর-নৈপুণ্যের অমর কাহিনী, অংকশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সৌর বিজ্ঞানের অব্যর্থ দক্ষতা নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে মস্ত বড় গোলকধাঁধায়। তাদের ধারণা, এভাবেই আত্মিক তত্ত্ব ও স্রষ্টা-দর্শনের বিষয়েও তাদের অগ্রণী ভূমিকা থাকবে। তাই তো তারা তাদের নিজস্ব সীমা ডিঙ্গিয়ে স্রষ্টা-দর্শনের বিভিন্ন দিক এবং আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলীর রহস্যোদ্‌ঘাটনের দিকেও মনোনিবেশ করেছে।

কিন্তু এহেন সাধনার যে ফসল তারা দুনিয়াবাসীদের সামনে উপস্থাপন করেছে তা অত্যাশ্চর্যের এক দাস্তান, শিক্ষার নামে মূর্খতার ছড়াছড়ি ও পারস্পরিক বিপরীত ধর্ম ও বিভিন্নমুখী উক্তি ও মতামত এবং কল্পনা ও দাবির জগাখিচুড়ি মাত্র।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.) এ বিষয়ে একটি তথ্যবহুল পর্যালোচনা রেখেছেন ঃ

"এতে রয়েছে ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকার আর অন্ধকার। যদি কেউ এ জাতীয় কথাকে স্বপ্ন হিসেবেও বর্ণনা করতে যায়, তখন তাকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলে আখ্যায়িত করা হবে।"[১]

অন্যত্র তিনি লেখেন ঃ

"আমার বুঝে আসে না, এ জাতীয় বিষয়াদি দ্বারা একটা পাগলও কি স্বস্তি লাভ করতে পারে? যারা কেবল বস্তুতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ করে বিশ্লেষণ করে বেড়ায় তারা আবার কিসের বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবিদ?"[২]

এমনিভাবে শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়াহ (র.) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের উক্তি বারংবার নিরীক্ষণের পর বলেন ঃ

"বিবেকবানদের একটু ভেবে দেখা দরকার সে সব ব্যক্তির উক্তিগুলো, যারা নিজেদের পেশকৃত উক্তি দ্বারা খুবই গর্ববোধ করছে এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের নির্দেশিত আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে বলে তৃপ্তি লাভ করছে।" এদের দর্শনের উচ্চ পর্যায়েও পরিলক্ষিত হচ্ছে মাতালের উক্তির মত শত উক্তি। স্থিরীকৃত ও বিদিত সত্যকে স্বীয় কারচুপি ও প্রবঞ্চনা দিয়ে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা করে তারা। এদিকে স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য বাতিলকে তারা আবার গ্রহণ করে নেয়।[৩]

ইমাম ইব্ন তায়মিয়াহ (র.) অন্য একখানে লেখেন ঃ

"ইলাহীয়াত দর্শনের প্রথম গুরু এরিস্টটলের উক্তি ও যুক্তিগুলোকে নিয়ে যখন চিন্তা করা হয়, পর্যবেক্ষণ করে যদি কোন একজন অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, তখন সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে, গ্রীক দার্শনিকদের ন্যায় আল্লাহ্ রাব্বুল'আলামীনের মা'রিফাতবিমুখ অন্য কেউ ছিল না। আশ্চর্যান্বিত হয়ে না সে পারবে না। কাউকে যখন দেখা যায় নবীগণের ইলম ও তা'লিমের সাথে গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়! এ যেন একজন কামার ফেরেশ্তার সাথে কিংবা একজন গেঁয়ো জমিদার সম্রাটের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে।[৪]

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী (র.) এক রচনায় লিখেছেন ঃ

---

১. তাহাফুতুল ফালাসিফা, পৃষ্ঠা ৩০।
২. তাহাফুতুল ফালাসিফা, পৃষ্ঠা ৩২।
৩. মাওয়াফিকাহ সারাইহুল মা'কূল।
৪. 'আররদ্দ 'আলাল মানতিকীয়্যীন', পৃষ্ঠা ৩৯৫ ।

"যুক্তি-জ্ঞানই যদি এ বিষয়ে যথেষ্ট হতো, তাহলে যুক্তিকেই পথ-প্রদর্শকরূপ গ্রহণকারী গ্রীক দার্শনিকগণ পথভ্রষ্টতার তমসাচ্ছন্ন পাথারে এভাবে আর হাবুডুবু খেতে থাকত না। অন্যদের অপেক্ষা আল্লাহ্ পাককে বেশি চিন্‌ত তারাই, অথচ আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয়টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বোকা ও অজ্ঞ এরাই। তারা কি মহান আল্লাহ্ পাককে নিষ্ক্রিয় ও বেকার জ্ঞান করে বসেছে?"

অতঃপর মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) তাদের অনভিপ্রেত বিস্ময়কর উক্তিগুলো উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

"আমি বিস্মিত হচ্ছি, এক সম্প্রদায় সেসব আহ্মকদের (গ্রীক দার্শনিকগণ)-কে দার্শনিক আখ্যা দিচ্ছে। দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভাবক নাকি তারা, অথচ এর (দর্শনের) সিংহভাগই অবান্তর ও ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হয়েছে, বিশেষ করে ইলাহিয়াতের (যা তাদের এই বিষয়ের আসল লক্ষ্য) পর্বটি। প্রায় সবটুকুই এর কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। অতএব, যাদের পুঁজি একমাত্র অজ্ঞতা তাদেরকে দার্শনিক আখ্যা দেয় কিভাবে? হ্যাঁ, দেয়া যেতে পারে, যদি অবজ্ঞাভরে কিংবা ব্যঙ্গ করে হয়, যেমন একজন অন্ধকে পদ্মলোচন নাম দেয়া হয়।"[১]

আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণীর জ্বলন্ত নমুনা তারাই ঃ

اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ط سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُوْنَ ـ

"এদের সৃষ্টি কি এরা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা আল-যুখরুফ ঃ ১৯]

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لَاخَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ص وَ مَاكُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ـ

"আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেকে ডাকিনি। এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করার নই।"

[সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৫১]

১. মাকতূব ঃ ২৩/৩।

ইসলামী যুগের দর্শনের ত্রুটি

পরিতাপের বিষয়, আমাদের যে ইসলামী ফালসাফা (কালামশাস্ত্র) গ্রীকের নাস্তিকতাবাদ সমর্থিত ফালসাফার প্রতিযোগিতায় বাস্তবে এসেছিল, তাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। তাতেও আলোচনা করা হয়েছে এই বিষয়টিতেও এমন এমন বহু কথা, যার মূলনীতি ও ফরমুলা মানুষের জ্ঞানবহির্ভূত ছিল। সঠিকভাবে এদরে খবরও ছিল না এ নীতিমালার। এতে অনুপ্রবেশ করেছে বল্গাহীনভাবে গ্রীক দর্শনের বিষক্রিয়া, যা সাধারণত স্বীয় গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন বিধায় সচরাচর সীমালংঘন করে থাকে। এই ইলমে কালামেরও অনুরূপ মহান আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি, নামসমূহ ও গুণাবলীর তথ্যানুসন্ধানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তারা সেসব বিষয়ে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছে, এমনভাবে খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ করেছে, যেন তারা কোন বিজ্ঞান গবেষণাগার (Laboratory)-এ দণ্ডায়মান আছে আর সমস্ত অংশগুলোকে প্রত্যক্ষ করছে!

تعالى الله عن ذلك ـ

মহান আল্লাহ্ পাক এর ঊর্ধ্বে।

আম্বিয়া-ই-কিরামের স্বাতন্ত্র্য

আম্বিয়া-ই-কিরাম (তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)-এর প্রাণ সঞ্চারক ইলমের নেই কোন অংশীদার, নেই কোন সমকক্ষ, মানবকুলের সৌভাগ্য আনয়নের ক্ষেত্রে যার কোন বিকল্প নেই এবং যা এড়িয়ে গিয়ে নাজাতেরও কোন ব্যবস্থা নেই। এটি সেই মহতী ইল্‌ম, যার আলোকে মানুষ নিজের ও সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টার সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে। জানতে পারা যায় এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সুউচ্চ গুণাবলী এবং তাঁর ও বান্দার মাঝখানে বিরাজমান সম্পর্কের সম্যক পরিচয়। এই ইল্‌মের আলোকে মানুষ তার আদি অন্ত নিরূপণ করতে সক্ষম হয়। মানুষ যে আসলে কি, প্রতিপালকের মোকাবিলায় তার অবস্থানটি কেমন, তা চিহ্নিত করা যায় এই নববী ইল্‌ম দ্বারাই। কি কাজে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন, কিসে অসন্তুষ্ট হন, কি করলে আখিরাতে মানুষ সৌভাগ্যবান হবে, আর কি করলে দুর্ভাগা ও ব্যর্থ হবে এসবের খতিয়ান রয়েছে এই নববী ইলমেই।

অর্থাৎ এই ইলম্ দিক-নির্দেশনা দেয়, মানুষের কাজকর্ম, 'আকীদা, চরিত্র ও আচার-আচরণ কেমন হলে অনন্তকালের চরম শান্তি টেনে আনবে, আর কেমন হলে টেনে আনবে অফুরন্ত পরম শান্তি। তাই এ ইল্‌মকে 'ইলমুন্‌নাজাত' বা নাজাতের ইল্‌ম আখ্যা দেয়া যথাযথ।

আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.) যদিও স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতাসম্পন্ন, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও কোমলতার অধিকারী, সৃষ্টিগত মেধাবী ও ধীশক্তিধর হয়ে থাকেন, তবুও তাঁরা কালের প্রচলিত ও প্রবর্তিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে অংশ নেন না। এজন্য তাঁরা এসব বিষয়ে নিজেদেরকে ব্যুৎপন্ন হওয়ার আদৌ দাবিও করেন না, বরঞ্চ ওসব জিনিস থেকে পৃথক থেকে একমাত্র নবুয়াতের দায়িত্ব আদায় এবং সে খিদমত পুরোপুরি আঞ্জাম দেয়ায় তাঁরা নিমগ্ন থাকেন। তাঁদেরকে যে উদ্দেশে আবির্ভূত করা হয়েছে, যে আদর্শের উজ্জীবনে তাঁরা আদিষ্ট, মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যেসব জিনিসে নিহিত রয়েছে, আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.) একমাত্র সেগুলোর ইল্‌ম উম্মতের কাছে পৌঁছানোর জন্য সদা ব্যস্ত থাকেন।

পৃথিবীর সভ্য ও উন্নত জাতিগুলো যারা স্বীয় যুগে সভ্যতা, সংস্কৃতি, মনস্তাত্ত্বিকতা ও জ্ঞান-গরিমার আবিষ্কারাদির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, তাঁদেরও আম্বিয়া-ই-কিরামের পরিবেশিত অনুপম শিক্ষা ও তাঁদের আদর্শমণ্ডিত ইল্‌মের এমন মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল, যেমন সাগরে ডুবন্ত মৃতপ্রায় ব্যক্তির নৌকার অথবা একজন নিরাশ রোগীর 'অকসীর' (দীর্ঘ জীবনদাতা তথাকথিত দাওয়া)-এর হতে হয়। ওসব উন্নত জাতির সদস্যবৃন্দ এ সুষমামণ্ডিত ইল্‌মের তুলনায় (অন্য সব জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা কৃষ্টি কালচারে যতটুকুই অগ্রগামী থাকুক না কেন) যেন দুগ্ধপায়ী শিশু, অবুঝ ও বোকা, রিক্ত, সহায়হারা! তদুপরি তাদের আপন জ্ঞানগত সফলতা ও সংস্কৃতিগত অগ্রগতির দরুন যখনি এই মহতী ইল্‌মকে উপেক্ষা করেছে, বিদ্রূপ করতে শুরু করেছে, তারা নিজের জন্য সমাজ ও জাতির জন্য ডেকে এনেছে চরম বিপর্যয় ও ধ্বংস। বহু উন্নত ও সভ্য জাতি শিক্ষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে ধন্য হয়েছিল, মেধা ও ধীশক্তিতে যারা ছিল তদানীন্তন বিশ্বে উদাহরণযোগ্য—দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য, আত্মগরিমা স্বীয় শিল্প-বিজ্ঞানে গর্বের শিকার হয়ে পড়েছিল। ফলে স্বীয় যমানার নবীর আনীত তা'লীমকে উপেক্ষা ও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে এবং তাতে অনীহা প্রদর্শন করে। এই তা'লীমকে ভাবতে থাকে নিষ্প্রয়োজন ও মূল্যহীন। ফলে তারা অহংকারের নজরানায় পরিণত হয়। পরিণতিতে উচ্চতর ধীশক্তির নামে অজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও তত্ত্বজ্ঞানের নামে সংকীর্ণতা নিয়ে ধ্বংসের অতল তলে তারা নিমজ্জিত হয়েছে, ভোগ করেছে আপন কর্মের অসহনীয় প্রায়শ্চিত্ত।

আম্বিয়া-ই-কিরামের জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানের মাঝে আপেক্ষিক নিরীক্ষণ

আম্বিয়া-ই-কিরাম (তাঁদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক)-এর জ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানী ও দার্শনিকের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাঝখানে তফাত কতটুকু? তা সহজভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে শুধু একটা ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলেই। আপনারাও ঘটনাটি

শুনেছেন হয়ত; কিন্তু এ আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে নাও চিন্তা করতে পারেন। ঘটনাটি যে খুব একটা সূক্ষ্ম তাও নয়। মাফ করবেন, এ ঘটনার অবতারণা কিন্তু আপনাদের ছাত্র সমাজকে নিয়েই।

"একজন সত্যবাদীর বর্ণনা—একদা কতিপয় ছাত্র চিত্ত বিনোদনে নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল।, তাদের মন ছিল তখন আবেগাপ্লুত, সময়টাও নেহায়েত মনোরম। আবহাওয়া মৃদু ও আনন্দদায়ক। এদিকে তাদের তখন কোন কাজও ছিল না। এ অবস্থায় কি তরুণ সমাজ নীরব থাকতে পারে? সেই মুহূর্তে মূর্খ বোকা একজন নৌকার মাল্লা এদের মনোরঞ্জনের উত্তম আধার বৈকি! কেননা প্রতারণা হৈ-হুল্লোড় ও চিত্ত বিনোদনের অভাব মোচনের ক্ষেত্রে এমন একজন লোকই বেশি উপযোগী হয়। শুরু হলো এদের মৌজের পাল্লা। তাই তো তাদের মধ্যে সুচতুর ও বাকপটু একটি বালক মাল্লাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল ঃ

চাচা মিয়া! তুমি কি কি বিদ্যা শিখেছ?

মাল্লা মিয়া ঃ আমি তো কোন লেখাপড়াই করিনি।

বালকটি মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ আরে চাচা, তুমি সাইন্স পড়নি?

মাল্লা ঃ আমি তো এর নামও শুনিনি।

দ্বিতীয় বালক ঃ চাচা! জ্যামিতি ও এ্যালজাবরা অবশ্যই পড়েছ, না?

মাল্লা ঃ হুযুর! এই নামটাই আমার কাছে নতুন!

তখন তৃতীয় বালক টিপ্পনী কেটে বলল ঃ যা-ই হোক, তুমি ভূগোল ও ইতিহাসটুকু তো নিশ্চয়ই পড়েছ, চাচা মিয়া?

মাল্লা ঃ জনাব! এটা কি কোন শহরের নাম, না মানুষের নাম?

মাল্লার এই উত্তরটা শুনে বালকগণ তাদের হাসি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। উচ্চ স্বরে তারা হাসতে থাকে। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল ঃ চাচা মিয়া! তোমার বয়স কত হয়েছে?

মাল্লা ঃ এ-ই কত, চল্লিশ!

তরুণগণ বলল ঃ অমনিতেই তো তুমি অর্ধেকটা জীবন নাশ করে দিলে, অথচ লেখাপাড়া শিখলে না।

মাল্লা বেচারা অবশেষে নীরবই রয়ে গেল।

কুদরতের লীলা দেখুন, নৌকাটা তেমন দূরে যেতে না যেতেই সমুদ্রে উঠল এমন তুফান (সাইক্লোন), ঢেউ ক্রমশ প্রকাণ্ড হতে প্রকাণ্ডতর হতে শুরু করল। তদ্দরুন একবার নৌকাটি উঠছিল বহু উঁচুতে আবার নামছিল বহু নীচুতে। তখন মনে হচ্ছিল, নৌকাটি এ-ই বুঝি তলিয়ে গেল! তারা ছেলেবয়েসী হলেও সমুদ্র

ভ্রমণের ভয়াবহতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। তাই বিলুপ্ত হতে লাগল তাদের অহমিকা। চেহারায় দেখা দিয়েছে আতংক ভাব। এবারে এল বোকা মাঝির পালা। সে নিতান্ত গাম্ভীর্যের সাথে জিজ্ঞেস করল, "ভায়া! তোমরা কি কি জ্ঞান হাসিল করেছ?" নওজোয়ানরা জানত না, এ সাদাসিধে মাঝি যে কি উদ্দেশে জিজ্ঞেস করছে। বুঝতে না পেরে তারা মাদ্রাসা অথবা কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়াদির এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করতে শুরু করল। যখন আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেসব আকর্ষণীয় বিষয়াদির ফিরিস্তি বর্ণনা শেষ হলো তখন মাঝি মৃদু হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা, ভালো কথা, এসব বিষয়ে তোমরা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল করেছ। তবে পানিতে সাঁতার কাটার শিক্ষাটা নিয়েছ কি? আল্লাহ্ না করুন, নৌকাটি কাত হয়ে গেলে তীরে পৌঁছাতে পারবে তো?

বালকদের কারো সাঁতার জানা ছিল না। বালকগণ ভগ্ন চিত্তে জানাল, "চাচাজী! এই একটি মাত্র বিষয়ই আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে, যা আমরা এখনো জানতে পারিনি।"

বালকদের এই উত্তর শুনে মাঝি হেসে উঠল খুবই বিকট স্বরে এবং বলল, "মিয়া! আমিতো অর্ধেকটা জীবন অমনিতেই বৃথাই নাকি কাটিয়ে দিলাম! কিন্তু তোমাদের তো জীবন সারাটাই বৃথা। কারণ এই তুফানে তোমাদের এতদিনের অর্জিত বিদ্যা কোন কাজই দিচ্ছে না। আজ সাঁতারের তা'লীমটুকু-ই জীবন রক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ, অথচ তোমরা জানলে না সে তালীম!"

উন্নতির উচ্চ স্তর অতিক্রম করে কৃষ্টি ও সভ্যতার চূড়ান্ত সোপানে উপবিষ্ট আজ যেসব জাতি, তাদের আসল চেহারা হচ্ছে এটাই। তারা জ্ঞান-সাহিত্যের বিরাটকায় বিশ্বকোষ (Encyclopaedia)-ই কণ্ঠস্থ রাখুক না কেন অথবা হোক না তারা মানবিক যাবতীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান আবিষ্কার ও সুবিশাল পৃথিবীতে গুপ্ত খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধানে নিখিল বিশ্বের পুরোধা, কিন্তু তারা আল্লাহর মা'রিফাত বা পরিচিতি লাভের সহায়ক ইল্‌ম থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ, অথচ স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব এই ইল্‌ম দিয়ে। উদ্দেশ্যের সৈকতে এই ইসলামকে মাধ্যম করে উপনীত হওয়া যায়। আর তুফান থেকেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। স্বীয় আমলকে দুরস্ত রাখে এই ইল্‌ম। এই ইল্‌ম অনভিপ্রেত আসক্তিকেও সুনিয়ন্ত্রিত রাখে। চরিত্রকে মার্জিত ও প্রবৃত্তিকে সুসংহত করে। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং মঙ্গলের দিকে অনুপ্রাণিত করে। এই ইল্‌ম মনে আল্লাহর ভয়ের জোয়ার তোলে। এই ইল্‌ম বিনে কলুষহীন সমাজ গড়া যেমনি সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় তাহ্যীব-তামাদ্দুনের রক্ষণাবেক্ষণ। একমাত্র এ ইল্‌মেই রয়েছে পরিণাম ও পরিণতি এবং আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য প্রবল উদ্দীপনা। আমিত্ব ও আত্মপূজার অহমিকাকে বিদূরিত করে এই ইল্‌ম। দুনিয়ার এই তুচ্ছ বস্তুর

লোভ-লিপ্সা থেকে মুক্ত থাকার এক স্বাধীন মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয় এই ইল্‌ম। এই ইল্‌মে নববী সাবধানতা ও ভারসাম্যের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। অনর্থক ও নিষ্ফল চেষ্টায় অবাঞ্ছিত পথ পরিহার করাই এই ইল্‌মের বিশেষ আহ্‌বান।

সেসব জাতির বিভীষিকাময় কাহিনী মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কালামে বর্ণনা দিয়েছেন, যারা ছিল আত্মগৌরব ও অহংকারের কালো পাথারে নিমজ্জিত। যারা সমসাময়িক আম্বিয়া-ই-কিরামকে ভাবত হীন ও তুচ্ছ। কারণ আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.) যুগোপযোগী প্রচলিত শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য খ্যাতি রাখতেন না।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ -

"তাদের রাসূল যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসত, যখন তারা নিজেদের জ্ঞানে দম্ভ করত, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাদেরকে তাই বেষ্টন করল।" [সূরা মু'মিন ঃ ৮৩]

রাসূলের আবির্ভাবের পর কারো অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অবকাশ নেই

খাতামুন্ নাবিয়ীন (সা.)-এর আবির্ভাবের পরও গতানুগতিক ধারায়ই ওসব জাতি অনীহা প্রদর্শন করতে থাকে, যারা তদানীন্তন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও কৃষ্টি-কালচারের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছিল। তাদের ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা ও শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগতি, সফলকামী সুদক্ষ সুধীবর্গের ওপর অগাধ আস্থা ইত্যাদি তাদেরকে সরিয়ে রেখেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক পরিবেশিত পরম উন্নত ও অত্যাবশ্যকীয় অনুপম ইল্‌মের স্নিগ্ধ পরশ থেকে। তাদেরকে অনুমতি দেয়নি রাসূল (সা.)-এর তরীকার পদাংকানুসরণ করে একটু সামনে এগুতে আর পরিত্রাণ লাভ করতে।

আমাদের এ যুগের অধুনা উন্নত জাতিগুলোর অবস্থা মোটেও তাদের ব্যতিক্রম নয়। তারা ইচ্ছা করলে কিয়ামত পর্যন্ত এ সনাতন দীনের ছায়াতলে এসে ধন্য হতে পারে। এই আলোকবর্তিকা হতে আলোকরশ্মি নিয়ে তারা নিজেদেরকে প্রদীপ্ত করতে সচেষ্ট হতে পারে। অনতিবিলম্বে সে সব জাতির এ গর্ব-অহংকার ও নিস্পৃহতায় ভয়াবহ পরিণতি দেখা দেবে। অসহনীয় হয়ে উঠছে নিখিল বসুন্ধরা তাদের অস্তগামী তথাকথিত সভ্যতার মৃতদেহের দুর্গন্ধে। সেই দিন অত্যাসন্ন, যখন তাদের সভ্যতার প্রাচীর চৌচির হয়ে ভূ-লুণ্ঠিত হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে মহাবিপর্যয়ের আশংকা

ইসলামী রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে 'আরব' রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান আরেক বিস্ময়কর দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এ মহামূল্যবান প্রাণ সঞ্চারক 'ইল্‌ম' থেকে এদিন-ওদিক ছিট্‌কে পড়েছে। এই 'ইল্‌মে নববী' দ্বারা উপকৃত না হয়ে তারা বহিঃপথে ছোটাছুটি করছে। গ্রহণ করছে এর স্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা, জড়বস্তুর ক্ষমতা ও বর্বরতার জীবনসম্বলিত দর্শন। এই অবাঞ্ছিত বিরোগের প্রতিক্রিয়ার জর্জরিত হয়ে চলেছে তারা চরম দুর্গতির দিকে, যার আদৌ প্রতিকার নেই। এই 'ইল্‌মে নববী'র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দরুন আজ দেখা দিয়েছে তাদের মাঝে শত মতান্তর ও মতভেদ। বর্তমান দ্বন্দ্ব ও অনাগত দিনের বিপ্লব-কলহ তাদেরকে অবর্ণনীয় ধ্বংসের কবলে আক্রান্ত করতে চলেছে। পারস্পরিক বৈরী ভাব ও বিদ্বেষের মত জঘন্য সংক্রামক ব্যাধি আসন লাভ করে চলছে তাদের জাতীয় জীবনের শিরা-উপশিরায় যদ্দরুন পারস্পরিক সৌহার্দ্যে লেগেছে কুঠারাঘাত। তারা তাই পরস্পরের হাতে লাঞ্ছনা ও পদদলনের শিকার।

জ্ঞানী, তথ্যবিদ ও আম্বিয়া-ই-কিরামের স্বরূপ নিরূপণে একটি উদাহরণ

আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর তুলনায় অন্যান্য বিজ্ঞানী, তত্ত্ববিদ, গুণী ও সুধীদের স্বরূপ উন্মোচিত হবে নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে ঃ

যেমন একটা সুবৃহৎ উন্নত পরিপাটি নগরী। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষিত ও জ্ঞানীবর্গের গমনাগমন এই নগরীতে। এল একটি দল সেই নগরীতে। তাদের মনের আকর্ষণ ইতিহাস বিষয়টির সাথে। এই নগরী সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা ঃ এই প্রাচীন নগরীটির সংস্কারক কে? প্রতিষ্ঠাতা কে? কখন থেকে নগরীটির উন্নতি সাধিত হতে থাকে? উন্নতির পথে এর বাধাগুলো কি কি ছিল? কোন্ সরকার কখন অতীত হয়েছে এখানে?

অপর একটি দলের আগমন ঘটে সেই শহরে। তাদের অন্বেষণ হচ্ছে প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান। প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের কি আছে কোথায় কোথায়, তারা সেই খোঁজে নিবেদিত। শহরের ঐতিহ্যবাহী এলাকাকে খনন করে উদ্‌ঘাটিত বস্তু ও লেখাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে তারা চায় এগুলোর সময়কাল নির্ধারণ করতে। তা থেকে তারা অতীতের সভ্যতা ও প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে প্রয়াসী হবে।

সেই শহরে কতিপয় এমন মানুষের আবির্ভাব, যাদের গবেষণা ও অধ্যবসায় ভূগোলকেন্দ্রিক। তারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে শুধু ভূগোল চর্চায়। তারা চিন্তা করবে–এই শহরটির চতুঃসীমা কি? এর পরিধি ও আয়তন কতটুকু?

শহরটির ভৌগোলিক বা চৌহদ্দিগত অবস্থান কেমন? এর চতুষ্পার্শ্বের অবস্থানরত পর্বতমালা ও ছায়াদাতা শৃঙ্গরাজির অবস্থানটা-ই বা কি? শহরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট পয়ঃপ্রণালীগুলো কি কি? আবার সেগুলোর উৎস কোথায়?

আবার এমন একটা দল আগমন করল সেই নগরীতে, কাব্য ও সাহিত্যই যাদের সার্বক্ষণিক গবেষণার বিষয়বস্তু। নয়নাভিরাম সুশৃঙ্খল নগরীর মনোহর চাকচিক্য, তার হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যাবলী, সকাল-সাঁঝে মন মাতানো মৃদু বাতাস ও রকমারি ফুলে প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানের শ্যামল মায়ার আকর্ষণে তারা সব সময় বিমোহিত। তাদের লালিত মানস-মুকুল তখন বিকশিত হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিভা ও হৃদয়াপ্লুত প্রয়াস তখন রচনা করে দেয় ভাবের জোয়ারে প্রাণবন্ত, অথচ সাহিত্য সুষমামণ্ডিত চরণমালার এক সুবিশাল কাব্য গ্রন্থ।

এদিকে সেই নগরীটি এমন একটি জামাতের গমনকেন্দ্রও হলো, যাদের অভিরুচি ভাষা ও ভাষা দর্শন। নগরীতে অবস্থানরত বাসিন্দাদের ভাষা-ই তাদের আলোচ্য বিষয়। তারা পর্যবেক্ষণ চালায় ভাষার উৎস, ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতির স্তরসমূহ এবং অপরাপর সব ভাষার সাথে এ নগরীর ভাষার সম্বন্ধ সম্পর্কে। এভাবে তারা ভাষাটির মূল ইতিহাস উন্মোচিত করতে চায়। সাথে সাথে কালের প্রবাহে অবলুপ্ত ক্রমবিবর্তনের ধারাসমূহও সংগ্রহ করে নেয় তারা। একত্র করে শব্দকোষ। গুছিয়ে নেয় সুবিন্যাসের সাথে ভাষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যাকরণও। লিখন পদ্ধতি ও বর্ণমালার বিশেষ রীতিনীতিগুলো আবিষ্কার করে সে সম্পর্কে উদ্‌ঘাটিত সব তত্ত্ব বাস্তবে উপস্থাপন করে তারা।

জ্ঞানী ও গুণী সম্প্রদায়ের এসব দলের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। তারা শ্রদ্ধারও দাবিদার। এদেরকে কটাক্ষ কিংবা তাচ্ছিল্য করা যায় না। বস্তুত প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব প্রেরণা, চেতনা ও সাধনার বিষয় থাকে। তদনুযায়ী তার প্রক্রিয়াসমূহ কাজ করে চলে।

কিন্তু এসব জামাত স্বীয় মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করার পর ততক্ষণ শংকামুক্ত হবে না, যতক্ষণ এ নগরী সম্পর্কে কিছু অত্যাবশ্যকীয় ও অনিবার্য বিষয় সম্পর্কে অবগত না হবে। যেমন এ নগরীটির শাসনকর্তা কে? নগরীটির প্রশাসনিক কাঠামো কি? সেসব সাধারণ আইনগুলোই বা কি, যা সকলকেই (নেশা ও পেশায় বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও) বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিতে হয়? এ নগর কিংবা দেশের নাগরিকত্ব অর্জনের বিহিত কি? এখানকার বাসিন্দাদের করের হার কত? বসতি স্থাপনের নির্ধারিত নীতিমালা-ই বা কি? এখানকার আইনে কি কি জিনিস বৈধ আর কি কি জিনিস অবৈধ? কিসেই বা লিপ্ত হলে আইনত দণ্ডনীয় হতে হয়? এতদ্ভিন্ন তাকে জেনে নিতে হবে এমন এমন কিছু বিষয়ও, যা এই সুসভ্য ও উন্নত শহরে সসম্মান ও নিরাপদে জীবন যাপনের লক্ষ্যে একান্ত অপরিহার্য হয়।

শহরে নবীগণের দায়িত্ব কি হবে

উন্নত শহরে অনুরূপ আর একটি এমন দলের আগমন হয়, যারা অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী সঠিক, অথচ লাভজনক প্রয়াসের ধারক। তারা ধীশক্তির অধিকারী, তীক্ষ্ণ ও পূত অভিরুচিসম্পন্ন। মানবিক গুণে তারা সঠিকভাবে গুণী। কিন্তু তাদের কর্ম প্রক্রিয়া ও তৎপরতা একেবারেই ভিন্ন। তাদের দাওয়াত, কর্মধারা অন্যদের কর্মপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা সে সুসংহত শহরে প্রবেশ করে এর প্রাণকেন্দ্র ও জীবন-শৃংখলার মূল চাবিকাঠি যেখানে, সেখানে পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছে যায়, বরং শহরের আসল মালিক (আল্লাহ্) সে দলটির হাত ধরে উৎসমূলের দিকে নিয়ে যান। মনীষীদের এই দলটি সরাসরি সেই কেন্দ্র থেকে প্রকৃত আইন ও ফরমানসমূহ অর্জন করেন। অতঃপর ওসব আইন ও ফরমান সমস্ত মানুষের কাছে প্রচার করেন। পরিশেষে তারাই সে শহরের গঠনমূলক শক্তি কিংবা গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান ও শহরবাসীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল শৃংখলে পরিণত হন।

এতে দ্বিধার লেশমাত্র অবকাশ নেই, শহরের সমস্ত মানুষ, জ্ঞানী ও সুধী সম্প্রদায় নিজের জীবনের প্রতিটি স্তরে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকার জন্য এমন একটা নিষ্কলুষ দলের অবশ্যিই মুখাপেক্ষী। কেননা সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সেই ইল্‌মে নববীর স্নিগ্ধ পরশেই লালিত হয়ে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো অতিক্রম করছে। এই দলটি দ্বারা-ই সাধারণ জনগণ পাচ্ছে সে শিক্ষা। আর এ দলটি সেই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারের দায়িত্বে সর্বমুহূর্তেই নিবেদিত থাকেন। এ 'ইল্‌ম' যদি না-ই থাকল, আর যদি না-ই রইল ঐ দলটি, তখন সমস্ত দল মূর্খতা ও অজ্ঞতার শিকার হবে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, তাদের থেকে প্রচলিত আইনবহির্ভূত কাজ সংঘটিত হতে পারে। তাদেরকে আটক করে বন্দীশালায়ও প্রেরণ করা হয়। তবে কথিত ক্ষমতাধরদের যত সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাবতীয় মেহনত, অনুসন্ধান ও অভিযান বিন্দুমাত্রও কাজে আসবে না। পক্ষান্তরে ওসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নিয়ম-শৃংখলার (বিদ্যমান সমন্বিত ক্ষমতা) ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর মারিফাত লাভ। কারণ এ সুবিশাল ও সুপরিসর নগরীর শৃংখলা রক্ষা তাঁরই কুদরতে আন্‌জাম পাচ্ছে। পরিচিতি লাভ করতে হবে সে প্রাণকেন্দ্রেরও, যার চতুর্দিকে এই শহর প্রদক্ষিণ করছে। এটি-ই সে মা'রিফাত, যার জন্য আম্বিয়া-ই-কিরামকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَكَذَالِكَ نُرِىْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ـ

"এভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিস্ময়কর ব্যবস্থাগুলো দেখাই আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" [সূরা আন'আম ঃ ৭৫]

সর্বাপেক্ষা পবিত্র দায়িত্ব

এই আল্লাহর মা'রিফাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আমার বক্তব্যে উল্লিখিত উদাহরণটি শহরের নিছক একজন প্রশাসক কিংবা নিয়ন্ত্রকের ব্যাপার নয়, বরং তিনি শহরের সৃষ্টিকর্তাও। তিনিই তার অস্তিত্ব দান করলেন। এতে জীবন সঞ্চারও করলেন। জীবন যাপনের সর্ববিধ উপাদান সহজ সুলভে যুগিয়ে দিলেন। তিনি রুযীদাতা। তিনি বিনয়ী, দয়ালু, ক্ষমতাবান। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ যতটুকু, সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক এর চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে আল্লাহর সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টিকুলের সাথে যে কতটুকু সুপরিসর, গভীর ও প্রগাঢ়। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের কয়েকটি সুন্দর নামের পরিচিতি পাওয়া যাবে, যার মহিমায় ধারার প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রদীপ্ত।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তিনি অদৃশ্য দৃশ্যের পরিজ্ঞাত; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা হাশর ঃ ২২-২৪]

সুতরাং মানুষ তার প্রদত্ত বুদ্ধির সার্বিক প্রয়াসের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহর মা'রিফাত ও পরিচিতি লাভ করে তা রাখতে হবে অন্তরের অন্তস্তলে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রমাণ দেখাতে হবে তার প্রতি ঐকান্তিকতার। তাঁর তাবেদারী, সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও কৃপা দৃষ্টি অর্জনে অক্লান্ত সংযম সাধনা করাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ ও পরম দায়িত্ব। মানবতা ও ভদ্রতার দাবিও এটি। সুবুদ্ধি ও নিষ্ঠা-প্রকৃতিরও এটাই চাহিদা।

মানুষের স্তর বিভিন্ন। তাদের সক্রিয়তা, তৎপরতা ও দাওয়াতের পাশে রয়েছে আম্বিয়া-ই-কিরামের তৎপরতা। উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এই পবিত্র দলটির প্রয়োজন পরাপরদের জন্য কতটুকু? শরীরের জন্য আত্মার, কর্মের ক্ষেত্রে বুদ্ধির এবং মানব জাতির জন্য দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখ দু'টির প্রয়োজন যতটুকু।

তাদের উপস্থিতি ছাড়া জগত (যদিও এতে সমস্ত জ্ঞান, সাহিত্য-ভাণ্ডার, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প ও পেশা থাকুক না কেন) অন্ধকার আর অন্ধকার। যেন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন এক সাগর!

ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۭ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۭ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۔

"পুঞ্জীভূত অন্ধকার, স্তরের ওপর স্তর, এমন কি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই।" [সূরা নূর ঃ ৪০]

মানবতার কল্যাণ, বরকত ও সভ্যতার অগ্রগতির আসল উপাদান

আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.) শুধু আল্লাহর বিশুদ্ধ মা'রিফাত ও নিশ্চিত ইল্‌মের প্রাণকেন্দ্র ও উৎস নয়, বরং এর সাথে সাথে তাঁরা মানব সমাজকে দান করেন আরো এক অমূল্য সম্পদ। মানবতার কল্যাণ ও বরকত আনয়ন এবং সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিষ্ঠা সাধন এই সম্পদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সে মহামূল্যবান উপাদান হচ্ছে ভালোর প্রতি অনুরাগ ও মন্দের প্রতি বিরাগমনা হওয়ার পবিত্র প্রেরণা সৃষ্টি করা, শিরকের শক্তি ও ঘাঁটিগুলো ধূলিসাৎ করা, মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করা এবং উন্নতি লাভের নিমিত্ত নিজকে উৎসর্গ করার দৃঢ় মনোবৃত্তি। মানুষের সর্বপ্রকার উন্নতি, অগ্রগতিও অটুট কৃতিত্বের মৌলিক ও আসল কারণই হচ্ছে এই পবিত্র চেতনা ও সুদৃঢ়তা।

কারণ সমস্ত উপায়-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম আর অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একমাত্র মানুষেরই দৃঢ়তা ও সংকল্পেরই অধীন। সমস্ত কৃতিত্বের মূল ভিত্ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাবৃত্তি। উপরিউক্ত কল্যাণমণ্ডিত বিষয়টির আসল চয়নক্ষেত্র ও উৎস আম্বিয়া-ই-কিরামের তা'লীমে আবহমানকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েই নিজেদের কওম ও উম্মত তথা সমস্ত সমাজে ভালো কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টির দিকটি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। ন্যায়ের সাহায্য করা ও অন্যায়ের সাথে বিরোধিতা করার আদর্শকে সমাজের মানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার জন্য তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। মানবেতিহাসের এ সুদীর্ঘকালব্যাপী যখনি এ মনোবৃত্তিটি দুর্বল হয়ে পড়েছে, মানুষের প্রকৃতিতে ও চালচলনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে তাদের মধ্যে তখন হিংস্রতা ও পাশবিক কার্যকলাপ, যেমন আমরা কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির মর্মান্তিক অবস্থা অবলোকন করেছি, আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.) তখনই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিষ্ঠুরতা ও পশুত্বকে তাঁরা করুণা, বদান্যতা, ভদ্রতা ও মানবতা দ্বারা পাল্টিয়ে দেন। তাঁরা তাঁদের উচ্চ তা'লীমের প্রচলন ঘটান। তাঁদের উপর্যুপরি চেষ্টা ও সাধনা বলবৎ রাখেন। তাঁরা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের দিকে মোটেই লক্ষ্য করেন নি। নিজের ইয্যত-সম্মানের খেয়াল করার সুযোগ তাঁদের কোথায়? এমন কি স্বীয় জীবন ও দেহের কথাটুকুও ভাবতে সুযোগ পান নি তাঁরা। সে অব্যাহত ও জীবনপণ প্রচেষ্টা ও মেহনতের বদৌলতে মানবতাবিবর্জিত হিংস্র জন্তুদের মাঝে জন্ম নিল এমন সব পবিত্রাত্মা, যাদের সুঘ্রাণে সারাটি দুনিয়া বিমোহিত হয়ে উঠল, যাদের জ্যোতি ও শোভা মানবতার ইতিহাসে বয়ে এনেছে এক অপূর্ব আকর্ষণ ও স্নিগ্ধতা এবং সম্মান ও মর্যাদায় যাঁরা ফেরেশতা হতে অগ্রগামী হয়ে গেলেন। আর এসব অনুপম আদর্শের অধিকারী অনুসরণীয় পথিকৃতদের বরকতে ধ্বংসপ্রাপ্ত নিমজ্জিত মানবতার ভাগ্যে ফিরে এল নতুন জীবন। এল ন্যায় ও নিষ্ঠার শাসনকাল। সবলদের থেকে দুর্বল নিজেদের দাবি আদায়ের সুযোগ পেল। ছাগলের রক্ষক হয়ে চলল চিরশত্রু চিতাবাঘ। মরুতে প্রবাহিত হলো দয়া-দাক্ষিণ্যের শীতল হাওয়া। ছড়িয়ে পড়ল মায়া-মমতায় হৃদয়গ্রাহী সুগন্ধ। সৌভাগ্যের বিতান জমজমাট হয়ে উঠল। জান্নাতের সরঞ্জামে দুনিয়ার বাজারের দোকান সুসজ্জিত হতে থাকে, প্রবাহিত হয় ঈমান ও ইয়াকীনের মন-মাতানো বায়ু। মানবাত্মাগুলোও লোভ-লালসার বেড়াজাল থেকে আযাদ হয়ে কল্যাণের দিকে এভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে, লৌহখণ্ড যেভাবে হয়ে থাকে চুম্বকের দিকে।

মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি, উন্নতি ও অগ্রগতির পথে সে মহান সম্প্রদায়টির যতটুকু অবদান রয়েছে, অন্য কারো দ্বারা তা আদৌ হয়নি। করুণা ও কৃপার সুমধুর হাওয়া, মানুষের সম্মান, ভদ্রতা, সাম্য, সামঞ্জস্য ইত্যাদি তো তাঁদেরই থেকে পেয়েছে সারা মানবকুল, যা তাঁদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর সে দয়া ও বদান্যতায় মানব জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভব হয়েছে। আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর আবির্ভাবই যদি না হতো, ইন্সানিয়াতের নৌকা তার ইল্‌ম, দর্শন, প্রজ্ঞা ও কৃষ্টি-কালচার নিয়ে তুফানের শিকার হয়ে সাগরের অতল তলে তলিয়ে যেত। মানুষের স্থলে এ বসুন্ধরায় তখন বন্য পশু ও হিংস্র প্রাণীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত-পা সঞ্চালন করতে দেখা যেত। তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালককে তখন চিনত না, সম্পর্ক রাখত না ধর্ম ও চরিত্রের সাথে। বিনয়, ভালবাসা কি, তা তো বুঝতই না। সারকথা, তখন নামধারী এই মানব জাতির পানাহার কিংবা কিছু শাক-পাতা ছাড়া আর কিছুই চিনত না।

আজকের বিশ্বে যা কিছু সুউচ্চ মানবিক নেতৃত্ব, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, উত্তম মানের চরিত্র প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যত সোচ্চার ধ্বনি শ্রুত হচ্ছে, এসবের ঐতিহাসিক সূত্র অর্থাৎ জড়িত রয়েছে আসমানী ওহীর পদতলে অর্থাৎ নবীকুলের তা'লিম, তাঁদের দাওয়াত, তাঁদের তাবলীগের কাছে। এসব একমাত্র নবীগণের বিরামহীন সাধনা ও তাঁদের সহচরবৃন্দের একনিষ্ঠতারই ফসল বৈ নয় এবং দুনিয়া (আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত) তাঁদেরই দস্তরখানের নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট কুড়াতে বাধ্য। তাঁদেরই ছড়ানো জ্যোতিতে আজ দুনিয়াবাসী সামনের দিকে এগুতে প্রয়াস পাচ্ছে। মাথাটুকু গুঁজে থাকে এদেরই প্রতিষ্ঠিত মজবুত অট্টালিকার ছায়াতলে। এভাবেই তা জীবন কাটাচ্ছে, আরো কাটাবে। সেসব ধন্য ও বরেণ্য মহামনীষীর ওপর বর্ষিত হোক লাখো সালাম!

بہار اپ جو دینا میں ائی ہوئی ہے ۔

یہ سب بود را نہیں کی دگائی ہونی ہے ۔

এখন যে ঋতুরাজ বসন্ত এল বসুন্ধরায়,
উদীয়মান চারা গাছগুলো, এসেছে এরই কৃপায়।

অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সদস্য ও মজলিস তাহ্‌কীকাতে নাশরিয়াত ইসলামের সেক্রেটারী মাওলানা রাবে হাসানী নদভীর অভিমত

ইউরোপের অত্যন্ত উচ্চ মানের ও সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে কয়েক বছর থেকে একটি ইসলামী সেন্টার কায়েম হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট তিন ব্যক্তি প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. খালিক আহমাদ নিজামী সাবেক ভি. সি. আলিগড় ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান ড. ফারহান নিজামী ও মুহতারাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ সেন্টারের প্রতিষ্ঠা এত জটিল ছিল না, যত না জটিল ছিল এর জ্ঞান, গবেষণা ও ব্যবস্থাপনার মান অক্সফোর্ডের মানের সাথে সংগতি ও সামঞ্জস্য বিধান করা এবং ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে এর অবস্থান ও মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় করা। প্রাচ্যের জ্ঞান, গবেষণা ও ইসলামী কাজের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতাকে মানিয়ে নেয়া ছিল এ অঞ্চলে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য যা এ কুফর ভূমিতে ইসলামের পরিচয় করানো এবং তার বিশাল ইতিহাস ও মহান শিক্ষার সাথে তাদেরকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার নামান্তর।

এ সেন্টারের সভাপতিত্ব হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীকে অর্পণ করা হয়। এর এন্তেজামী দায়-দায়িত্ব প্রফেসর খালিফ আহমাদ নিজামীর সাহসী ও যোগ্য সাহেবজাদা ড. ফারহান নিজামীকে দেয়া হয়। এ দায়িত্ব তিনি এত সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন যদ্দারা এর ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার মানকে পৃথিবীর বিজ্ঞ ও জ্ঞানী সমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বরণ করছে।

এ সেন্টারের সম্মতি ট্রাস্টি কুয়েতের পণ্ডিত শায়খ আব্দুল আজিজ আল আলী আল মুতায়ে-এর নামে একটি লেকচারের ধারা শুরু করে, যা ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, স্কলারদের সামনে ইসলামের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের পরিচয় পেশ করার একটা সুযোগ। এ ধারার প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ওপর।

হযরত মাওলানা "ইসলাম জ্ঞানের মর্যাদা, জ্ঞান প্রচার, প্রসার ও বিস্তারে তার অবদান" শিরনামে একটি অত্যন্ত অর্থবহ, জ্ঞানগর্ভ ও চিন্তাপুষ্ট প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন যা সেন্টারের পক্ষ থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হলে একটি অত্যন্ত বিজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সমাবেশ উপস্থাপন করা হয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও হযরত মাওলানার শক্তিশালী ও প্রাঞ্জল বর্ণনা ভঙ্গি প্রবন্ধের গুণগত মান আরও বাড়িয়ে দেয়। এ প্রবন্ধ আরবী ও উর্দুর কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখন ব্যাপক ফায়দার প্রতি লক্ষ্য রেখে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে যাতে তার উপকার আরও ব্যাপক হয়।

মুহাম্মদ রাবে হাসানী
সেক্রেটারী
ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা, লক্ষ্ণৌ
ও
সদস্য, অক্সফোর্ড ইসলামী সেন্টার

মানবতার পথ প্রদর্শনে ইসলামের সুমহান অবদান

[১৯৮৭ সালের আগস্টে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ইসলামিক সেন্টারে পঠিত প্রথম প্রবন্ধ]

নবুওয়তে মুহাম্মদীর মু'জিযা ও বৈপ্লবিক অবদান

সুধীমণ্ডলি! যদি পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি থেকে থাকেন যাঁর ব্যাপারে অত্যন্ত জোরাল ভাষায় বলা যায়, তিনি ইতিহাসের প্রচলিত ধারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং অজ্ঞতার পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তে চিন্তা-গবেষণা, পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে মানব জাতিকে অভ্যস্ত করেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। আমরা তাঁকে ইতিহাসের এমন এক দ্বিমুখী রাস্তায় দেখতে পাই যেখান থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে বিবেক ও প্রমাণ এবং অলীক ও ভ্রান্ত ধারণার পথ। তাঁর শিক্ষা মানব বিবেককে করেছে উজ্জ্বল এবং প্রতিভাকে করেছে দীপ্তিময়। উল্লিখিত বক্তব্যের বলিষ্ঠ প্রমাণ এই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম যে বাণী অবতীর্ণ হয় তাতে মহান স্রষ্টা মানব জাতিকে 'জ্ঞানে'র মহান দান ও অনুগ্রহের কথা এবং কলমকে এ জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন, জ্ঞানের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার সাথে যার সম্পর্ক চিরন্তন। এ মহাবাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলন। অব্যাহত থাকে জ্ঞান চর্চার এ পবিত্র ধারা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি, এক জাতি থেকে অন্য জাতি, এক যুগ থেকে অন্য যুগ ও এক বংশ থেকে অন্য বংশ পর্যন্ত। জ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও মানব জাতির প্রয়োজন অনুসারে তার বিস্তারের এ মহান অবদানের গৌরব একমাত্র সেই মহান স্রষ্টারই প্রাপ্য। জ্ঞানের এ বিরামহীন সফর ও অব্যাহত পথ পরিক্রমার কারণেই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য পাঠশালা ও বিদ্যাপীঠ এবং আজও জীবন্ত রয়েছে সকল জ্ঞান-গবেষণাগার। প্রাণবন্ত রয়েছে খ্যাতনামা গ্রন্থাগার ভুবন।

সুধীমণ্ডলি! যতদূর মানব কল্পনা ও অনুমানের সম্পর্ক তাতে এমন কোন ঐতিহাসিক ও যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না যদ্দারা ধারণা করা যায়, দীর্ঘ বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীতে ও কলমের আলোচনা স্থান পেতে পারে। কারণ এ ওহী এমন এক ব্যক্তি, এমন এক জাতি ও এমন এক অনগ্রসর সমাজ ও অঞ্চলে অবতীর্ণ হচ্ছে যেখানে একটুকরা কাষ্ঠখণ্ড যা কলম নামে পরিচিত

এবং সে সমাজ ও সেখানে বসবাসকারী জাতির কাছে যা ছিল সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ বস্তু। এ কারণেই আরব জাতি নিরক্ষর জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ - وَاِنْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

"তিনি সেই সত্তা, যিনি তাদের ভেতর থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তার আয়াত পাঠ করে শোনান, তাদের পবিত্র করেন, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার কথা শিক্ষা দান করেন, যদিও তারা এর পূর্বে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল।" [সূরা জুমু'আ ঃ ২]

একটি অপ্রত্যাশিত সূচনা

হেরা গুহায় সর্বপ্রথম যেই ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে এবং সুদীর্ঘ ছয় শ' বছরের বিরতির পর যমীনের সাথে আসমানের, বরং সঠিক ভাষায় বলতে হয়, নবুওয়তী ওহীর মাধ্যমে যমীনের সাথে আসমানের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে ইবাদত-বন্দেগীর নির্দেশনা, আল্লাহর পরিচয় ও মারেফাত সম্পর্কে কোন ইতিবাচক বিধি-বিধান অথবা মূর্তি পূজা পরিহার করা ও জাহেলী যুগের আচার-অভ্যাসের সমালোচনার মতো কোন নেতিবাচক কথা ছিল না, (যদিও এসব বিষয় স্ব স্ব স্থানে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মত এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও তাবলীগ করা হয়েছে), বরং সর্বপ্রথম বাণী যার মাধ্যমে ওহীর শুভ সূচনা হয় তা ছিল ঃ "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়া তোমার রব মহামহিমাময় যিনি কলমের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানত না"। এভাবেই প্রকাশ পায় ঐতিহাসিক ঘটনার যা উন্মুক্ত করে দেয় ইতিহাসবিদ ও চিন্তাশীলদের সম্মুখে গবেষণার প্রশস্ত দিগন্ত। ওহীর এ সুর ও সূচনা এই হাকীকতের প্রতিই বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ইংগিত বহন করছিল। যে নিরক্ষর নবী (সা.) দ্বারা ধর্মের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হতে যাচ্ছে যা ব্যাপক ও গভীরভাবে পাঠ-পঠনের সুবিশাল উন্নতির যুগ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য হবে সোনালী যুগ। যদ্বারা জ্ঞানও ও দ্বীনের যৌথ উদ্যোগে মানবতার গঠন ও বিন্যাসের কাজ সম্পাদিত হবে।

আত্মা, মহাকাশ এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের অতীতকাল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রতি আহ্বান ও তার উপকারিতা

মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন জ্ঞানের বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমের আলোচনার সাথে এমন সব বস্তুর প্রতিও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, জ্ঞানার্জনের স্বার্থে যা অধ্যয়ন করা উচিত। এ ব্যাপারে আল্-কুরআন আত্মা, মহাকাশ ও অতীত জাতিসমূহের উত্থান-পতনের বিভিন্ন অবস্থাদির প্রতি চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কুরআনের ভাষায় যাকে আইয়ামুল্লাহ, সুন্নাতুল্লাহ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আধুনিক পরিভাষায় যাকে ইতিহাস বলা হয়, যাতে মানুষ এসব বস্তুর ভেতর চিন্তা-গবেষণা করে প্রয়োজনীয় ফলাফল আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় এবং মানব জাতি তার অত্যন্ত মূল্যবান ও সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়।

আল্লামা ইকবাল তাঁর বিখ্যাত ভাষণে ইসলামের আগমনের ফলে মানব বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞানের মাধ্যম ও উৎসের যে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সুফল ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান আহরণের একটি উৎস মাত্র। কিন্তু আল-কুরআন জ্ঞান অর্জনের আরো যে দুটি মাধ্যমের কথা বার বার জোরালো ভাষায় উল্লেখ করেছে, তা হলো সৃষ্টি জগত, মানব ইতিহাস। মুসলিম বিশ্ব এ উভয় উৎস থেকে জ্ঞানার্জন ও উপকৃত হবার ক্ষেত্রে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কুরআনের ভাষায় চন্দ্র, সূর্য, বছরের হ্রাস-বৃদ্ধি, রাত্রিদিনের পরিবর্তন এবং ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা, জাতিসমূহের জীবনের ব্যর্থতা ও সফলতা, যুগের আগমন ও প্রত্যাগমন, মোটকথা এ সৃষ্টি জগতের যা কিছু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে থাকি এর সব কিছুই এক মহাসত্যের নিদর্শনাবলী। তাই এর সব কিছু নিয়ে গবেষণা ও এর মাঝে চিন্তা-ভাবনা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যেন এমনটি না হয়, তারা অন্ধ বধিরের মত এসব নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কারণ আজ যে ব্যক্তি এসব থেকে চক্ষু বন্ধ করে থাকবে সম্মুখের অনন্ত জীবনেও তারা অন্ধই হয়ে থাকবে। এ কারণেই এ বাস্তব ও অকাট্য সত্যের প্রতি বার বার লক্ষ্য করার প্রতি আহ্বানের সাথে সাথে (যার শিক্ষা আল-কুরআন দান করেছে) ধীরে ধীরে মুসলমানরা যখনই এ সত্যের সন্ধান ও তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হলো। সৃষ্টি জগত চলমান গতিশীল, তা অনন্ত এবং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফল এই দাঁড়াল, তারা দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শুরুতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে যে গ্রীক (يونانى) দর্শন অধ্যয়ন করেছিল, সাথে সাথে তারা তার বিরোধিতা শুরু করে। শুরুতে তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি যে, কুরআনের মূল দর্শন ও আহ্বানের সাথে রয়েছে গ্রীক দর্শনের সংঘাত, তাই তারা শুরুতে গ্রীক

দর্শনের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে গ্রীক দর্শন ও চিন্তা-ধারার আলোকেই পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন শুরু করে। কিন্তু যেহেতু কুরআন পাকের ভিত্তি (نور) বাস্তব (مسوس) ও অকাট্য সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অপরদিকে গ্রীক দর্শনের ভিত্তি অনুমান ও যুক্তির ওপর, অকাট্য ও বাস্তব সত্যের ওপর নয়, তাই এক পর্যায়ে এর ব্যর্থতা ছিল অপরিহার্য। বাস্তবেও তাই হলো। আর এ ছিল ঐসব কর্ম প্রচেষ্টার ব্যর্থতা যার পরে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার প্রকৃত শক্তি ও আহ্বান নিয়ে প্রকাশ্যে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, এমন কি আধুনিক সভ্যতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকেও লক্ষ্য করলে দিবালোকের মত ফুটে উঠবে, এসব সভ্যতার বিকাশ ইসলামের কাছে ঋণী। আল্লামা ইকবাল আরও বলেন, পবিত্র কুরআন ইতিহাসকে ايام الله আল্লাহর দ্বীনসমূহ বলে উল্লেখ এবং একে জ্ঞানের অন্যতম উৎস আখ্যা দিয়েছে। বুনিয়াদি সত্য এই, অতীত জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক উভয়ভাবেই হিসাব গ্রহণ ও পাকড়াও করা হয় যার ফলে এ দুনিয়াতেই তাদের অপরাধের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রমাণের জন্য কুরআন পাক বার বার ইতিহাসের ওপর নির্ভর করেছে। এছাড়াও আল-কুরআন গভীরভাবে মানবগোষ্ঠীর বর্তমান ও অতীত অবস্থা ও ঘটনাবলী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি স্বীয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ - وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ -

"আমি মূসা (আ.)-কে আমার নিদর্শন দিয়ে প্রেরণ করলাম যে, তুমি তোমার কওমকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যাও। তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনসমূহের (অতীত ঘটনাবলীর) কথা স্মরণ করিয়ে দাও। কারণ তাতে রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য (আল্লাহর অশেষ কুদরতের) নিদর্শনাবলী।"
[সূরা ইবরাহীম–৫]

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ -

"আমার সৃষ্টির এক প্রকার লোক এমন যারা সত্য পথের দিশারী তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, আর যারা আমার নিদর্শনাবলী মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদেরকে আমি পর্যায়ক্রমে অভিনব পন্থায় পাকড়াও করব।" [সূরা আ'রাফ-১৮১-৮২]

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ - فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ -

"তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখে নাও মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে।"

[সূরা আলে ইমরান-১৩৭]

আর ঐ সকল দিন যা আমি লোকদের মাঝে পরিবর্তন করে থাকি, (আলে ইমরান) এবং প্রতিটি জাতির (মওতের) জন্য একটি নির্ধারিত সময় আছে সময় হলে যা ক্ষণিকও আগে পিছে হয় না।

জ্ঞানের বিক্ষিপ্ত এককের ভেতর ঐক্য ও সম্পর্ক সৃষ্টি

জ্ঞান বিস্তার ও জ্ঞানের ভেতর প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টির বিপ্লবের চেয়ে ও জ্ঞানকে সঠিক লক্ষের দিকে পথ প্রদর্শন, জ্ঞানকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা এবং একে উপকারী ও বিশ্বাসের উপায় বানানোর কাজটি আরও দুরূহ, এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাব ও ইসলামী দাওয়াতের অবদান, গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্য অনেক বেশি।

জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বিক্ষিপ্ত, বরং তা অনেক ক্ষেত্রে সংঘাতপূর্ণ ছিল। পদার্থ বিজ্ঞান ও দর্শন তো রীতিমত ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। এমন কি গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো নিষ্পাপ জ্ঞানের পণ্ডিতরাও অনেক সময় এ থেকে ধর্মবিরোধী নেতিবাচক ফলাফল বের করার প্রয়াশ পেত। যেমন গ্রীক বিজ্ঞানীরা (যারা এক শতাব্দী যাবত দর্শন ও গণিতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছিল) এরা হয় মুশরিক, নয়তো ধর্মদ্রোহী। গ্রীক বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা ছিল ধর্মের জন্য ভয়ংকর এবং ধর্মদ্রোহীর জন্য প্রমাণ ও আদর্শ। এ ভয়াবহ অবস্থায় ইসলামের বিরাট বড় অনুগ্রহ ছিল এই যে, জ্ঞানের বাহ্যিক সংঘর্ষপূর্ণ সকল শাখা-প্রশাখাকে এক সূত্রে গেথে দেয়। এটি ইসলামের জন্য এ কারণে সহজ ছিল যে, তার জ্ঞানের সফর সঠিক সূচনা বিন্দু (Starting point) থেকে শুরু হয়। ইসলাম জ্ঞানের সুদীর্ঘ সফর আল্লাহর ওপর ঈমান, তাঁর থেকে সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে এবং (اقرأ باسم) নির্দেশ তামীলের লক্ষ্যেই তা শুরু করেছিল। সঠিক সূচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্যাণ ও শুভ

পরিণামের জামিন হয়। ইসলাম, কুরআন, ঈমানের অনুগ্রহ ও অবদানের সুবাদে জ্ঞান সমূহের মাঝে এমন ঐক্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় যা সমগ্র এককে এক সূত্রে বেঁধে দেয়। আর তা হলো মহাপবিত্র আল্লাহর পরিচয়। যে ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক তাঁর ঈমানদার বান্দাদের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْ بِهِمْ ۔ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ۔ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

"এবং (তারা) আসমান ও যমীনসমূহের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে ঃ হে আমাদের রব, এ সব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র। অতএব বাঁচাও আমাদের দোযখের শাস্তি থেকে।" [সূরা আল্ ইমরান–১৯১]

অতীতকালে মানুষ সৃষ্টি জগতের ইউনিটসমূহকে (অর্থাৎ তার বাহ্যিক ঘটনাবলী ও পরিবর্তনসমূহ) পরস্পর বিরোধপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক মনে করত যা মানুষকে হতবুদ্ধি ও হতভম্ব করে দিত এবং যা মানুষকে কুফর ও ধর্মদ্রোহী পর্যায়ে নিয়ে যেত এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও সমগ্র সৃষ্টির পরিকল্পনাকারীর প্রতি ভর্ৎসনা ও অভিযোগের পর্যায় নিয়ে যেত। এ ভয়াবহ অবস্থা দৃষ্টে ঈমান ও কুরআনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান গোটা বিশ্বকে এমন ঐক্য দান করল যা গোটা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটকে এক অভিন্ন সূত্রে বেঁধে দিল। এটি আল্লাহ্ পাকের প্রবল ইচ্ছা ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ছাড়া কিছুই নয়। জার্মানির একজন বড় মাপের পণ্ডিত হিরাল্ড হোফডিং [Herald Hoffding] আধুনিক দর্শনের ইতিহাস [History of Modern Philosophy] নামক গ্রন্থে ঐক্যের আবিষ্কার মানব জীবনে ও ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক সফরে এর কার্যকর অবদানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন ঃ প্রতিটি ধর্মের বিশ্বাস তাওহীদের ওপর, এমন প্রত্যেক মানুষ যার দৃষ্টিকোণ এই, এ সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের মূল কারণ একটিই। এ চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী সংকটসমূহ থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে বলা যায়, এ আকিদা ও বিশ্বাস মানব-স্বভাবের ওপর কল্যাণকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং এর অনুসারীদের এ বিশ্বাস ও আকীদা রাখা সহজ হয়ে যায়। (কিছু বিরোধ ও ব্যাখ্যার কথা বাদ দিয়ে বলা যায়) পৃথিবীর সকল বস্তু একক নীতিতে আবদ্ধ। তাই "কারণের ঐক্য" নীতির ঐক্য দাবি করে।

মধ্যযুগের ধর্মীয় দর্শন মানব মস্তিষ্কে বহুর ভেতর ঐক্যের ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, বাহ্যিক দৃশ্যের কারণে আজও অসভ্য লোকেরা যে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। এ বহুত্ব দর্শনে তারা এজন্য ভ্রান্তি ও জটিলতার শিকার হতো, তাদের এসবের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির কোন কৌশল জানা ছিল না।

পাশ্চাত্য জাগরণ, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবযুগের সূচনায় ইসলামের অবদান

রবার্ট ব্রিফল্ট [Robert Brifault] তার গ্রন্থে [The making humanity] লিখেছেন ঃ

ইউরোপের উন্নতি অগ্রগতির এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতার অনুগ্রহ ও অবদানের সুগভীর ছাপ সুস্পষ্ট নয়।

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি আরো বলেন ঃ

শুধু পদার্থ বিজ্ঞানেই, যাতে আরব অবদান সর্বজনস্বীকৃত, ইউরোপে নব জীবন সৃষ্টির মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি, বরং ইসলামী সভ্যতা ইউরোপীয় জীবনে বিশাল ও বিভিন্নমুখী প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের প্রথম কিরণ যখন ইউরোপের মাটিতে পড়তে আরম্ভ করে তখন থেকেই এর সূচনা হয়।

প্রায়ই এ দাবি করা হয় যে, ইউরোপের পুনর্জাগরণ গ্রীক চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবনের ফলাফল। গ্রীক থেকেই বর্তমান বিশ্ব-শক্তি ও জ্ঞানের আলো পেয়েছে, এ ধারণা খণ্ডন করে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ. জি. উইলস্ (Wells) বলেন–

যে জ্ঞানের সূচনা করার পর গ্রীকরা তাকে বিদায় দেয় এবং পরিত্যাগ করে, আরব মেধা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নব আবেগ-উদ্দীপনার সাথে সুশৃংখল ও সুবিন্যস্তভাবে নিজেদের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, গ্রীক জাতি যদি সত্য আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক উপায়ের জনক হয়ে থাকে তবে আরবরা তার লালনকারী। সুস্পষ্ট বর্ণনা ভঙ্গি, সহজ সরল ব্যাখ্যা, নিয়মতান্ত্রিক ও মেপে তুলে শব্দ প্রয়োগ ও অত্যন্ত গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে তাকে সুসজ্জিত করেছে বরং শুধু আরবদের থেকেই আধুনিক দুনিয়া জ্ঞান ও শান্তির এ অমূল্য উপহার অর্জন করেছে।[১]

---

১. The Outline of History– ১৯২০ ইং ২৭৩ পৃষ্ঠা, ২৭৩।

প্রাচীন বিশ্বে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কল্যাণকর ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ময়দানে তাদের নেতৃত্ব

আমি আমার অধ্যয়নের আলোকে এ দাবি করতে পারি, মুসলিম জাতি বিশাল বিস্তীর্ণ আজিমুশ্‌শান সাম্রাজ্যের শুধু ভিত্তিই স্থাপন করেনি, বরং এক সময় তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা বিশ্বের সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের ভেতর এমন সব মহামানব জন্ম নিয়েছেন যারা জ্ঞান অর্জনের তীব্র আগ্রহ, নিস্বার্থ জ্ঞান সেবা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অমূল্য গ্রন্থ রচনায় যারা ছিলেন অনন্য। প্রথম যুগের আয়েম্মা, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও মুজতাহিদীনদের কথা বাদ দিলেও (যাদের উদাহরণ দুনিয়ার কোন জাতির ইতিহাসে নেই) দেখা যায়, মুসলিম জাতি দ্বীনী ও বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এমন সব অনন্য চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক সৃষ্টি করেছে অন্যান্য জাতির বড় বড় জ্ঞানীর সাথে যাদের তুলনা করা যায়। মুসলমানরা তাদের জ্ঞানার্জনের পরিধি শুধু তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ নীতিশাস্ত্র ও বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং তারা ভূগোল, পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রকৌশলী, ডাক্তারী, রসায়ন, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম ও সভ্যতার মত বিজ্ঞানের সকল শাখায় সেবা করেছেন। অধিকাংশ মুসলিম বিজ্ঞানীরা, আলেমরা শিল্প ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দুনিয়াবাসীকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এসব ময়দানে তারা এমন চিহ্ন রেখে গিয়েছেন যা কখনও মুছে যাবে না। এখানে কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা হলো, কারণ দীর্ঘ পরিচিতির জন্য প্রয়োজন কয়েক খণ্ড গ্রন্থের।

মুসলিম আবিষ্কারক ও বিশেষজ্ঞগণ

১. আল-খাওয়ারিযিমী (৮৫০. ইং ২৩৬ হি.) বিশ্ব ভূগোলের ওপর সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন।

২. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল ইদ্‌রীস (১১৫৩ ইং ৫৬০ হি.) আল মামালিক ওয়াল মাসালিক নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন যাতে অসংখ্য চিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট করে মুসলিম বিশ্বের বাণিজ্যিক রুটের বর্ণনা দিয়েছেন।

৩. ইবনুল হায়ছাম (১০৩৯ ইং ৪৩১ হি.) দু'শ'র মত গ্রন্থ রচনা করেন, যার ভেতর ছেচল্লিশটি জ্যামিতি সংক্রান্ত, আটান্নটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক গ্রন্থ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সূদান সীমান্তে মিশরের বিশ্ব বিখ্যাত আসওয়ান বাঁধ তৈরির পরামর্শ ও পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। "দৃষ্টি" বিজ্ঞানে উপহার দেন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তিনি তাঁর গ্রন্থে (المناظر) এ মতবাদ পেশ করেন যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হওয়া নির্ভর করে সে বস্তুর সাথে আঘাত খেয়ে ফিরে আসা রশ্মির ওপর।

৪. মুহাম্মদ বিন মূসা খাওয়ারিযীমী (৮৫০ ইং ২৩৬ হিজরী) জ্যামিতি বিজ্ঞানে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার পর শূন্য (০) আবিষ্কার (বৃদ্ধি) করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সংখ্যার অবস্থান নির্ধারণ করেন এবং এই খাওয়ারিযীমীই আলজেবরা আবিষ্কার করেন।

৫. আলবাতানী (৯২৯ ইং-৩১৭ হি.) পাশ্চাত্য যাকে (Albategni) এল ব্যাটেগনী অথবা আল বাতেনুস (Albatenus) নামে স্মরণ করে, যিনি মহান আরব সৌর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সূর্য গ্রহণের বক্রতার সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৌর বছরের সময় মৌসুমের পরিবর্তন, সূর্যের (اوسط مدار) কক্ষপথ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান চালান। সূর্যের কক্ষপথ স্থির গতিময়, সূর্যের এ মতবাদকে তিনি খণ্ডন করেন।

৬. আবু বকর মুহাম্মদ আল রাযী (৯৩২ ইং - ৩১১ হি.) পাশ্চাত্য যাকে রেজিছ (Razes) নাম দিয়েছে, মধ্যযুগের সবচে বড় ডাক্তার হবার সাথে মহান দার্শনিক ও রসায়নবিদও ছিলেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও অমর গ্রন্থ আল হাবী (الحاوى) রচনা করেন যাতে গ্রীক, মিসরী ,প্রাচীন আরব ও হিন্দুস্তানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন।

৭. ইবনুল বায়তার (১২৪৮ ইং ৬৪৬ হি.) তিনি স্বীয় যুগের মহান মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ–

جامع المفردات الادوية والأغزية و المغنى فى الادو ية ـ

এতে বিভিন্ন রোগের আলামত ও উপসর্গসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণমালার ধারা অনুসারে নিজের অথবা দেড় শ' বিশেষজ্ঞের দর্শন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রায় চৌদ্দ শ' প্রাণী উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন।

৮. বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে সীনা পাশ্চাত্যে যিনি আবী সীনা নামে পরিচিত তিনি দর্শন বিষয়ক (الشضاء ـ البخاة) চিকিৎসা বিজ্ঞান فى القانون) (الطب সাইকোলজীর ওপর (احوال النفس) রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁর দু' শ' একত্রিশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এক মতে আরও দশটি গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এগুলো তাঁরই রচিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতার ও খ্যাতির পরিধি একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ হবার পর আনুমানিক ৫০০ বছর অর্থাৎ ১৭ শতাব্দীর শেষ অবদি স্বীয় বিষয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হতো।

৯. ইবনে খালদুন (৮০৮ হি. ১৪০৬ ইং) জ্ঞানের রাজ্যে এক দীপ্তিময় নক্ষত্রের সামিল ছিলেন। যিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজ বিজ্ঞানী ও মানব সমাজকে সঠিক দিক দান করার লক্ষ্যে নীতিমালা সন্ধান করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত দার্শনিক "কমিটির" ৫০ বছর পূর্বে তিনি সমাজ বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

১০. জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগত আবু রায়হান আল বিরুনী (হি. ৪৪০-১০৪৮ ইং) বর্ণিল কর্ম প্রচেষ্টার প্রতিও চিরকৃতজ্ঞ, ফিজিকস্ (مابعد الطبعيات) মেডিসিন বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি ও ইবনুল হায়ছামের মতো মুসলিম বিজ্ঞানীরাই বর্তমান বিজ্ঞান ও গবেষণার ভিত্তি রাখেন।

জ্ঞানের ইতিহাসে সবচে' বড় ভ্রান্তি ও মানব ইতিহাসে সবচে' বড় দুর্ঘটনা

এ প্রবন্ধের সমাপ্তি পর্বে এসে আমি একটি বুনিয়াদী সত্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হলো আমাদের কখনও একথা ভুলে গেলে চলবে না, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা। মানুষ নিজে না জ্ঞানের মূল কেন্দ্র, আর না জ্ঞানের উৎস। সেতো পৃথিবীতে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানকারী দূত বা প্রতিনিধি।

পবিত্র কুরআন (যা শিক্ষার ভিত্তি) আদম (আ.)-এর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দানের আলোচনাটি পৃথিবীতে তিনি যে, আল্লাহর প্রতিনিধি এ কথার পরে করা হয়েছে আর তাও প্রসংগক্রমে যা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, তিনি (আ.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীন নন, বরং একজন খলীফা তথা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জ্ঞানের ব্যবহার করতে আদিষ্ট। কিন্তু স্বাধীন নন, জ্ঞানের ইতিহাসে বরং পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরাট দুর্ঘটনা বই আর কিছুই নয় যে মানুষ ভুলে গিয়েছে, সে এ পৃথিবীতে স্বাধীন নয়, বরং সে এই সৃষ্টিজগতে স্রষ্টার স্থালভিষিক্ত ও প্রতিনিধি, তাঁর স্কন্ধে এ পৃথিবীর আমানত অর্পণ করা হয়েছে। তাঁকে পৃথিবীর মালিক ও মনিব বানিয়ে পাঠানো হয়নি যাতে সে যমীনের ওপর ও নিচে অবস্থিত ধনভাণ্ডারসমূহকে সে ব্যক্তিগত, স্বীয় জাতি, বংশ ও শ্রেণীর স্বার্থে অথবা রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার জন্য ব্যবহার করবে! তাই জ্ঞান ও মানবতার ইতিহাস উভয়ের জন্য সেদিনটি ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, যেদিন মানুষ নিজের জন্য ধ্বংসের এ রাস্তা বেছে নেয়, সে পৃথিবীতে স্বাধীন। মানুষকে সব ধরনের স্বেচ্ছাচার থেকে শুধু এ ধারণাই তাকে সঠিক পথে কায়েম রাখতে পারে, সে এ ধরার স্বাধীন মালিক নয়। রাজাধিরাজ আল্লাহর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত, কারণ, এই সত্যের উপলব্ধিই তাকে স্বেচ্ছাচার থেকে বিরত রাখতে পারে, তার স্বেচ্ছাচারের সামনে দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকের প্রাচীর খাড়া করতে পারে।

জ্ঞানের প্রকৃত উৎস ও মালিকের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাস্তবিকই মানবতার জন্য অত্যান্ত বিপজ্জনক। মানুষ জ্ঞান তো অর্জন করে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক জ্ঞানের স্রষ্টাকে ভুলে গিয়েছে। আজ দুনিয়া ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, ইউরোপ-আমেরিকার সমস্ত রাজনিতিবিদ, পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতে চাই যে, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতা নিয়ে গর্ব করে থাকেন। মানুষ এ পৃথিবীতে নিজেকে স্বাধীন ও প্রকৃত মালিক মনে করা বহুত বড় বিভ্রান্ত ও ভুল, যেদিন সে নিজের শুরু ও গোড়ার কথা ভুলে গিয়েছে সেদিন থেকেই সে তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছে। আমি অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে একথা বলতে পারি, মানুষ যতক্ষণ না একথা মেনে নেবে যে, সে শুধু একটি সৃষ্টি, তাকে স্রষ্টার সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে, ততক্ষণ সে এ পৃথিবীর অবস্থার সংশোধন করতে, শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হবে। তাকে একথা মানতেই হবে যে, সে তার অর্জিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সে জ্ঞানের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আর অপর প্রান্তে আছে এ জ্ঞানের মালিক প্রভু ও স্রষ্টা। যদি জ্ঞানের এ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে মানুষ তার সৃষ্টির লক্ষ্যই ভুলে যাবে। এতে আমাদের মানব বিশ্ব পরিণত হবে লড়াইয়ের ময়দানে এবং রূপান্তরিত হবে মানবতার এমন এক বধ্যভূমিতে যেখানে দাসত্বের অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি হবে। অন্যায় ও অবিচারের রাজত্ব কায়েম হবে। চতুর্দিকে জয় জয়কার পড়বে মানবতার অপমান ও লাঞ্ছনার।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেচার, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ প্রফেসর খালীক আহমদ নিজামীর

মুখবন্ধ

[২২ আগস্ট ১৯৮৯-এর সন্ধ্যা। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির 'সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ' কর্তৃক আয়োজিত এ সভায় প্রফেসর খালীক আহমদও উপস্থিত ছিলেন]

অক্সফোর্ডের সে সুন্দর সন্ধ্যা কি কোনদিন ভোলা যাবে, যখন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর এ প্রবন্ধ ইংল্যান্ড, আফ্রিকা, আরব ও পাক-ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের এক অনন্য সমাবেশে একজন মনীষী আলেমের ভাব-গাম্ভীর্য সত্ত্বেও পরম উচ্ছ্বাসে পেশ করেছিলেন?

মানবতার উদ্দেশে এ এক সমব্যথী অন্তরের আহ্বান। সাম্প্রতিককালে মহানবী (সা.)-এর ওপর সেখানকার বেশ কিছু প্রকাশনা শ্রদ্ধেয় মাওলানা নদভীর অন্তরে এক আবেগঘন অনুভব সৃষ্টি করে রেখেছিল। আর তাই তিনি চাইছিলেন, এবার যখন তিনি ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখবেন তখন তাদের বলবেন, মহানবী (সা.)-এর মহান ব্যক্তিত্ব তাদের কী দিয়েছে! ইউরোপীয়দের ওপর মহানবী (সা.)-এর অবদান কত বিরাট! এ প্রবন্ধে একটি 'আহত উপলব্ধি' কর্তৃক ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে এ আহ্বান জানানো হয়েছে যে, সে যেন অকৃতজ্ঞ অন্তরগুলোকে মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.)-এর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয় আর বলে দেয় যে, অকৃতজ্ঞতা এমন এক নৈতিক অপরাধ যা মানব সমাজের প্রতিটি সাফল্য ও কল্যাণের দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা এ ভাষণ দিচ্ছিলেন অত্যন্ত উঁচুদরের আরবী ভাষায়। আরব ও আরবী জানা শ্রোতারা যেন জাদুগ্রস্ত ও মোহাবিষ্ট ভাষণ শেষ হলে! প্রতিটি মুখে কেবল আল্লামা নদভীর ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি, উন্নত নৈতিকতা আর মানবতার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসারই আলোচনা। এরপর লন্ডনে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা নদভীর কাছ থেকে এ প্রসঙ্গে আরো কথাবার্তা খুব আগ্রহভরে শোনা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধিরা দলে দলে এসে তাঁকে দাওয়াত করেছেন, কিন্তু নির্ধারিত কর্মব্যস্ততার দরুন আল্লামা নদভী সবখানে যেতে পারেন নি। এ প্রবন্ধ বর্তমানে ইংরেজী, আরবী ও উর্দু–তিন ভাষায়ই প্রকাশ পাচ্ছে, ব্যাপক ফায়দার লক্ষ্যে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হলো। আশা করি এটি সর্বত্র অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পড়া হবে। সেই সাথে হযরত মাওলানার ইংল্যান্ডে না থাকার ক্ষতিও অনেকাংশে এ মুদ্রিত প্রবন্ধ পূরণ করবে বলে আশা করি।

ইতিহাস সাক্ষী, রাসূল (সা.)-এর আগমন মানব জাতিকে চিন্তা ও কর্মের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তাদের জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে মানবতার প্রেম শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভূপৃষ্ঠে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। মহানবী (সা.) স্বয়ং বলেন ঃ

بعثت لاتمم حسن -

"চারিত্রিক উৎকর্ষের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"

মহানবী (সা.) তাঁর পয়গাম মানবতার প্রতি পৌঁছে দেয়ার শেষ লগ্নে বিদায় হজ্বের সময় নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণ করে দিলাম।" [সূরা-মায়িদা ঃ ৩]

উপস্থিতি সাক্ষ্য প্রদান করে ঃ

"আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনি আপনার পয়গাম উত্তমরূপে পৌঁছে দিয়েছেন।"

বর্তমান যুগে এক শ্রেণীর মানুষ বিশ্বমানবতার ওপর মহানবী (সা.)-এর অসামান্য অনুগ্রহ আর অবদানের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে আছে। তাদের এ দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনাই তাদের নিজেদের নৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার জন্যে দায়ী। আর তাদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসেরও দলিল। এ প্রবন্ধে আল্লামা নদভী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলেছেন মহানবী (সা.) মানব জাতিকে কী দিয়েছেন। তিনি তৎকালীন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত তিনটি বড় সভ্যতার-রোমান, সাসানীয় ও ভারতীয়-মৌলিক চিন্তাধারাগুলো বদলে দিয়েছেন। মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন মানবতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ভবিষ্যতের পথকে এ শিক্ষা এতই উজ্জ্বল করেছে, যার প্রভা বহু শতাব্দী পর আজও মানব হৃদয়কে স্পর্শ করছে। মানব সভ্যতা বহুবার পাশ ফিরলেও তাঁর পয়গামের উপকারিতা অপরিবর্তিতই রয়েছে, বরং দিন দিন এর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোঙ্গলরা যখন ইসলামী বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তছনছ করে দেয় এবং মধ্যএশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও বড় বড় শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইসলামী আদর্শ পুনরায় তার সক্ষমতা প্রদর্শন করে, খুব বেশি দিন লাগেনি,

সেসব অসভ্য জাতি খুব দ্রুত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তাদের দ্বারাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিধ্বস্ত শহর-নগর পুনরায় তারাই গড়ে তোলে। ইসলামের প্রকৃতি এটিই, কবির ভাষায় ঃ

"কারেঙ্গে আহলে নজর তাযাহ্ বসতিয়াঁ আবাদ"

অর্থাৎ, দিব্যদৃষ্টিমান সাধকেরা চোখের দৃষ্টিতে পুনরায় জিন্দা করবেন মৃত সব নগরী।

ইউরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সভ্যতাবিশারদগণ ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সভ্য ও উন্নত বিশ্ব কোনক্রমেই ইসলামের মহান পয়গম্বর (সা.)-এর অবদান ও অনুগ্রহের ব্যাপারে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। এসব চিন্তাবিদের উদ্ধৃতির আলোকেই আল্লামা নদভী তাঁর আলোচনায় এসব অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে যে উপস্থাপনধর্মিতা, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, শক্তিমত্তা ও কণ্ঠস্বরের যে আবেগ আর নিষ্ঠা—পুস্তিকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়েই পাঠক তা আন্দাজ করতে পারবেন।

আল্লামা নদভী এ আহ্বান একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ স্থান থেকে বিশেষ অবস্থার দাবিতে উচ্চারিত হয়েছিল বটে, তবে এর আবেদন প্রতিটি ক্ষেত্রেই সব সময় পাঠককে উপকৃত করবে।

মহানবী (সা.)-এর অবদানে আজকের সভ্য পৃথিবী

[আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ২২শে আগস্ট ১৯৮৯ ইং অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ কর্তৃক আয়োজিত সভা প্রদত্ত ভাষণ]

সুধীমণ্ডলি,

এই পৃথিবীর দিকে একটু তাকান, এখানে আমাদের বসবাস। সকলেই এখানে স্বীয় বিশ্বাস, রুচি, যোগ্যতা ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। স্বদেশবাসী শুধু নয়, বরং সমকালীন সকলের সাথে ভদ্র ও মার্জিত, শান্তি ও সুখময় জীবন যাপনে আমরা অভ্যস্ত। এর সাথে সাথে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণ, রচনা ও গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের সুপরিসর ক্ষেত্রেও আপন মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের অংশ গ্রহণ লক্ষ্যণীয়। তদুপরি এ জীবনধারা ও সমাজ ব্যবস্থাকে আরো নিরাপদ, সুন্দর, শান্তিময়, অধিক উন্নত ও প্রগতিশীল করার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে বিরাজমান। কিন্তু এ দুনিয়া, এ ভূগোলক ও আমাদের এ বাসভূমি সর্বদা এমন শান্ত-সংযত, ভারসাম্যপূর্ণ, সহনশীল ও উদার ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন, আপন বিশ্বাস ও চিন্তাধারার আলোকে জীবন যাপন, পরস্পরের স্বীকৃতি, সৌজন্য প্রদর্শন ও সহাবস্থান তথা Co-existence-এর এমন উপযুক্ত পরিবেশ যে এ পৃথিবীতে সর্বদা বিরাজমান ছিল, এমন নয়।

এ ভূখণ্ডে বসবাসরত মানব জাতি অনেকবার আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক যুগ এসেছে যখন মানুষ বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও হারিয়েছিল। মানবিক অনুভূতি ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে তারা হয়ে উঠেছিল নির্বোধ প্রাণী ও রক্তপায়ী মানুষখেকো হিংস্র জানোয়ারের অনুরূপ। সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শিল্প, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, আইন ও ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা ও নিয়ম-কানুন সব কিছুই যেন অন্তিম নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছিল।

সকলেই অবগত আছেন, ইতিহাস সংকলনের কাজ অনেক বিলম্বে ঘটেছে এবং 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগ 'ঐতিহাসিক' যুগের চেয়ে অনেক অনেক দীর্ঘ ও বিশাল। সর্বোপরি মানবতার ভিরোধান ও পশুত্বের উত্থান-ইতিবৃত্ত এমন সুখকর ও গৌরবজনকও নয়, তার উপস্থাপন তৎপরতায় লেখক ও ঐতিহাসিকগণ প্রতিভা ও মেধা নিঃশেষ করে দেবেন। এজন্যেই মানব সমাজ সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মানসতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাসমূহের পতন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক

বর্ণনাগুলো বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় অবিন্যস্তভাবে দেখতে পাই এবং তা উদ্ধার করাও অত্যন্ত সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। বিশ্ব ইতিহাসের এ ধারা যা অনেকাংশে খ্রীস্টীয় ৫ম শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে তার থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বর্ণনা আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক H. G. Wells সাসানী ও বাইজেন্টাইন সরকার-গুলোর শাসনকালের চিত্র অংকন করে লেখেন ঃ

"এসব পতনোন্মুখ যুদ্ধপ্রিয় সরকারগুলোর আমলে বিজ্ঞান ও রাজনীতি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। এথেন্সের পরবর্তী দার্শনিক দল তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া পতনকাল পর্যন্ত প্রাচীন যুগের সাহিত্যসম্ভার অসাধারণ আন্তরিকতা সহকারে সংরক্ষণ করেছিলেন। অবশ্য এটা কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারার আলোকে ছিল না। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানবগোষ্ঠী নেই, যারা প্রাচীন মনীষীদের ন্যায় নির্ভীক ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসবে এবং পূর্ববর্তীদের লেখনীর পদাঙ্ক অনুসরণে সত্যান্বেষণ ও তথ্যানুসন্ধান কিংবা মতামত প্রকাশের বেলায় সাহসিকতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

বলা বাহুল্য, এ দলের অস্তিত্বহীনতার মূল কারণ ছিল, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা। তবে আরেকটি কারণেও তখন মানব মেধার এ নিদারুণ অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। পারস্য ও রোম উভয় দেশেই উদারতার অভাব ছিল প্রকট। উভয় প্রশাসনই ছিল এক নব আঙ্গিকের ধর্মীয় প্রশাসন, যেখানে স্বাধীন মত প্রকাশের ওপর সেন্সর আরোপ করা হয়েছিল।[১]

রোম সাম্রাজ্যের ওপর পারসিকদের আক্রমণ ও রোমকদের বিজয় সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা শেষে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বিরাজমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লেখক বলেন ঃ

"কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যতদ্রষ্টা যদি সপ্তম শতাব্দীর সূচনালগ্নে বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন তাহলে তিনি এ কথাই বলতে বাধ্য হতেন, কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। পশ্চিম ইউরোপে একতা ও শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না। রোমক ও পারসিক সরকারগুলো একে অন্যের ধ্বংস সাধনে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষও ছিল দ্বিধাবিভক্তি ও বিপর্যয়ের শিকার।"[২]

---

1. H. G. WELLS. A SHORT HISTORY OF THE WORLD. (LONDON—1924) PP. 140-41
2. A SHORT HISTORY OF THE WORLD. (LONDON—1924), PP. 140-41

Robert Briffault লেখেন ঃ

"পঞ্চম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ছিল ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত। এ অমানিশা ও অন্ধকার ক্রমান্বয়ে আরো গভীর ও ভয়ানক হতে যাচ্ছিল। সে যুগের বর্বরতা ও পশুত্ব আদিকালের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল। কারণ তা ছিল এক সংস্কৃতির লাশের অনুরূপ, যার মধ্যে পচন ধরেছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্মারকগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল এবং তার ওপর এঁটে দেয়া হয়েছিল পতনের সীলমোহর। ইটালী ও ফ্রান্সসহ যে সব দেশে এ সভ্যতা এনেছিল অপার সমৃদ্ধি এবং তথায় আরোহণ করেছিল উন্নতির শীর্ষ চূড়ায়, আজ সেখানে শুধু নাশকতা ও ক্ষমতা দ্বন্দ্বের অনুশীলন।"[১]

প্রাচীন ধর্মগুলোর তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা সভ্যতার পতন বৃত্তান্ত

J. G. Denison-এর ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য দুনিয়া পতনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল, দীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে যে সভ্যতার চুল ও ডানা গজিয়েছিল তা এখন বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে এবং মানবকুল পুনরায় আদিম বর্বর যুগে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছে, যেখানে প্রতিটি দল ও সকল গোত্র পরস্পর সংঘর্ষে মেতে উঠবে এবং বিদায় নেবে শান্তি ও নিরাপত্তা,...প্রাচীন গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রভাব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল...খৃস্টবাদ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য দ্বারা একতা ও শৃংখলার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছিল। এ যুগ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। যে সভ্যতা এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় সমগ্র দুনিয়াকে আপন ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং যার প্রতিটি ডালে ঝুলেছিল শিল্প ও সাহিত্যের সোনালী দল তা ছিল ধ্বসে যাওয়ার কাছাকাছি এবং তার গ্রহণকাল চলছিল।"[২]

মানব জাতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এ অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ্ আরব উপদ্বীপে এক মহামানব সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর ওপর অর্পণ করলেন মানব প্রজন্মকে উদ্ধারপূর্বক মানবতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে দেওয়ার এক নাজুক ও দুরূহ মিশন। এটা ছিল ঐতিহাসিকদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও কল্পনাবিলাসী কবিদের উচ্চ ধারণারও অতীত। এর সপক্ষে ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষী ও অব্যাহত ধারার বর্ণনা না থাকলে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও কঠিন ছিল। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত সে মহামানব হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। এ মহামানবের প্রথম অবদান হলো, তিনি দীর্ঘকাল যাবত মানব সন্তানের মাথার ওপর জ্বলন্ত ও তার

1. ROBERT BRIEF AULT. THE MAKING OF HUMANITY. (LONDON — 1919) P. 164.
2. DENISON J. H. EMOTION AS THE BASIS OF CIVVILIZATION (LONDON—1928). P. 265.

ওপর আঘাত হানতে উদ্যত নাঙা তরবারি অপসারণ করলেন এবং তাকে দান করলেন এক অপূর্ব উপহার যার কল্যাণে লাভ করল সে এক নব জীবন, অর্জন করল নতুন প্রত্যয় ও নতুন শক্তি, পেল নতুন সম্মান এবং শুরু হলো তার নবযাত্রা। রাসূলুল্লাহ্‌র বরকতে সভ্যতা-সংস্কৃতি-জ্ঞান ও শিল্প, আধ্যাত্মিকতা ও নিষ্ঠা এবং মানবতা বিনির্মাণের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হলো। মানব সমাজ তার নিকট থেকে পেল এক অমূল্য সম্পদ যার ওপর নির্ভর করে মানবতার সমৃদ্ধি, কল্যাণ, সংস্কৃতির গঠন ও উন্নয়ন। রাসূল (সা.)-প্রদত্ত সে অমূল্য পুঁজি ও মূলধন হলো ঃ

কল্যাণের প্রতি অনুরাগ ও অকল্যাণ বর্জনের প্রেরণা, শির্‌ক শক্তি তথা শির্‌ক কেন্দ্রের মূলোৎপাটন এবং সৎ কর্মের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্যাগ স্বীকারের বরকতপূর্ণ সংকল্প। বলা বাহুল্য, মানুষের সকল উন্নতি, অগ্রগতি, অবিস্মরণীয় অবদানগুলোর মূলে রয়েছে একমাত্র এই পবিত্র প্রেরণা ও বরকতপূর্ণ সংকল্প। কারণ সকল উপায়-উপকরণ, আসবাবপত্র এবং পরীক্ষাগার ও গবেষণা সংস্থাসমূহ মানুষের ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল কঠোরতা ও বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে হৃদ্যতা ও মমতা এবং ভদ্রতা ও মানবতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। সকলের মাঝে আপন শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি অখণ্ড পরিশ্রম করে গেছেন। বিশ্রাম ও সুখ তাঁর জীবনে ছিল না। সম্মান ও মর্যাদার ভাবনা তাঁকে কখনো পায়নি, এমন কি নিজের প্রাণের ভয়ও তাঁর ছিল না। তাঁর এই একটানা প্রাণপাত পরিশ্রম ও কষ্টক্লেশের বিনিময়ে মানবতাহীন পশুমন মানবকুলের মধ্যে জন্ম নিল অসংখ্য পুণ্যাত্মা মানব, যাদের নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় সুবাসিত হলো নিখিল ভুবন, যাদের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যের পরশে মানবতার ইতিহাস লাভ করল এক নতুন আকর্ষণ। সম্মান ও মর্যাদা লাভের বেলায় তাঁরা ফিরিশতাকুলকেও অতিক্রম করে গেলেন। পতনোন্মুখ ও ধ্বংসপ্রায় মানবতার মাঝে এল নব জীবনের উষ্ণতা। ন্যায়বিচার ও ইনসাফের জয়জয়াকার শুরু হলো। দুর্বল ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে শক্তিধরদের কাছ থেকে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত হলো। নেকড়ের দল হলো বকরী পালের রক্ষক। আকাশ-বাতাস জুড়ে নেমে এল দয়া-করুণার বসন্ত। প্রেম ও ভালবাসার সৌরভে মোহিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সরগরম হয়ে উঠল শান্তি-সুখের বাজার। পৃথিবীর বুকেই চালু হলো জান্নাতের বিপণীকেন্দ্র। ঈমান ও প্রত্যয়ের সুরভিত বাতাসে আন্দোলিত হয়ে উঠল সারা দুনিয়া। প্রবৃত্তি ও লালসার শৃংখলমুক্ত হলো মানবাত্মা। সদাচারের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ চুম্বকের দিকে ইস্পাতের আকর্ষণের অনুরূপ হয়ে উঠল।

মহানবী (সা.) কতিপয় মৌলিক ও মূল্যবান উপহারের কথা আমরা সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত আকারে উপস্থাপন করতে চাই। এগুলো মানব জাতির দিক নির্দেশনা, কল্যাণ, সফলতা অর্জন ও গঠন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদান রেখেছে এবং গোড়াপত্তন করেছে এক প্রাণময় দীপ্তিমান পৃথিবীর যার সাথে পূর্বের নির্জীব ও ক্ষীয়মাণ পৃথিবীর কোন তুলনাই চলে না।

মানব জাতিকে প্রদত্ত মহানবী (সা.)-এর অমূল্য উপহারসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট এক তাওহীদী বিশ্বাস।

২. মানব ঐক্য ও সাম্যের ধ্যান-ধারণা।

৩. মানবতার সম্মান ও মানব জাতির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা।

৪. নারীর সামাজিক মর্যাদা বিধান ও তার অধিকার সংরক্ষণ।

৫. নৈরাশ্য ও কুলক্ষণ ধারণার প্রত্যাখ্যান এবং মানব মানসে আস্থা, সাহস ও গৌরববোধ জাগরণ।

৬. ইহপরকালের সমন্বয় সাধন ও যুদ্ধরত প্রতিদ্বন্দ্বী মানব শ্রেণীসমূহের মাঝে একতা স্থাপন।

৭. ধর্ম ও জ্ঞানের মাঝে এক সুসংহত পবিত্র ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন, একটির সাথে অপরটির ভাগ্য সংযোজন, জ্ঞানের সম্মান ও মর্যাদা বিধান এবং তাকে লাভজনক ও আল্লাহপ্রাপ্তির অনন্য মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার নন্দিত প্রয়াস।

৮. ধর্মীয় বিষয়াবলীতেও জ্ঞানের ব্যবহার ও এর দ্বারা উপকারিতা লাভের অনুরাগ সৃষ্টি এবং নিজস্ব সত্তা ও বিশ্বভুবন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার উৎসাহ দান।

৯. পৃথিবীর পরিচালনা ও পথ প্রদর্শন, ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিকতা ও প্রবণতার পর্যবেক্ষণ, জগতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সত্যের সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে ইসলামী উম্মাহর প্রশিক্ষণ।

১০. বিশ্বাস ও সভ্যতাভিত্তিক বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

এখানে আমরা নিজস্ব বক্তব্য ও ব্যাখ্যা প্রদানের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, গবেষক, লেখক ও সাহিত্যিকের মন্তব্য ও মতামত পেশ করতে চাই। মনে রাখা উচিত, এ সভ্য দুনিয়ার সম্মান ও ইতিহাস, নীতিকথা, সাহিত্য ও কাব্য ভুবনের মূলবোধ অক্ষুণ্ন থাকার পেছনে কতিপয় বস্তুর অবদান রয়েছে। আর তা হলো ঃ

অনস্বীকার্য বাস্তবতা ও সত্য ঘটনাবলীর প্রকাশ ও বর্ণনা দান, মেধা ও প্রতিভার যথাযোগ্য সম্মান দান এবং অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের এ পৃথিবী, আমাদের সভ্যতা, আমাদের নৈতিক ব্যবস্থাপনা, আমাদের সাহিত্য-ভাবনা বাক স্বাধীনতার জগতে যেদিন উক্ত সৌজন্যসূচক উপাদানের অভাব ঘটবে সেদিন এ পৃথিবীর বাসিন্দা হওয়ার গৌরব ও আনন্দবোধ চিরতরে বিদায় নেবে। অপরদিকে ধরাতল কেবল চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য হিংস্র প্রাণীর নিবাসে পরিণত হবে, যেখানে শুধু উদর পূর্তি, হীন ভোগবিলাস এবং প্রবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ ছাড়া আর কোন কিছুরই আবেদন থাকবে না। বিলুপ্ত হয়ে যাবে ছাত্র-শিক্ষকের অপার্থিব টান, দাতা ও গ্রহীতার সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক, চিকিৎসক ও রোগীর সকৃতজ্ঞ সম্বন্ধ এবং মাতাপিতা ও সন্তানের রক্তের বাঁধন, এমন কি রক্ষক ও ভক্ষকের মধ্যকার পার্থক্যের অনুভূতিটুকুও আর থাকবে না।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও অনুগ্রহ স্বীকার মানুষের এক সহজাত অনুভূতি। এ সম্পর্কে 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এ্যথিক্স'-এর নিবন্ধকার William H. Davidson-পরিবেশিত একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হচ্ছে, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কৃতজ্ঞতা মানুষের একটি বিশ্বজয়ী গুণ এবং প্রতিটি যুগেই তা অক্ষুণ্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

নিবন্ধকার লেখেন ঃ

Thomas Brown-এর মতে কৃতজ্ঞতা হচ্ছে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের এক আনন্দদায়ক অনুভূতির নাম। আর অন্যের দ্বারা উপকৃত হলেই কেবল এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এ অনুভূতি আসলে সে উপকারেরই অংশবিশেষ, যার সুফল আমরা লাভ করে থাকি।

কৃতজ্ঞতা কোন দয়া ও অনুকম্পার প্রতিক্রিয়া এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও সন্তুষ্টচিত্ততায় এর প্রকাশ ঘটে। এ প্রতিক্রিয়া হয় তাৎক্ষণিক এবং স্বতঃপ্রণোদিত। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, মানুষে মানুষে ভালবাসা ও মিলন এটা তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং এর সকল লক্ষণ হলো মানব প্রকৃতিবিরুদ্ধ এক ধ্বংসাত্মক চরিত্র।"[১]

নৈতিকতার অবক্ষয়, মন-মানসিকতার অধঃপতন, বিবেকের পক্ষাঘাত ও মৃত্যুবরণ এবং মানবিক সৌজন্যে সর্বশেষ লক্ষণ থেকেও বঞ্চিত হওয়ার সবচে' বড় প্রমাণ হচ্ছে, ধর্মীয় দিকপাল, মানবতা সংস্কারক ও ভূমণ্ডল যাদের অবদানে

5. ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS. EDINBURG —1913. VOL. 6. P. 391.

ধন্য তাঁদের উপকার ভুলে যাওয়া; পরন্তু তাঁদের ওপর এমন জঘন্য ভাষায় ও কুৎসিত উপায়ে আক্রমণ করা যা কোন নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর মানুষের ব্যাপারেও শোভনীয় নয়। বলা বাহুল্য, এ দ্বারা কেবল তাদের কোটি কোটি অনুসারী ও নিবেদিতপ্রাণ ভক্তকুলের হৃদয় ও মন রক্তাক্ত করে দেয়াই হয় না, বরং সত্য ও বাস্তবতার প্রাণ হরণ করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে ধুলো দেয়ার প্রয়াসও চলতে থাকে। এ ধরনের ঘৃণ্য মানসিকতা লালনকারী বিবেক বিক্রেতা ও অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে কোন ভদ্র সমাজ কিংবা সভ্য দেশ মেনে নিতে পারে না।

তবে এর বিপরীত চরিত্রেরও অভাব নেই। যে পাশ্চাত্য ভূমিতে বসে আজ আমরা মত বিনিময় করছি সে পাশ্চাত্য দুনিয়ার কতিপয় উন্নত ও আদর্শ দেশের গর্বিত নাগরিক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যানুরাগী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লেখকমণ্ডলী ও সাহিত্যসেবীদের চিন্তাপ্রসূত মতামত পেশ করছি।

খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিক Lamartine নবুয়াতে মুহাম্মদীর জয়ধ্বনি করে লেখেন ঃ

সজ্ঞানে হোক কিংবা অজ্ঞানে, কোন মানুষই মুহাম্মদ (সা.)-এর ন্যায় এমন উচ্চতর পরিকল্পনা ও মিশন নির্বাচন করতে সক্ষম হননি। কারণ এটা ছিল মানুষের সাধ্যাতীত, অনুমাননির্ভর কল্পনা ও অমূলক অভিলাষ যা মানুষ ও তাঁর মহান সৃষ্টিকর্তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে অপসারণ করে মানুষকে আল্লাহর তরে সমর্পণ এবং আল্লাহর দরবারে মানুষের আনয়ন ও তদানীন্তন যুগের প্রতিমা অর্চনার প্রতীক অসংখ্য জড় খোদার স্থলে এক আল্লাহর পবিত্র ধ্যান- ধারণার উপস্থাপন, এ ছিল সেই মহান মিশন ... নিতান্ত স্বল্প উপায় উপকরণ নিয়ে মানব ক্ষমতাতীত এ বিশাল কর্মের উদ্যোগ গ্রহণ আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।...

যুগ ছিল প্রতিমা পূজার। যে মুহূর্তে পৃথিবীতে বিপুল উপখোদার উপাসনায় সয়লাব সে মুহূর্তে একত্ববাদের ঘোষণা দেয়াই এক শক্তিমান অলৌকিক ব্যাপার বৈ কি! মুহাম্মদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো তাওহীদী বিশ্বাসের ঘোষণা আর প্রাচীন প্রতিমা মন্দিরগুলোতে দেখা দিল ধুলোবালির পদচারণা এবং এক–তৃতীয়াংশ দুনিয়া জুড়ে দৃশ্যমান হলো ঈমানী উচ্ছ্বাস।"[১]

John William Draper ইউরোপের মানসিক ও জ্ঞানগত ইতিহাসের আনুষঙ্গিক আলোচনায় বলেন ঃ

1. LAMARTINE HISTOIRE DE LA TURQUIE, PARIS—1854, VOL. 2. PP. 276-277.

"৫৬৯ খৃষ্টাব্দে Justinian -এর মৃত্যু ঘটে। এর চার বছর পর আরবের মক্কা নগরীতে সে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল, যিনি মানব জাতির ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[১]

তিনি আরো লেখেন ঃ

"মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে সেসব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, যেগুলো একাধিকবার দুনিয়ার রাজত্বসমূহের ভাগ্য নির্ধারণী ভূমিকা পালন করেছে। অসার অপ্রাকৃতিক দর্শনের আলোচনায় মনোনিবেশ করার পরিবর্তে তিনি চিরন্তন সত্যসমূহের প্রতি তাকীদ করে গেছেন। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্কলুষতা এবং নামায ও রোযার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।"[২]

এ শতাব্দীর সেরা চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক টয়েনবি (Toynbee) বলেন ঃ

"মুসলমানদের মাঝে জাতিগত বৈষম্যের বিলোপ সাধন ইসলামের এক মহান অবদান। বর্তমান পৃথিবীর যা অবস্থা তাতে ইসলামের এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী।"[৩]

আশ্চর্যই বলতে হবে, দু'শ' বছর পূর্বে টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyl)-সকল নবীর মধ্য থেকে মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজের জন্যে আদর্শরূপে নির্বাচন করেছিলেন, আর এখন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে মাইকেল এইচ হার্ট Michael H. Hart) পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সভ্যতার ওপর সর্বাধিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনকারী অনন্য ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বশীর্ষে স্থান দিয়েছেন।[৪]

মানব জাতির ওপর মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী ও তাঁর দীক্ষাপ্রাপ্ত উম্মতের অনুগ্রহ বিশাল এবং মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদের কীর্তি ও অবদান অনস্বীকার্য। বিষয়টিকে আমরা দু'টি অকাট্য ঐতিহাসিক ঘটনার অবয়বে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

ইতিহাসের গবেষক ছাত্র যারা তারা অবশ্যই অবগত আছেন, হিজরী সপ্তম শতাব্দী তথা খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুনিয়ার সুশিক্ষিত দেশসমূহ, সভ্যতা-ভদ্রতা, জ্ঞান ও সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও মানবতা, সুপ্রশস্ত ও সুগভীর

1. JOHN WILLIAM DRAPER, A HISTORY OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF EUROPE, LONDON—1875. VOL. 1. P. 229
2. IBID. P—330
3. TOYNBEE, A. J. CIVILIZATION TARIAL, NEW YORK—1948, P-205
4. HART. MICHAEL H. THE 100—A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSON IN HISTORY, NEW YORK. 1978. P. 26

প্রভাবধারী ইসলাম ও খ্রীস্ট ধর্মদ্বয়, তার অনুসারী, তার প্রতিষ্ঠিত সুদূর বিস্তৃত উন্নত ও উর্বর সাম্রাজ্যগুলো, সর্বোপরি মানব অস্তিত্বের ভবিষ্যত এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছিল। মনে হয়েছিল, অতীতের সকল কর্ম ও প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে, বর্তমানের দীপ্তি, লাবণ্য, জ্ঞান ও উৎকর্ষের ওপর ধ্বংসচিহ্ন এঁকে দেয়া হবে এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাগুলো হয়ে পড়বে সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ। বর্বর তাতারী তথা মোঙ্গলীয় জাতির অসাধারণ ক্ষমতাবান ও Genius সেনানায়ক চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে পশ্চিম ও দক্ষিণে অবস্থিত সুশিক্ষিত সাম্রাজ্যগুলোর ওপর আচমকা আক্রমণের কারণেই উপরিউক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। ৬১৬ হিজরী মোতাবেক ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে এ তাতারী আগ্রাসন শুরু হয়। এ আগ্রাসনের উন্মত্ততা ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের প্রচণ্ডতা, পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, জ্ঞান-বুদ্ধি, নির্মাণ ও শৈল্পিক উত্তরাধিকার ধ্বংসের অভাবিত ক্ষমতা, তার সমূহ নিদর্শন ও সম্ভাবনা প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে কতিপয় উদ্ধৃতি যথেষ্ট। এগুলো চেঙ্গিস খান বিষয়ক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক Harold Lamb লিখিত Cenghis Khan থেকে গৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

"চেঙ্গিস খানের যাত্রাপথে যে নগরীই আসত, তা কাগজে মুদ্রিত ভুল অক্ষরের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়া হতো। নদ-নদীর গতি পরিবর্তন হয়ে যেত। মরুপ্রান্তর জুড়ে বয়ে যেত হতবুদ্ধি ও মরণোন্মুখ শরণার্থীদের সয়লাব। তার প্রস্থানের পর এককালের জনবহুল এলাকাগুলোতে নেকড়ে আর শকুন ছাড়া অন্য কোন প্রাণী অবশিষ্ট থাকত না।"[১]

"চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের মোকাবিলায় খ্রীস্টীয় জগত যখন হতবুদ্ধি ও দিশেহারা, তখন পশ্চিম ইউরোপ রক্তপিপাসু তাতারীর পদতলে পিষ্ট হচ্ছিল। পোল্যান্ডের রাজা ব্লস্লাস ও হাঙ্গেরীর অধিনায়ক বেলা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন। অপর দিকে সাইলোবিয়ার ডিউক হেনরী নিজের টাইটানিক ঘোড় সওয়ারদের নিয়ে যুদ্ধরত অবস্থায় Liegnitz এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন।"[২]

"এ যুদ্ধ সকল সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল, এমন কি তা (পরবর্তীকালে সংঘটিত) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল উস্কানিবিহীন এক নির্বিবাদ মানব হত্যাযজ্ঞ এবং এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু মানুষ সংহার করা।"[৩]

1. HAROLD LAMB, GENGHIS KHAN, (LONDON—1928), P. 11-12
2. KENGHIS KHAN, OP. CIT. P. 12
3. GENGHIS KHAN, OP. CIT. P. 13

"তাতারীদের প্রতিরোধ করার সাধ্য মানুষের ছিল না। কারণ তারা অরণ্য ও মরুভূমির সকল আশংকা ও ভয় জয় করে চলছিল। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কোন কিছুই তাদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। কোন ধরনের বিপদাশংকা তাদের অন্তরে ছিল না। তাদের আক্রমণ ঠেকানোর শক্তি কোন দুর্গের ছিল না। আর কোন মযলুমের আহাজারিতে তাদের হৃদয়ে কোন দয়া ও করুণার উদ্রেকও হতো না।"[১]

"তাতারীদের বিজয় কাহিনীর অধিকাংশ তাদের শত্রুপক্ষীয় ঐতিহাসিকদের কলমে বিবৃত হয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর তাদের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা এত ভয়াল ও প্রকট ছিল যে, অর্ধ পৃথিবীর সব কিছু আবার নতুনভাবে আরম্ভ করতে হয়েছে। প্রেস্টার জনের সাম্রাজ্য আউরোখতা, করাখতাই, খাওয়ারিযম ও তার মৃত্যুর পর বাগদাদ, রুশ ও পোল্যান্ড সাম্রাজ্যগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই অপরাজেয় দানব যখন কোন জাতির ওপর বিজয় লাভ করত, তখন এমনিভাবেই অন্যান্য ঝগড়া-বিবাদের ইতি ঘটত। ভাল হোক কিংবা মন্দ, পূর্বেকার সকল অবস্থার গতিধারা পরিবর্তন হয়ে যেত সম্পূর্ণভাবে। তাতারীদের জয়ের পর যেসব মানুষ বেঁচে থাকত তাদের মাঝে কিছুকাল নিরাপত্তা বিরাজ করত।"[২]

কেম্ব্রীজ প্রকাশিত 'মধ্যযুগের ইতিহাস' রচয়িতাগণ তাতারীদের প্রবল ও ভয়াল আক্রমণের ইতিবৃত্ত এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"পৃথিবীর ইতিহাসে এ নতুন শক্তির উত্থান ঘটল। গোটা মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা পাল্টে দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একটিমাত্র ব্যক্তিনির্ভর এই নতুন শক্তির যাত্রা চেঙ্গিস খানের মাধ্যমে শুরু হয় এবং তদীয় পৌত্র কুবলাই খানের হাতে তার সমাপ্তি ঘটে। তার সময়ে নিরাপদ ও অবিমিশ্র তাতারী সাম্রাজ্যে খণ্ডতা, মতভেদ ও মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পৃথিবীর ক্যানভাসে পুনরায় এ জাতীয় কোন শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেনি।"[৩]

তাতারী আগ্রাসন ও ত্রাস কেবল মধ্যএশিয়া, ইরান ও ইরাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং ইউরোপের দূর প্রান্তের দেশসমূহের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল, অথচ সেসব ভূখণ্ডে তাতারীদের গমন ছিল কল্পনাতীত। ঐতিহাসিক গীবন (Gibbon) তার সাড়া জাগানো (The decline and fall of the Roman empire নামক গ্রন্থে লেখেন ঃ

14. IBID. P. 206
15. IBID. P. 210
16. GENGHIS KHAN. OP. CIT. P. 210

"সুইডেনবাসীদের কাছে রাশিয়ার মাধ্যমে তাতারী প্রলয়ের সংবাদ পৌঁছলে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে, এমনকি ভয়ের কারণে তারা সে সময় তাদের চিরাচরিত রুটিনমাফিক ইংল্যাণ্ড উপকূলীয় অঞ্চলে মৃগয়া ভ্রমণের জন্যেও বের হয়নি।"[১]

তাতারীরা সর্বপ্রথম বোখারার সর্বনাশ সাধন করে, তাকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। শহরের কোন নাগরিক প্রাণে বাঁচেনি। অতঃপর সমরকন্দ নগরীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। জনবহুল নগরীর কেউ প্রাণে রক্ষা পায়নি। ইসলামী দুনিয়ার খ্যাতনামা নগরীগুলো একই প্রলয়ের শিকার হয়েছে। ইউরোপের আক্রান্ত হওয়ার আশংকার ছিল প্রবল। ইউরোপের নৈতিক স্খলন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃংখলা ও সামাজিক নষ্টামি (যার কিছু বর্ণনা ইতিপূর্বে আমরা পাশ্চাত্যের সত্যানুরাগী ও সত্য প্রকাশে নিবেদিতপ্রাণ লেখকদের বরাত দিয়ে করেছি) সে পরিস্থিতিরই আহ্বান করছিল এবং এরই পরিবেশ সৃষ্টি করছিল, ইসলামী দুনিয়ার সর্বশেষ ঐক্যবদ্ধ শক্তি খাওয়ারেযম শাহী সালতানাতের অস্তিত্ব বিলীন এবং ইসলামী জগতের কেন্দ্রীয় স্থান ও ফুলবন নগরীগুলো ধ্বংসের পর তাতারী খ্রীস্টীয় পাশ্চাত্য অভিমুখে তার যাত্রা শুরু করবে এবং তার মর্মান্তিক অবস্থাও ইসলামী প্রাচ্য থেকে ভিন্নতর হবে না।

ইতিপূর্বে উদ্ধৃত H. G. Wells-এর মতামত ছিল নিম্নরূপ ঃ

"কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যতদ্রষ্টা যদি সপ্তম শতাব্দীর সূচনালগ্নে বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন তাহলে তিনি এ কথাই বলতে বাধ্য হতেন, কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।"[২]

Harold Lamb বলেন ঃ

"চেঙ্গিস খানের দুনিয়াজোড়া প্রলয়কাণ্ড ও লুণ্ঠনের কারণে সভ্যতা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এমন কি অর্ধ পৃথিবীর সভ্যতা ও শিষ্টাচারকে মৃত্যুবরণ করে পুনর্জন্ম লাভ করতে হয়েছিল। খাওয়ারেযম সালতানাত, বাগদাদ খিলাফত, রুশ সাম্রাজ্য ও কিছুদিনের জন্যে পোল্যান্ড (পোলার) রাজত্বের অবসান ঘটেছিল।"[৩]

---

1. EDWARD GIBBON. THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE. VOL. 111. NEW YORK. N. D. P. 634.
2. A SHORT HISTORY OF THE WORLD. OP. CIT. P. 144.
3. KENGHIS KHAN, OP. CIT. P. 206

তিনি আরো বলেন ঃ

"যখন তাতারীরা ধাওয়া করল, তখন জার্মানী ও পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। তাতারীরা তাদেরকে প্রায় নিঃশেষিত করে দিয়েছিল।"[১]

কিন্তু অকস্মাৎ অলৌকিকভাবে এক অভাবিত ঘটনা ঘটল যা দ্বারা ইতিহাসের গতিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। শুধু সভ্য দুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তাই নয়, বরং সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শক্তি ও সংহতি, উন্নতি ও অগ্রগতি এবং চিন্তা ও জ্ঞান চর্চার এক নতুন যাত্রা সূচিত হওয়ার সুযোগ এল। ঘটনাটি ছিল এমন, এই অপরাজেয় বিজয়ী জাতি তাদেরই হাতে বিজিত অসহায় ও অবদমিত মুসলমানদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল, যাদের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক সকল শক্তি তখন তিরোহিত ও যার অনুসারী তাতারীদের দৃষ্টিতে ছিল চরমভাবে অপমানিত ও ধিকৃত।

অধ্যাপক T. W. Arnold তার খ্যাতনামা 'ইসলামের দাওয়াত' (Preaching of Islam) গ্রন্থে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ

"কিন্তু ইসলাম স্বীয় অতীত জৌলুসের ভস্ম থেকে পুনর্বার উঠে দাঁড়াল। ইসলামের প্রচারক দল সে বর্বর তাতারীদেরকেই মুসলমান বানিয়ে ফেললেন যারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের সকল প্রকার অনুশীলন চালিয়েছিল।"[২]

যেসব নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্বের অবদানে রক্তপিপাসু তাতারী জাতি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অনেকের নামই আমাদের অজানা। কিন্তু তাদের এ অবদান জগত ইতিহাসের যে কোন গঠন, সংস্কারমূলক ও বৈপ্লবিক অবদানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শুধু মুসলিম কিংবা খ্রীস্টীয় পাশ্চাত্য নয়, বরং গোটা মানব জাতি ও পৃথিবীকে তাদের অনুগ্রহ স্বীকার করে যেতে হবে। কেননা তারা পৃথিবীকে বর্বরতা, পাশবিকতা, অবিশ্বাস ও হতাশার ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা, জ্ঞানপ্রীতি, জ্ঞান লালন, রতন চেনা, যোগ্যতা ও প্রতিভা মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং প্রয়াস ও পরিশ্রমের মর্যাদা দানকারীদের তত্ত্বাবধানে এক শান্ত পরিবেশে, জ্ঞান ও চিন্তা, রচনা ও সংকলন, অধ্যাপনা ও শিক্ষা দান এবং শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নতুন যাত্রা শুরু হয়।

---

1. IBID. P. 231
2. T. W. ARNOLD. THE PREACHING OF ISLAM. (LONDON—1935) P. 227

চেঙ্গিস খানের পলোকগমনের পর তার সাম্রাজ্য তার চার তনয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়ে গিয়েছিল। চারটি শাখাতেই ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। আর তাতারী সম্রাট, তার দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাবে তাতারীরা জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল, এমন কি এক শতাব্দীর মধ্যেই প্রায় সকল তাতারী মুসলমান হয়ে যায়। (দেখুন লেখক প্রণীত 'দাওয়াত ও আযীমাত' তথা সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস', ১ম খণ্ড)

ইসলাম প্রচারের এ মহান দায়িত্ব পালনকারী সেসব পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিবেদিত সরকারগুলো, যাদের উন্নত চরিত্রমালা, চিত্তাকর্ষণ, ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড এবং নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতার দৌলতে এ রক্তপিপাসু ও যুদ্ধংদেহী তাতারী জাতি ইসলামের পথে আকৃষ্ট হয়, তাদের ঘটনাবলী আজো হৃদয়ে এনে দেয় ব্যাকুলতা এবং আত্মাকে করে তোলে আবেগউদ্দীপ্ত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখক রচিত 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' ও প্রফেসর আর্নল্ড প্রণীত (Preaching of Islam)।

তাতারীগোষ্ঠী কেবল জাতিগতভাবে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েই ক্ষান্ত থেকেছে, এমন নয়, বরং তাদের মধ্যে অনেক মহান মুজাহিদ, বড় বড় আলিম, ফকীহ ও উচ্চ মর্যাদার আধ্যাত্মিক সাধক দরবেশও জন্ম নিয়েছেন। তাতারী বংশোদ্ভূত লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও কবির সংখ্যাও কম নয়।

ইসলাম গ্রহণের ফলে তাতারী জাতির স্বভাব-চরিত্র, রুচি, অনুরাগ, মানবতা ও সভ্যতার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে। অতএব, তাদের ইসলাম আনয়ন শুধু ইসলামী প্রাচ্যের জন্যেই রহমত ছিল তাই নয়, বরং খ্রীস্টীয় পাশ্চাত্য ও ভারত উপমহাদেশের ওপরও তা ছিল এক বিরাট অনুগ্রহ। এ উপমহাদেশের ওপর হিজরী সাত শতকে (খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) তারা বিশ ত্রিশবার আগ্রাসন চালিয়েছিল। কিন্তু তুর্কী বংশোদ্ভূত সুলতানগণ প্রতিবারই তাদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। এদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী (মৃত্যু ঃ ৭১৬ হি. ১৩২৫ খৃঃ) ও তাঁর সেনাধ্যক্ষ গাজী গিয়াসউদ্দীন তোগলক শাহ (মৃত্যু ঃ ৭২৫ হিঃ ১৩২৪ খৃঃ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এভাবে এই প্রাচীন উর্বর ভূখণ্ড, তার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং সেখানকার দুই বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম (তার সকল শাখাসহ) তাতারী ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপদ থাকে।

মানব পৃথিবী, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ওপর (যার নিকট ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ওপর যার নিকট ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, পরস্পরকে জানার সমূহ আয়োজন

সহজ করার নিমিত্ত বিভিন্ন উপায় ও যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক এবং পৃথিবীর সাহায্যদাতা ও ত্রাণকর্তা দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার কথা ছিল) মুসলিম উম্মাহর এ অমর অবদান (তাতারী জাতির অধ্যাত্ম্য-মানসিক পরিবর্তন) ছিল এক নিরাপত্তা ও শৃংখলাসূচক পদক্ষেপ ও বিশাল অনুগ্রহ।

এর পাশাপাশি মুসলমানদের অপর আরেকটি অবদান রয়েছে, আর তা হচ্ছে ইউরোপকে জ্ঞান-গবেষণার নতুন উৎসসমূহের সাথে পরিচিত করার সাথে সাথে সেগুলো থেকে সুফল লাভ করার আয়োজন করা। এর দ্বারা ইউরোপ তার আঁধার যুগে (Dark age) নতুন আলোর সন্ধান পায় এবং তার পুনরুজ্জীবনের (Renaissance) নতুন পথ সুগম হয়, যার দ্বারা শুধু ইউরোপের চেহারাই বদলে গেছে তা নয়, বরং সমগ্র জগত নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনাও সে যুগে হয়, যা এ পৃথিবীর আকার-আকৃতিই পাল্টে দেয়।

আন্দালুসিয়ার (Muslim Spain) পথ দিয়েই ইউরোপে স্থানান্তরিত হয় প্রাচীন জ্ঞানসম্ভার তথা বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি। তবে পাশ্চাত্যের প্রতি আন্দালুসিয়ার সেরা উপঢৌকন ছিল মূল তথ্যের অনুরাগ ও অনুসন্ধানী যুক্তি-বিজ্ঞান তথা (Inductive Logic) যা পরবর্তীতে অনুমাননির্ভর যুক্তি-বিজ্ঞানের (Deductive Logic) স্থলাভিষিক্ত হয়। এ অনুসন্ধানী যুক্তি-বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় আনে আমূল পরিবর্তন। এর ফলশ্রুতিতে কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা নয়, বরং বলতে হবে তার অস্তিত্বের সূচনা ঘটেছে, পশ্চিমা জগতের সকল প্রয়োজনীয় গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহ, পৃথিবী জয়ের আংশিক সীমিত সফলতা ও জীবন পরিক্রমার সমস্যাসমূহের এক প্রকার সমাধান সব কিছুর পেছনে রয়েছে এ অনুসন্ধানী যুক্তি-বিজ্ঞান, যার ব্যাপারে ইউরোপ ছিল অনবধান এবং সর্বপ্রথম স্পেনের মুসলমানদের কল্যাণে তারা এ বিজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। মুক্ত চিন্তার অধিকারী নির্ভীক গবেষকদের গবেষণাও এ মহান সত্যের সাক্ষ্য দেয়। ফ্রান্সের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদ (Gustave Lebon) বলেন ঃ

"সকলের ধারণা মতে পরীক্ষা ও অনুদর্শন (অনুসন্ধানী যুক্তি-বিজ্ঞান) আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিমূল। মানুষ মনে করে, এটা Francis Bacon-এর অবদান, কিন্তু এখন একথা স্বীকার করার সময় এসেছে, এ পদ্ধতি ও ব্যবস্থার পুরোটাই আরবদের দান।"[১]

১. (তামাদ্দুনে আরব, মূল ঃ Gustave Lebon, ফ্রান্স, উর্দু তরজমা ঃ শামসুল উলামা মৌলভী সাইয়েদ আলী বলগ্রামী, পৃষ্ঠা ৪০০, প্রকাশনায়-উর্দু একাডেমী লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৫)

Robert Briffault তাঁর রচিত মানবতা নির্মাণ (The Making of Humanity) গ্রন্থে বলেন ঃ

"ইউরোপের উন্নতি ও প্রগতির কোন অংশ এমন নেই যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত কিংবা এর সুস্পষ্ট স্মারকগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না, যেগুলো ইউরোপের জীবনধারার ওপর প্রভূত অবদান রেখেছে।"[১]

তাঁর আরেকটি উক্তি নিম্নরূপ ঃ

"ইউরোপে জীবন প্রবাহ সৃষ্টির কৃর্তত্ব শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞানের নয় (এ বিজ্ঞানেও স্পেনিশ আরবদের অবদান সর্বজনবিদিত), বরং ইউরোপীয় জীবনধারার সর্বত্র পড়েছে ইসলামী সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র প্রভাব। আর এর শুভ সূচনা হয় তখন থেকে, যখন ইউরোপের ওপর ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির জ্যোতি বিকশিত হতে শুরু করে।"[২]

ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস ও খ্রীস্টীয় চার্চের ইতিহাস যারা অধ্যয়ন করেছেন, তাদের পক্ষে যাজকতন্ত্রের সংস্কারক দল ও তার প্রতিষ্ঠাতাদের ওপর ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রভাব কিছুটা অনুমান করা সম্ভব।

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকে অনুষ্ঠিত লুথারের Luther-এ সংস্কার আন্দোলনেও ইসলামী শিক্ষার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায়, যেমন করে কোন কাচের মধ্যে দূরবর্তী আলোর ফোকাস দেখা যায়, এভাবে মধ্যযুগের প্রাচীনত্ব পূজা ও চার্চের দলননীতির প্রতিবাদে সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলনেও এ আলোর প্লাবন দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য দেখুন, এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, মার্টিন লুথার বিষয়ক প্রবন্ধ।

তাতারী প্রলয় রোধ ও ইউরোপকে জ্ঞানের আলো দান

এ দু'টি বৈপ্লবিক অবদানের নৈতিক ও মানবিক দাবী হচ্ছে তার প্রকৃত উৎসমূলের মাহাত্ম্য ও অনুগ্রহ স্বীকার করা। আর যে কোন উপলক্ষ ও শিরোনামে এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করা হলে কিংবা তার বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা নেয়া হলে তখন অবশ্যই আমাদেরকে যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে, যা হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, সভ্যতা ও দর্শনসমূহের মধ্যে মর্যাদার আসন নিয়ে টিকে আছে। এ মূল্যবোধ অনুশীলনের বেলায় নির্ভরযোগ্যতা, দৃঢ়তা, মিতাচার, ভারসাম্য, ন্যায় ও সত্যবাদিতা অটুট রাখা কর্তব্য।

1. ROBERT RIEFAULT. THE MAKING OF HUMANITY. (LONDON — 1919) P. 190
2. IBID. P. 202

মনে রাখা দরকার, সকল ধর্মীয় গ্রন্থ, নৈতিক শাস্ত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন ইতিহাসবিদ ও সমালোচকবৃন্দের কর্মকাণ্ড ও ভূমিকা থেকে আমরা উপরিউক্ত নীতির শিক্ষা লাভ করেছি। শুধু ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীই নয়, বরং বিদ্যা, জ্ঞান বিনিময় ও পরস্পর উপকার প্রাপ্তির ব্যাপারটিও এ নীতির ওপর টিকে আছে, যেদিন এ নীতির বিলুপ্তি ঘটবে সেদিন যাবতীয় বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক তৎপরতা, পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সমৃদ্ধ প্রয়াস তার পবিত্র ও গঠনমূলক রূপ হারিয়ে অশ্লীল সাহিত্য রচনা, কৌতুক উপস্থাপন ও অপবাদ চর্চায় পরিণত হবে এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত নেতিবাচক, বিশৃংখলাজনক ও ঘৃণার উদ্রেককারী। বলা বাহুল্য, জ্ঞান ও সাহিত্য ভুবন এসব থেকে সহস্রবার পানাহ্ চায় এবং এর দ্বারা বিভিন্ন জাতি ও দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও ব্যাহত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত এক অপরিপক্ব ধারণা হচ্ছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করার অর্থ হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ ও দলননীতি (Coercion) প্রয়োগ সর্বোপরি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইনের কার্যকারিতা খর্ব করে দেয়ার প্রয়াস। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয় যে, বাক-স্বাধীনতা নৈতিকতার সকল সীমারেখা গুঁড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়; যে স্বাধীনতা সভ্যতার মহান সংগঠক ও ধর্মীয় দিকপালদের ব্যাপারে এমন জঘন্য ও হীন (Obscenc) ভাষায় মন্তব্য করার প্ররোচনা দেয় যা শুধু কৌতুক, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপ-উপন্যাস রচনার বেলায় বৈধ হতে পারে, যে স্বাধীনতা দ্বারা ইতিহাসের অমোঘ বাস্তবতা ও স্বীকৃত সত্যের টুঁটি চেপে ধরা হয় এবং পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় দিকপাল ও নবীদের কোটি কোটি অনুসারীদের হৃদয়ে আঘাত হানা হয় আর দেশ ও সমাজের বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়,, তা এক গুরুতর অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সহাবস্থানের (Co-existence) নীতিতে বিশ্বাসী কোন সভ্য ও শান্তিপ্রিয় দেশে এ জাতীয় অপরাধবৃত্তির অনুমোদন দেয়া যায় না। স্বয়ং পাশ্চাত্যের একাধিক চিন্তাবিদ ও উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী মহলও অবাধ ও লাগামহীন বাকস্বাধীনতার বিরোধী। তাদের মতে লাগামহীন বাকস্বাধীনতার কারণে যে অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা বাকস্বাধীনতা হরণের চেয়ে বহু গুণ মারাত্মক ও ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে তাদের উক্তি ও মতামত উপস্থাপনের

জন্যে এক প্রবন্ধ নয়, বরং এক স্বতন্ত্র পুস্তিকার প্রয়োজন। এখানে শুধু দু'টি উদ্ধৃতি পত্রস্থ করা হচ্ছে–

"সেন্সরশীপ অথবা ব্যক্তিগত নৈতিকতা সম্পর্কিত আইনকে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বিবেচনা করে প্রতিবাদী হওয়ার অর্থ হলো, সর্বপ্রথম আমরা এ ধ্যান-ধারণাই বদ্ধমূল করে নেই, এ আইন যেসব স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে তা ভাল (অথবা যে কোন) সমাজে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীতে এসব কানুন পরিহার করার অর্থ হলো এসব প্রয়োজনীয়তার অপরিহার্যতা অস্বীকার করা। এটাও হতে পারে, এসব প্রয়োজন মেটাতে হলে সেসব মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে হবে যা ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকেও উন্নত এবং মানুষের সুগভীর প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। এসব উন্নততর মূল্যবোধসমূহ শুধু অন্তস্থ নয়, বরং প্রকাশমান হওয়ার দাবীদার।

কোন ব্যক্তি অথবা কিছু মানুষের স্বাধীনতার পরিধি নির্ধারণের পূর্বে যাচাই করে নিতে হবে, তারা কতটুকু স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশী এবং অন্যান্য মূল্যবোধ, যেমন সাম্য, ন্যায়বিচার, সুখ-শান্তি ও জননিরাপত্তার দাবীই বা কি? এ কারণেই বাক স্বাধীনতা লাগামহীন হতে পারে না।"[১]

সিনেটের ব্লাকস্টোনের (Blackstone) যে বক্তৃতাটি আমেরিকায় বাক - স্বাধীনতা আইনের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচিত হয়, সেখানে তিনি বলেছিলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তির জন্য সাংবিধানিকভাবে এ অধিকার রয়েছে, তিনি জনগণের সম্মুখে নিজের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ করতে পারেন। এর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার অর্থ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ। কিন্তু সংবাদপত্রে যদি এমন কিছু প্রকাশিত হয়, যা অনুচিত, অন্যায়ের প্ররোচনাদাতা কিংবা বেআইনী হিসেবে চিহ্নিত, তাহলে তাকে নিজের প্রগলভতার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। সংবাদপত্রকে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে দেয়ার অর্থ হবে বিবেকের স্বাধীনতাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব প্রবণতার ওপর ছেড়ে দেয়া এবং এ কথা মেনে নেয়া, জ্ঞান, ধর্ম ও সরকারের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তার ফয়সালা চূড়ান্ত এবং তিনি ভুল-ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু যেসব প্রতিবেদন লেখা হয় ক্ষতিকর ও সন্ত্রাসমূলক এবং নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগত বিচার ব্যবস্থাও তাকে ক্ষতিকর মনে করে, তবে এর জন্যে শাস্তি বিধান করা উচিত। নিরাপত্তা ও শান্তি এবং রাষ্ট্র ও ধর্মের স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এ শাস্তি বিধান জরুরী। কারণ এগুলোর ওপর নাগরিক স্বাধীনতার ভিত রচিত। এভাবে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা তো অক্ষুণ্ন থাকবে, কিন্তু তার অপপ্রয়োগের ওপর শাস্তি বিধান করাই দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য।"[২]

1. ISAIH BERLIN IN MODERN POLITICAL THOUGHT.(ed) WILLIAM EBENSTEIN. NEW DELHI. 1974. PP. 87-88
2. H.M. SEERVAI CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA. VOL. 1. P—492

সম্মানিত উপস্থিতি,

আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা উপস্থাপনের মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই। এ কবিতা শুধু যে শ্রুতিমধুরই হবে তা নয়, বরং এর দ্বারা আমাদের হৃদয় ও আত্মায় অনুভূত হবে নতুন স্বাদ। নীরস প্রবন্ধের একটু বৈচিত্র্য আর একটু রুচির পরিবর্তনও হবে। এ কবিতা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ও নবুওয়াতের মাধ্যমে সূচিত অবদান ও সফলতার খণ্ডচিত্র, যার উদাহরণ অন্য কোন ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবা পৃথিবীর খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবন চরিতে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

ইকবাল বলেন ঃ

"সে 'উম্মী' উপাধিপ্রাপ্ত নবীর সজীব শ্বাসের ছোঁয়ায় মরু আরবের তপ্ত বালুকণায় সৃষ্টি হয় গোলাপ ও লাল ফুলের অপরূপ কানন।

তাঁরই পবিত্র ক্রোড়ে লালিত হয় আযাদীর চিন্তা-চেতনা। বলতে গেলে আজকের পৃথিবীর সকল উন্নতি-অগ্রগতির পেছনে রয়েছে তাঁর মহান অতীতের অবদান।

মানব জাতির মৃতবৎ দেহে সৃষ্টি করলেন তিনি প্রাণস্পন্দন, উন্মোচন করলেন তার সুপ্ত প্রতিভার অবগুণ্ঠন আর আবিষ্কার করলেন তার প্রকৃতিগত নৈপুণ্য।

তাঁর হাতে সকল বানোয়াট খোদার পতন ঘটে। তাঁর বদান্যতায় শুকিয়ে-যাওয়া বৃক্ষশাখা সুশোভিত হয় পত্র-পল্লব ও ফল-ফুলের সমারোহে।

যুদ্ধের ডামাডোলের মাঝে উচ্চকিত আযানের সুমধুর তান, মরমী প্রভাব ও সূরা 'আল সাফ্ফাত' তিলাওয়াতের অপার্থিব আনন্দও তাঁরই অবদান।

সালাউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার ও বায়েজীদ বোস্তামীর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে ছিল দোজাহানের রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি।

কাওসার সুরাবাহীর দেয়া এক পাত্র পানে জ্ঞান ও হৃদয় জগত হয়ে যায় আত্মহারা-বিহ্বল। তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একাকার হয়ে যায় রুমীর দিব্য স্মরণ ও রাযীর ধ্যান চিন্তন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞতা, ধর্ম ও শরীয়ত, সাম্রাজ্যের শৃংখলা ও দুনিয়া বিস্তৃত আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা এবং বক্ষ মাঝারে অবস্থিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা।

আল হামরা প্রাসাদ ও তাজমহলের ভুবন মাতানো হৃদয়স্পর্শী সৌন্দর্য, আকাশের ফেরেশতারাও যার প্রতি নিবেদন করে থাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এসব কীর্তি ও অবদান সে মহামানবের অমূল্য সময়ের এক সংক্ষিপ্ত মূহূর্ত এবং তাঁর অসংখ্য মাহাত্ম্যের এক দ্যুতি ও ঝলকমাত্র।

এসব হৃদয়কাড়া সৌন্দর্যের মাধ্যমে বিকাশ ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক রূপের। কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরীণ স্বরূপ এখনো সুগভীর তত্ত্বজ্ঞানী সাধকদের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে।

মুসলমানদের উদ্দেশে সীরাতের পয়গাম

সকলেই জানেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন আবির্ভূত হন তখন দুনিয়াটা এমন কোন বিরান ও অনাবাদী জায়গায় পরিণত হয় নি কিংবা কোন কবরস্থানেও তা পরিণত হয়ে যায়নি। জীবনের চাকা এখন যেভাবে চলছে, অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকলেও তখনও তো সেভাবেই চলছিল। দুনিয়ার তামাম কায়কারবার আজকের মতই চলছিল। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন ছিল, তেমনি কৃষিকর্মও ছিল। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ছিল, ছিল প্রশাসন চালাবার লোক আর তার নিয়মনীতি। তখনকার লোকগুলো তাদের প্রচলিত জীবনধারায় পরম তুষ্ট ও তৃপ্ত ছিল। তাদের সেই জীবনধারায় কোনরূপ কাটছাঁট, সংস্কার-সংশোধন কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করত না।

কিন্তু আল্লাহতা'আলার নিকট তাঁর যমীনের এই চিত্র ও পৃথিবীর এই অবস্থা আদৌ পছন্দনীয় ছিল না। এই যুগ সম্পর্কে হাদীস পাকে বলা হচ্ছে ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াবাসীদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ করলেন। তিনি দুনিয়ার তামাম অধিবাসীকে, চাই কি সে আরব বা অনারব হোক, অপছন্দ করলেন এবং তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিতাবধারীদের কিছু লোক এর ব্যতিক্রম ছিল।"

এমনি এক অবস্থায় আল্লাহতা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে একটি গোটা জাতিগোষ্ঠীর আবির্ভাবের ব্যবস্থা করলেন। আর এ তো সত্য, তাদেরকে এমন কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন যা অন্য কোন জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা সাধিত হচ্ছিল না। যে কাজ তারা সকলে পূর্ণ নিবিষ্ট চিত্তে ও আগ্রহ সহকারে আঞ্জাম দিচ্ছিল তার জন্য কোন নতুন উম্মাহ জন্ম দেবার দরকার ছিল না এবং মানব জীবনের এই প্রশান্ত সমুদ্রে এই নতুন তরঙ্গ তোলারও প্রয়োজন ছিল না যা মুসলমানদের জন্ম লাভের ভেতর দিয়ে আবির্ভাব ঘটল এবং যারা পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করল। আল্লাহতা'আলা যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন তখন ফেরেশতারা আবেদন করলেন, তাসবীহ-তাহলীল ও পাক-পবিত্রতা বর্ণনার জন্য তো আমরাই যথেষ্ট ছিলাম, এর জন্য আবার এই মাটির পুতুল বানাবার কী দরকার পড়ল, বুঝতে পারলাম না। আল্লাহতা'আলা বললেন ঃ আমি জানি যা তোমরা জান না। এ যেন ইঙ্গিত দিলেন এবং সামনে গিয়ে তা স্পষ্টও করে দিলেন, আদম (আ.) কেবল এই কাজের জন্যই পয়দা হন নি, যে কাজ ফেরেশতারা আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তার থেকে আল্লাহ্ অন্য কাজ নিতে চান।

যদি মুসলমানদেরকে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই সৃষ্টি করা হচ্ছিল তাহলে মক্কার সেই সব ব্যবসায়ী বণিক যারা সিরিয়া ও য়ামনের পানে তেজারতি তথা বাণিজ্যিক সফর করত এবং মদীনার সেই সব বড় য়াহুদী সওদাগর যারা ছিল বিরাট ধন-সম্পদের মালিক, একথা জিজ্ঞেস করবার অধিকার ছিল, এ কাজের জন্য আমরা অধমরা কি যথেষ্ট ছিলাম না, যার জন্য একটি নতুন উম্মাহ সৃষ্টি করা হচ্ছে? যদি কৃষিকর্মই উদ্দেশ্য ছিল তা হলে মদীনা ও খয়বরের, তায়েফ ও নজদের এবং সিরিয়া, য়ামন ও ইরাকের কৃষকদের কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের একথা জিজ্ঞেস করবার অধিকার ছিল, চাষবাস ও কৃষিকর্মে প্রাণান্ত পরিশ্রম ও দৌড়ঝাপের ক্ষেত্রে এমন কোন্ কাজে আমরা পিছিয়ে রইলাম, যেজন্য একটি নতুন উম্মাহর আবির্ভাব ঘটছে? যদি দুনিয়ার চলমান মেশিনে ফিট হওয়াই উদ্দেশ্য ছিল এবং রাষ্ট্রের আইন-শৃংখলা রক্ষা ও পয়সার বিনিময়ে দাফওরিক কাজকর্ম পরিচালনাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের দাফতরিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একথা জিজ্ঞেস করবার অধিকার ছিল, এসব দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার জন্য আমরাই তো যথেষ্ট ছিলাম! তাছাড়া আমাদের বহু-ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-বান্ধব উপায়-উপার্জনহীন বেকার। এজন্য নতুন প্রার্থীর আবার দরকার পড়ল কেন?

আসলে মুসলমানদের একেবারেই সম্পূর্ণ এক নতুন উদ্দেশে ও এমন এক নতুন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছিল যা দুনিয়ার বুকে অপর কেউ আঞ্জাম দিচ্ছিল না, আর কেউ দিতেও পারত না। এজন্য একটি নতুন উম্মাহরই প্রেরণ করবার প্রয়োজন ছিল। অনন্তর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ...

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।" [আল-ইমরান, ১১০ আয়াত]

এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের খাতিরেই লোকেরা (মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম) দেশ থেকে দেশান্তরী হলেন, নিজেদের কায়কারবার ক্ষতিগ্রস্ত করলেন, সারা জীবনের কামাই বিসর্জন দিলেন, জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্য ভাসিয়ে দিলেন, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা বিরান করলেন, আপন আরাম-আয়েশ ও বিত্ত-সম্পদের মায়া ত্যাগ করলেন, দুনিয়ার সকল প্রকার সাফল্য, কামিয়াবী ও

প্রাচুর্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন, জীবনের সোনালী মুহূর্তগুলো খুইয়ে দিলেন, পানির ন্যায় বেদেরেগ খুন ঝরালেন, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে এতিম ও স্ত্রীদেরকে বিধবা বানালেন। সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যেই সব লক্ষ্য-উদ্দেশের পেছনে মুসলমানদেরকে আজ তৃপ্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এত হৈ-হাঙ্গামা ও আলোড়ন সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। এসব হাসিলের রাস্তা তো বিলকুল শংকাহীন ও সমান্তরালই ছিল। আর এই রাস্তায় চললে সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে কোনরূপ লড়াই-সংঘর্ষের দরকার পড়ত না আদৌ। আরবের লোকগুলো ও সমসাময়িক দুনিয়ার অপর কোন জাতিগোষ্ঠীরই এ ব্যাপারে অভিযোগের কারণ ঘটত না। তারা (কাফির-মুশরিকরা) তো বারবার এই সব জিনিসই পেশ করেছিল যা আজকের মুসলমানদের পরম কাম্য ও লক্ষ্যবস্তু এবং ইসলামের দা'ঈ আহ্বায়ক অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিবার তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিত্ত-সম্পদ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের যাবতীয় প্রস্তাবই নামঞ্জুর করেছেন। এরপর মুসলমানদেরকে যদি আজকের পর্যায়েই আসার ছিল যার ওপর নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় তামাম কাফির জাতিগোষ্ঠী ছিল এবং এখনও দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিম অধিবাসী আছে, আর জীবনে যদি ঐসব কর্মকোলাহলে লিপ্ত ও আপাদমস্তক নিমজ্জিত হবারই ছিল যার ভেতর তৎকালীন আরব, রোম ও পারস্যের লোকেরা নিমজ্জিত ছিল এবং ঐসব সাফল্য ও কামিয়াবীকেই যদি জীবনের চরম কাম্য ও পরম লক্ষ্যবস্তু বানাবার দরকার ছিল, যেগুলোকে তাদেরই পয়গাম্বর (সা.) তাদের সর্বোত্তম সুযোগে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তবে তা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসেমর ওপর পানি ঢালারই সমার্থক হবে এবং এ কথারও ঘোষণা হবে মানুষের যেই সব মহামূল্যবান খুন যা বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনায়ন, কাদেসিয়া ও ইয়ারমূক প্রান্তরে ঝরানো হয়েছিল তা অপ্রয়োজনেই ঝরানো হয়েছিল।

আজ যদি কুরায়শ সর্দারদের কিছু বলার শক্তি থাকত তাহলে তারা মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে একথা বলতে পারত, আজ তোমরা এসব জিনিসের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছ, যেসব বস্তুকে তোমরা তোমাদের জীবনের পরম লভ্য ও কাঙ্ক্ষিত ভাবছ, সেই সব জিনিসই তো আমরা গোনাহগাররা তোমাদের পয়গাম্বরের সামনে পেশ করেছিলাম আর সেগুলো তোমরা এক ফোঁটা খুন না ঝরিয়েও হাসিল করতে পারতে। তাহলে তোমাদের যাবতীয় দৌড়-ঝাপ ও চেষ্টা-সাধনার প্রাপ্তি এবং সেই সমস্ত কুরবানী ও ত্যাগের মূল্য কি সেই জীবন-পদ্ধতি ও জীবনধারা যা আজ তোমরা মেনে চলেছ এবং জীবন-যিন্দেগী ও নৈতিক চরিত্রের কি সেই সমতল রেখা যার ওপর আজ তোমরা পরম তুষ্ট? আজ যদি কুরায়শ নেতৃবর্গের ভেতর থেকে কেউ, যারা ছিল ইসলামের প্রতিপক্ষ—এই

প্রশ্ন করবার সুযোগ পায় তাহলে আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর ও যোগ্য থেকে যোগ্যতর উকীলও এর সন্তোষজনক ও থামিয়ে দেবার মত জওয়াব দিতে পারবেন না এবং এ ব্যাপারে উম্মাহর লজ্জিত লজ্জিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুসলমানদের সম্পর্কে এই আশংকাই ছিল, তারা দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন ভুলে না বসে এবং দুনিয়ার সাধারণ পর্যায়ে না নেমে আসে। ইন্তিকালের কাছাকাছি সময় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্র্যের আশংকা করি না। আমার তো আশংকা, না জানি দুনিয়া তোমাদেরকে পেয়ে বসে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পেয়ে বসেছিল। ফলে তাদের মত তোমরাও দুনিয়ার প্রতি লোভাতুর হয়ে পড়বে এবং তার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হবে। অতএব, দুনিয়া তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তদ্রূপ ধ্বংস করে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মদীনার আনসাররা যখন ইচ্ছা করল, তারা জিহাদের ব্যস্ততা ও ইসলামের জন্য সংগ্রাম ও সাধনা থেকে কিছুদিন অবসর নিয়ে নিজদের বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ও কায়-কারবার একটু ঠিকঠাক করে নেবে এবং কিছুকালের জন্য কেবল নিজেদের কায়-কারবারে মশগুল হবার অনুমতি নেবে। তাদের মনে ঘুণাক্ষরেও একথা স্থান পায়নি, তারা দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ, যেমন–নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত থেকেও কিছু দিনের জন্য আপন কায়-কারবার দেখাশোনা করার জন্য নিজেদেরকে পৃথক করে নেবে। কিন্তু ইসলামের বাস্তব সংগ্রাম-সাধনা, দ্বীনের প্রসার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা থেকে সরে তাদের সাময়িক একাগ্রতা ও আত্মহত্যার সমার্থক হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হলে হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) এর উপরিউক্ত রূপ তফসীরই করেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ وَاَحْسِنُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের ভেতর নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎ কাজ কর; আল্লাহ্ সৎ কর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।" [সূরা বাকারা ঃ ১৯৫ আয়াত]

মুসলমানদের জীবনের প্রকৃত ও মৌলিক কাঠামো এটাই, হয় ইসলামের দাওয়াত ও বাস্তব চেষ্টা-সাধনায় মশগুল থাকবে অথবা এই দাওয়াত ও বাস্তব চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হবে। এরই সাথে বাস্তব চেষ্টা-সাধনায় অংশ গ্রহণের অটুট সংকল্প ও আগ্রহও থাকতে হবে। নিরুপদ্রব ও নির্বিবাদী ভাল মানুষ ও সুনাগরিক হওয়া এবং শুধুই কারবারী জীবন ইসলামী জীবন নয় এবং কোনভাবেই এ একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। জীবনের বৈধ ও অনুমোদিত কর্ম প্রয়াস, অনুমোদিত ও বৈধ জীবনোপকরণ কখনোই নিষিদ্ধ নয়, বরং নিয়ত ও সওয়াব কামনার সাথে তা ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভেরও মাধ্যম বটে, কিন্তু কেবল তখন, যখন এ সবই দ্বীনের ছায়ায় হতে থাকবে এবং সঠিক ও বিশুদ্ধ লক্ষ্যের মাধ্যম হবে, কিন্তু তা স্বয়ং লক্ষ্যবস্তু যেন না হয়!

সীরাতে মুহাম্মদী (সা.)-এর এটাই সবচে' বড় পয়গাম খালেস ও নির্ভেজাল মুসলমানদের নামে। এর প্রতি দিকপাত না করা, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট করা সবচে' বড় সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, যা সীরাতে মুহাম্মদী (সা.) মুসলমানদের সামনে পেশ করে থাকে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবদানে নতুন পৃথিবী

মানবতার সেবায় নিবেদিত ব্যক্তি ও দলের সংখ্যা প্রচুর। ইতিহাসে এমন মানুষের সংখ্যাও অনেক যারা পৃথিবীর নির্মাণ ও উন্নতি সাধনে অকাতরে শ্রম দিয়েছেন, বরং ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায়, অগণন অসংখ্য মানুষ এসে ভিড় করেছে এবং নিজেদেরকে মানবতার সেবক ও নির্মাতা হিসেবে দাঁড় করাতে যারপরনাই চেষ্টা করছে। তারাও মানবতার সেবা ও নির্মাণের মাপকাঠিতে বিবেচিত ও উত্তীর্ণ হতে চায়। আমরাও বলি, পৃথিবী ও মানবতার প্রতি তাদের সমূহ চেষ্টা-অবদান বিচার করে দেখা দরকার। সূক্ষ্ম নিক্তিতে মেপে দেখা দরকার মানবতার নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের মাপকাঠিতে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেন কে?

প্রথমেই ভাবতে হয় চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের কথা। পরম গাম্ভীর্য আর শ্রদ্ধাস্নাত এই কাফেলাটি রীতিমতই সম্মানিত আদর পেয়ে আসছে মানব সভ্যতায় যুগে যুগে। বড় বড় গ্রীক দার্শনিক আর ভারতবর্ষের নামী-দামী জ্ঞান-গুরুর ছোঁয়ায় এ কাফেলা বরাবরই ছিল অনন্য-বরেণ্য। দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি দুর্বলচিত্ত আমরা এই কাফেলার প্রতি চোখ তুলতেই আরেকবার নড়ে উঠি। অবলীলায় বলে উঠি, এরাই মানব জাতির মাথা উঁচু করেছে! মানবতার উভয় হাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মণি-মুক্তায় পূর্ণ করে দিয়েছে, অথচ আমরা যদি একবার একদিকদর্শিতা আর নিজস্ব লালিত বিশ্বাসের গণ্ডিমুক্ত হয়ে ভাবি এবং চিন্তা করি, আচ্ছা, বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের এই কাফেলাটি কি মানবতার জন্য বিশেষ কোন করুণা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে? আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি মানবতা তাদের কাছে কি পেয়েছে? মানবতার কোন্ কোন্ তৃষ্ণা নিবারণ করেছে এই কাফেলা? মানবতার কোনো যন্ত্রণার চিকিৎসা করেছে এই জ্ঞানগুরুর দল-দার্শনিক কাফেলা?

আমরা এসব প্রশ্ন নিয়ে যতই ভাবি শূন্যতা আর দীনতা ছাড়া কিছুই খুঁজে পাই না। কেবল পাই সাগর সাগর নৈরাশ্য। আপনি নিজেই দর্শনশাস্ত্র পড়ুন! দার্শনিকদের জীবনপাতাগুলো উল্টে দেখুন! মনে হবে, দর্শনের জীবনসমুদ্রের ছোট একটি দ্বীপ ছিল। কিছু রক্ষিত জায়গা ছিল। সীমানা পাতা ক্ষুদ্র একটি এলাকা ছিল। জ্ঞানগুরু-দার্শনিকরা আল্লাহ্প্রদত্ত তাদের সকল শক্তি ও মেধা সেই ছোট্ট ক্ষুদ্র রক্ষিত ভূমিতেই শেষ করে দিয়েছেন।

মানবতার যেসব চাহিদা ছিল আশু পূরণীয়, যেসব সমস্যাকে এক মুহূর্তের জন্য রেখে দেয়া যায় না, যেসব সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচন ব্যতিরেকে মানবতার গাড়ি এক পা এগুতে পারে না. জ্ঞানগুরু দার্শনিকরা সেসব সমস্যার প্রতি

একবার চোখ তুলে তাকানও নি। এসব সমস্যা উত্তরণে মানবতাকে সহায়তা করা তো অনেক পরের কথা, এসব সমস্যা নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনাও হয়নি, বাক-বিতণ্ডাও হয়নি। তারা বরং তাদের সেই জ্ঞানভূমিতে, চিন্তা ও দর্শনের দ্বীপরাজ্যে নিরাপদ শান্তিময় জীবন যাপন করেছেন; কিন্তু মানবতা তো আর সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্যে বন্দী থাকেনি! দার্শনিকদের আবাদভূমি গ্রীকেও তো অদার্শনিক কম ছিল না! এই দার্শনিকগণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে খুব ভেবেছেন। নক্ষত্রের বিচরণ পথ, আকাশমণ্ডলী, আরো কত কিছু নিয়ে মাথা ক্ষয় করেছেন; কিন্তু অদার্শনিকদের ওসবের সাথে কি সম্পর্ক! তাছাড়া মানবতাই বা এসব থেকে কি পেয়েছে? মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই বা ওসবের দ্বারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে? উদ্‌ভ্রান্ত, পথহারা, ম্রিয়মাণ মানবতার জন্য তারা কি করেছেন? তারা জীবন যাপন করেছেন, অথচ জীবনের সাথে তাদের সম্পর্কই ছিল না। জীবনের চারপাশে জ্ঞান ও দর্শনের প্রাণহীন দেয়াল এঁটে রেখেছিলেন তারা, সম্পর্ক যা ছিল তা কেবল দর্শনের কয়েকটি কেতাবী কথা।

এখন চলছে রাজনীতির যুগ। সর্বত্র রাজনীতির হৈ চৈ! আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। আশা করি এই উপমাটি দার্শনিকদের অবস্থান নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে! আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের এই দেশে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস আছে। কোনোটা আমেরিকার দূতাবাস, কোনটা রাশিয়ার। কোনোটা মিশরের দূতাবাস, আবার কোনোটা ইরানের। এসব দূতাবাসের ভেতরেও মানুষ আছে। জীবন যাপন—প্রাণচাঞ্চল্য সবই আছে। সেখানে তারা খানাপিনা করে, পড়া-লেখা করে। অনেক বড় বড় শিক্ষিত, রাজনৈতিক বিশ্লেষকের নিবাস এই দূতাবাসগুলো, অথচ আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ের সাথে এদের এক বিন্দু সম্পর্ক নেই। আমাদের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দারিদ্র, ঐশ্বর্য, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি-অবনতি নিয়েও তাদের কোনো ভাবনা-ব্যথা নেই, বরং তাদের নির্ধারিত কিছু কাজ আছে। তাও সীমিত অঙ্গনে তারা কেবল সেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাই তারা আমাদের দেশে থেকেও যেন নেই! দর্শনের বিষয়টিও ছিল অনুরূপ। জ্ঞানগুরু দার্শনিকরা সেই দূতাবাসের বদ্ধ নিবাসে বসে জ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকতেন। জীবনযুদ্ধের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

দার্শনিকদের পরেই আসে কবি-সাহিত্যিকদের পালা। কাব্য-সাহিত্যের প্রতি আমাদেরও ঝোঁক আছে। তাই আমরা কাব্য-সাহিত্যকে খাটো করে দেখছি না। তবুও আমাকে মাফ করবেন! আমি বলতে বাধ্য, কবি-সাহিত্যিকরাও মানবতার ব্যথা দূর করতে সচেষ্ট হয়নি। মানবতার দীর্ঘ যন্ত্রণা আর ভয়াল জখম

বেদনার চিকিৎসা না করে তারা আমাদেরকে দিয়েছেন কিছু বিনোদন মাত্রা, অবসর কাটাবার নিষ্ফল সওদা। সন্দেহ নেই, তারা আমাদের সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন; কিন্তু মানবতার ব্যথায় বিমূঢ় হয়নি তাদের মাথা। মানবতার ইসলাহ্ ও সংশোধনের চিন্তা করতে পারেন নি তারা। আর এটা তাদের সাধ্যাতীতও বটে!

জীবনের উত্থান-পতন হয়েছে। মানবতা ভেঙ্গেছে-গড়েছে। আর কবি-সাহিত্যিকরা বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন। এর উদাহরণ হলো এমন, মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় নিপীড়িত। কেউ জ্বলছে। কেউ লড়াই করে মরছে। আরেকজন বাঁশিওয়ালা মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে আর হাঁটছে। হতে পারে লড়াকু যোদ্ধা আর পীড়িত জনরাও তার সুরে কিছুটা হলেও আমোদিত হবে। ভাবের ভোগে শরীক হবে, কিন্তু তারা সেই সুর মূর্ছনায় জীবনের সমস্যা তো পার হবে না! অধিকন্তু তার সুরে সমস্যার জট খোলার কোনো নির্দেশনাও নেই। তবুও আমাদের জীবন সাহারায় কাব্য-সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। আমাদের আত্মা ও বিবেক শানিত করি, অনুপ্রাণিত করি কাব্য-সাহিত্যের ছোঁয়ায়; কিন্তু এতে জীবন সমস্যার তো সমাধান হচ্ছে না! রক্তাক্ত জীবন যাত্রার দাওয়াইতো এতে নেই! আর আমাদের কবি-সাহিত্যিকরাও কোনো বিষয়ে কখনো চাপাচাপি করেন না। বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও টার্গেটে তারা সংকল্পবদ্ধ হন না। তাই সেজন্য জীবনপণ লড়াইও তাদের করতে হয় না। তাছাড়া লড়াই-সংগ্রাম তাদের নাগালভুক্তও নয়, অথচ সংগ্রাম ও যুদ্ধ ছাড়া কোনো সংস্কার বিপ্লবও হতে পারে না। এ কারণেই সংস্কার ও সংগ্রামের ইতিহাসে কবি-সাহিত্যিকদের পদচারণা তেমন একটা নজরে পড়ে না।

তৃতীয় পর্যায়ে ভাবা যায় বিজয়ীদের কথা, যাদের তরবারির আঘাতে ঝরে পতাকা, খান খান হয় সিংহাসন, যারা দেশের পর দেশ জয় করে সৃষ্টি করেন ইতিহাসের নতুন ধারা এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই বিজয়ীদের প্রতি অনেকটা দুর্বল থাকি। তাদের তালোয়ারের ঝনঝনানি আজও আমাদের কানে বাজে। বাহ্যত তাদের চিৎকার শুনে মনে হয়, তারা মানবতার জন্য অনেক কিছু করেছেন; কিন্তু তাদের ইতিহাস কি তা-ই বলে? তাদের ইতিহাস কি ন্যায় ও ইনসাফের ইতিহাস, না ত্রাস ও নারকীয়তার ? সেকান্দরের নাম শুনতেই মানুষের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তার নির্যাতনের বর্বরতর কাহিনীগুলো। তাই কোনোক্রমে তাকে মানবতার বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। সেকান্দারতো গ্রীক থেকে ভারত পর্যন্ত দেশের পর দেশ উলট-পালট করে দিয়েছিল। শত দেশ, শত জাতি তার অত্যাচারে যাবতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে হয়েছিল বঞ্চিত। তার মৃত্যুর হাজার বছর পরও পতিত-নির্যাতিত

জাতিগুলো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তাছাড়া সিজার, চেঙ্গিস খানদের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর খ্যাতনামা অন্যান্য বিজয়ীও অনুরূপ জীবনধারায় ছিল বিশ্বস্ত। তাই বিজয়ী যোদ্ধারা হতে পারে স্বীয় জাতি ও দেশের জন্য বন্ধ—পরম বন্ধু; কিন্তু অন্যদের জন্যতো নিঃসন্দেহে আযাব ও বিপদ।

চতুর্থ পর্যায়ে আমরা ভাবতে পারি সেই সব সংগ্রামী জীবন-যোদ্ধাদের কথা—যারা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। এই শ্রেণীটির কথা ভাবতে গেলেই শ্রদ্ধায় অবনত হই আমরা। সন্দেহ নেই তারা তাদের মাতৃভূমির জন্য অনেক কিছুই করেছেন; কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় ঃ যারা অন্য দেশের বাসিন্দা তাদের জন্য কি করেছেন তারা? আপনি নিশ্চয় আব্রাহাম লিংকনের নাম শুনেছেন। আধুনিক আমেরিকার স্থপতি তিনি; কিন্তু তিনি ভারত, মিসর, ইরাকসহ অন্যান্য দেশের জন্য কী করতে পেরেছেন? সন্দেহ নেই, আমেরিকাকে পৃথিবীর এক সুপার পাওয়ার হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন; কিন্তু বিশাল পৃথিবীর জন্য কি গোলামী ও দাসত্বের নব শৃঙ্খল সৃষ্টি হয়নি এতে? আচ্ছা, সা'দ যাগলূলের কথাই ভাবুন! মিসরবাসীদের জন্য এক আশীর্বাদ-পুরুষ। মিসরের স্বাধীনতা বিপ্লবের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব, কিন্তু মিসরীদের জন্যতো তিনি কিছুই করতে পারেন নি। মূলত এই জাতিপূজা স্বদেশের জন্য আশীর্বাদ হলেও অন্য দেশ ও জাতির জন্য এক মহাবিপদ! কারণ জাতিপূজা আর জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণাটাই হলো, নিজের জাতির মাথা উঁচু করা আর মাথা নত করা অন্য সকল জাতির। এই প্রেরণা ও বাসনা পূরণ করতে গিয়ে স্বীয় জাতির মাথা উঁচু করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক জাতিকে দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করতে হয়! এবং একথা সকলেই জানে!

পঞ্চম পর্যায়ে আমরা ভাবতে পারি আধুনিক বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকদের কথা। নিঃসন্দেহে তারা জাতিকে অনেক নতুন বিষয় দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় অনেক অভিনব আসবাবপত্র আবিষ্কার করেছেন। তাদের এ সেবা অনিস্বীকার্য। কারণ তাদের এসব সৃষ্টি ও আবিষ্কার রীতিমত আমাদেরকে উপকৃত করে। বিদ্যুৎ, বিমান, ট্রেন, রেডিও তাদের অবদান। এজন্য তাদেরকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে এবং মানুষ এসব আসবাবপত্র দ্বারা প্রতিনিয়ত আমোদিত আস্বাদিত হচ্ছে। তারপরও একবার ভেবে দেখুন, শুধু এসব আবিষ্কারই কি মানব ও মানবতার জন্য যথেষ্ট? এসব আবিষ্কারের সাথে যদি সদিচ্ছা না থাকে, ধৈর্য ও সংযম না থাকে, সৃষ্টির প্রতি দরদ ও আন্তরিকতা না থাকে, সেবার মনোভাব না থাকে, এর দ্বারা মানবতার মৌলিক সমস্যা ও চাহিদার সমাধান না হয় তাহলে আপনিই বলুন, এই সৃষ্টি মানবতার জন্যে আশীর্বাদ না অভিশাপ!

আমাদের বিজ্ঞানীরা মানবগোষ্ঠীকে নতুন নতুন অনেক কিছুই দিয়েছেন; কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের সঠিক চেতনা দিতে পারেন নি। এই নব্য আবিষ্কারকে কাজে লাগাবার মত মন ও অনুভূতি দিতে পারে নি তাদেরকে। এসব সৃষ্টি ব্যবহার করে অনাসৃষ্টির সম্ভাব্য পথ পরিহার করার পরামর্শ ও শিক্ষা দিতেও দৈন্যের পরিচয় দিয়েছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা!

ইতোমধ্যেই আমরা দু'টি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি। আধুনিক আবিষ্কারের জঘন্য ব্যবহারের প্রদর্শনী আমাদেরকে অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, চারিত্রিক প্রশিক্ষণ আর আল্লাহ্-প্রীতি ছাড়া আধুনিক আবিষ্কার ও সৃষ্টি শুধু অভিশাপই নয়, মানব ও মানবতার জন্য এক মহাত্রাস, ভয়ানক আযাব।

আমি কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীদেরকে ছোট করে দেখছি না, বরং বলছি, এসব আবিষ্কার ও সৃষ্টির সাথে সুচিন্তা, শুভ লক্ষ্য, সুন্দর চরিত্র ও নিয়ন্ত্রিত বিবেক-বুদ্ধির সমন্বয় দরকার। যদি এসবের সমন্বয় ছাড়া সৃষ্টি ও আবিষ্কার হয় তাহলে সেটা হবে অসম্পূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভেতর সদিচ্ছার উদয় না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর ও মঙ্গল কাজ করতে তার নিজেদের মধ্যেই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শত উপায়, উপকরণ, অজস্র সুযোগ-সুবিধা তাদেরকে সৎ সাধু বানাতে পারবে না। মনে করুন, আমার কাছে দেয়ার মত অর্থ আছে। নেয়ার মত অসহায় মানুষও আছে অনেক, আমাকে বাধা দেয়ার মত কেউ নেই; কিন্তু আমার মধ্যে দান করার মত প্রেরণা ও আগ্রহ নেই। তাহলে আমাকে দান করতে, অসহায়কে সাহায্য করতে কে উৎসাহিত করবে?

এসবের বাইরেও আরেকটি মানব কাফেলা আছে! তাঁরাও আমাদের মত মানুষ। তাঁরা আল্লাহ্র পয়গম্বর। নির্বাচিত দূত-কাফেলা। তাঁরা কখনো নিজেদেরকে আবিষ্কারক কিংবা বিজ্ঞানী বলে দাবী করেন না। নিজেদেরকে জ্ঞানগুরু হিসেবেও দাবী করেন না। কবি-সাহিত্যিক হিসেবেও গর্ব নেই তাঁদের। তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন না, আবার অনর্থক নিজেদেরকে খাটোও করেন না, তাঁরা বরং অত্যন্ত বলিষ্ঠ, সরল ও সহজ ভাষায় বলে দেন, তাঁরা এই পৃথিবীকে তিনটি বিষয় প্রদান করেন ঃ (১) বিশুদ্ধ জ্ঞান, (২) সেই জ্ঞানের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও (৩) সেই জ্ঞান ও বিশ্বাস মুতাবিক জীবন যাপন করার অমিততেজ অনুপ্রেরণা। এই হলো হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের শিক্ষার সারসংক্ষেপ।

এ পর্যায়ে আমি সেই জ্ঞানের কথাই বলতে চাই নবী-রাসূলগণ মানব জাতিকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেন। হ্যাঁ, তাঁরা মানব জাতিকে এ কথারই শিক্ষা দেন, এই পৃথিবী কে বানিয়েছেন? কেন বানিয়েছেন? নবীর কথা হলো, প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে, আমাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যটাই বা কি? এসব জিজ্ঞাসার সমাধান করেই আমাদেরকে এগুতে হবে, নইলে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হবে ভুল। আমাদের সকল প্রচেষ্টাই হবে বৃথা। অধিকন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর না জেনে এ পৃথিবীকে, এই পৃথিবীর একটি পরমাণুকেও কাজে লাগাবার, ব্যবহার করবার অধিকার নেই আমাদের। কারণ এই পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, বচন-উচ্চারণ, খানা-পিনা, ওঠা-বসা এ পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র অংশ। সুতরাং এই বিশাল বিশ্ব সম্পর্কে যখন আমি কিছুই জানব না, এর মূল নিয়ামক ও পরিচালক শক্তি-বিন্দু সম্পর্কেও আমি থাকব অজ্ঞ। অধিকন্তু এই নিখিল ভুবন সৃষ্টির মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথেও যখন আমার একাত্মতা নেই, তখন এই পৃথিবীর কোনো কিছু থেকেই উপকৃত হবার, আস্বাদিত-আমোদিত হওয়ার অধিকার আমার নেই। এই বিশেষ নিয়ন্তার উপলব্ধি ও তাঁর বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য না জেনে আমি একটি রুটির গায়েও আঙ্গুল বসাতে পারি না। আমি যেভাবে এই বিশাল দুনিয়ার একটি অংশ, এই রুটির একটি টুকরোও সেভাবে এই বিশাল পৃথিবীর একটি অংশ। শুধু কি তাই? আমরা এই পৃথিবী নামক যে গ্রহটিতে অবস্থান করছি এটাও সেই বিশাল জগতেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ।

আচ্ছা বলুন তো, গ্রহ-নক্ষত্রের বিশাল জগতে আমাদের এই পৃথিবীটার কি দাম আছে? গ্রহ-নক্ষত্রের বিশাল রাজ্যে আমাদের এই পৃথিবীর গুরুত্বের কথা জানতে পারলে আপনি সত্যিই লজ্জা পাবেন। শুধু চাঁদ কিংবা সূর্যের তুলনায় এই পৃথিবীকে একবার মাপ-জোক করুন। আর আপনার এই মহান দেশ! আচ্ছা, এটাকে কি কোন তুলনায় আনা যায়? এবার বলুন, এই বিশাল জগত সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র আপনাকে কে অবহিত করল? কার মহিমায় এই বিশাল রাজ্যের সাথে আপনার সম্পর্ক গড়ে উঠল? নিশ্চয়ই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে! এবং যে উদ্দেশে তিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্যের খাতিরেই তো পরিচয়ের এই সেতু সৃষ্টি, অথচ এই মহান সৃষ্টিকর্তাকেই যদি আপনি না জানেন কিংবা না মানেন, তাঁর দেয়া জীবন লক্ষ্যই যদি আপনার মনঃপূত না হয় তাহলে তাঁর জগতের ক্ষুদ্র একটু দানা-পানি কি আপনি ব্যবহার করতে পারেন? সেই অধিকার কি আপনার আছে?

আমি জানতে চাই, আপনার হাতে খাবারের যে টুকরোটি আছে, এই টুকরোটি যদি আপনাকে প্রশ্ন করে বসে এবং বলে ঃ হে মানব! আমিতো আমার সৃষ্টিকর্তাকে চিনি এবং তাঁর আদেশ মাফিক তোমার তরে আমার অস্তিত্বকে

বিলীন করে দিচ্ছি: কিন্তু তুমি! তুমিতো তোমার সৃষ্টিকর্তাকে জানোও না, তাঁর বন্দেগীও করো নি। তাহলে তুমি কোন্ অধিকারে আমাকে ভোগ করবে? বলুন, তখন আপনি কি জবাব দেবেন? শুধু খানাপিনাই নয়, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ব্যবহারের সময়ই একথা ভাবতে হবে–এর সৃষ্টিকর্তা কে? কেন সৃষ্টি করেছেন তিনি এটা?

কিন্তু এ এক আজব ট্রাজেডি! আজ পৃথিবীর সকল কাজ চলছে। বাজারে প্রাণ-চাঞ্চল্যের তরঙ্গায়িত প্লাবন! যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে নিয়ত। গাড়ি চলছে। বাড়ি গড়ছে। চলছে কল-কারখানা, অথচ কারোরই একথা জানবার অবসর নেই, আচ্ছা, এতো কিছু যে হচ্ছে, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা কে? আর কেন-ই বা তিনি এত কিছু বানালেন?

পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই পৃথিবীতে আগমন করেন তখনও মানবতার গাড়ি চলছিল। তবে লক্ষ্যহীন! দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, বিজেতা, শাসক, কৃষক ও ব্যবসায়ী সকলেই ছিল প্রচণ্ড ব্যস্ত। কারোরই মাথা ওঠাবার সুযোগ ছিল না। আপন পেশা ও কর্মে যেন উবু হয়ে পড়ে আছে সকলে! তখন শাসকও ছিল, শাসিতও ছিল। অত্যাচারীও ছিল, অত্যাচারিতও ছিল; কিন্তু তারা জানত না কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারা খুঁজে দেখেনি কেনই বা তাদের এই পৃথিবীতে পর্দাপণ! এই অজ্ঞ লক্ষ্যচ্যুত মানবগোষ্ঠীর কাছেই একজন বিশাল মানবের আগমন হয়। তিনি এসে মানবতার পতাকাবাহীদের জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলতো, তুমি মানব জাতির প্রতি কেন এই অত্যাচার করেছ? তাদেরকে তাদের প্রভুর সন্ধানটি পর্যন্ত দাওনি! সারা জাহানের বাদশাহ'র দরবার থেকে টেনে এনে নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছ? কোন্ অধিকারে তুমি অপূর্ণ কিশোর মানবতাকে অন্যায় পথে তুলে দিয়েছ? হে অত্যাচারী চালক! তুমি মুসাফিরকে জিজ্ঞেস না করেই কোন্ দিকে জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছ?

সে মানবতার হৃদয়ে দাঁড়িয়ে জানতে চায়, চিৎকার করে ডাক দেয়। তার প্রশ্নের উত্তর না দেয়ার উপায় নেই। পাশ কাটাবার পথ নেই। তার এই চিৎকার শুনে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল তার ডাকে সাড়া দেয়। অন্য দল অস্বীকার করে। অবশ্য এ দুটো ভিন্ন তৃতীয় কোনো পথ নেই।

নবীরা কখনো একথা বলেন না, আমি কোনো গুপ্তধনের সন্ধান নিয়ে এসেছি। মানুষের শক্তিকে যাদুর কাঠি বুলিয়ে কাবু করবার মত কোনো চমকও তাঁরা দেখান না। নতুন কোনো আবিষ্কারও তাঁদের স্লোগানের অন্তর্ভুক্ত হয় না। ভূগোল কিংবা খনিজ সম্পদ বিষয়ে বিশেষ কোনো দক্ষতার দাবীও তাঁরা করেন

না, বরং তাঁরা বলেন ঃ আমরা এই বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষকে সঠিক ধারণা দেই–তাঁর দেয়া জ্ঞানের আলোকেই ও আমাদের মাধ্যমেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

তাঁরা আরও বলেন, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন। তাঁরই আদেশ ও ইচ্ছাকল্পে এই পৃথিবী চলছে। এই পৃথিবীর শাসন ও সৃষ্টিতে তাঁর কোনো শরীক নেই। এই পৃথিবীকে লক্ষ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেন নি তিনি এবং তাঁর যাত্রাও উদ্দেশ্যহীন নয়। এই জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে যে জীবনে এই জীবনের হিসাব নেয়া হবে। সেখানে ভালো কর্মের পুরস্কার আর মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন এবং যাঁরা আল্লাহর সমষ্টির পথ বলে দেন তাঁরাই পয়গম্বর, তাঁরাই রাসূল। তাঁরা সকল দেশে, সকল জাতির কাছেই এই আহ্বান নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের নির্দেশনা ছাড়া কেউ আল্লাহর পথ অতিক্রম করতে পারে না। তাঁদের এই আহ্বান, এই নির্দেশনা শাশ্বত। তাঁদের মত ও পথে কোনো বিরোধ নেই, দ্বিমত নেই, অথচ দু'জন দার্শনিক কোনো একটা বিষয়ে একমত হতে পারেন না।

তবে জানা থাকলেই যে বিশ্বাস থাকবে এমনটিও আবশ্যক নয়। আমরা আজকাল কত কিছুই তো জানি; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কত ক্ষীণ কত দুর্বল! জ্ঞান সব ক্ষেত্রেই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাচীনকালে কত দার্শনিক জীবনভর এক মুঠো বিশ্বাস জমাতে পারেন নি! এই নব্য যুগেও সন্দেহের ব্যাধিতে আক্রান্তদের সংখ্যা কম কোথায়? কিন্তু নবীগণ শুধু জ্ঞান দান করেই ক্ষান্ত হন না, সঙ্গে জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসও দান করেন। কারণ জ্ঞান অবশ্যই সম্পদ; কিন্তু তার চাইতেও বড় সম্পদ হলো বিশ্বাস। যে জ্ঞানে বিশ্বাস নেই যে জ্ঞান শুধু জিহ্বার অলংকার, মন-মগজের বিলাস-পত্র আর অন্তরের ভণ্ডামি মাত্র। এসব পঙ্কিলতার বহু ঊর্ধ্বে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)। তাঁরা সর্বদাই স্বীয় অনুসারিগণকে ইল্‌ম ও জ্ঞানের পাশাপাশি দান করেছেন অসীম বিশ্বাস। তাঁরা যা-ই জেনেছেন সে অনুযায়ী আমলও করেছেন। প্রয়োজনে সেই জ্ঞানের আলোকে জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হননি তাঁরা। জ্ঞান তাঁদের মন-মগজে আলো বিচ্ছুরণ করত, হৃদয়কে করত অগাধ সাহসী ও শক্তিমান। তাঁদের সেই সাহস ও শক্তির কাহিনী আজ আমাদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, আমাদের পুরানো ইতিহাসের সোনালী অংশ। তাঁদের পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর দিকে তাকালেই আমরা তাঁদের সেই ইল্‌ম ও বিশ্বাসের স্বাক্ষর দেখতে পাই।

আজ পৃথিবীতে বিশ্বাস নেই বলেই বিশ্ব জুড়ে অপরাধের এই সয়লাব। কারণ যদি বিশ্বাস থাকত তাহলে অন্যায়-অবিচারের এই তুফান বইত না। সমাজের সর্বত্র ঘুষ ও সুদের তাণ্ডব হতো না। এসব অপরাধ এটা কে না জানে? সুদ হারাম এটাও তো সকলেরই জানা। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অন্যায় এটা কার অজানা? জানে সকলেই; কিন্তু বিশ্বাস নেই। আমরা বরং লক্ষ্য করেছি, যেখানে জ্ঞানের প্রতিযোগিতা তুঙ্গে সেখানেই অপরাধের বাজার গরম। যারা সুদের অপকারিতা জানে, এই বিষয়ে বই লিখছে তারাই সুদ গ্রহণে আগ্রহী। যারা বেশী ওয়াকেফহাল তারাই চুরি বেশী করে। বার বার ছিনতাই-ডাকাতির শাস্তি ভোগ করার পর, বছরের পর বছর জেল খাটার পর তো তারা এসব অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে অজ্ঞ হবার কথা নয়, অথচ তারা আপন পথে অবিচল। তাই বিদ্যাটাই যদি যথেষ্ট হতো তাহলে একবার চুরির শাস্তি ভোগ করার পর আর চুরি করার কথা ছিল না। কিন্তু শাস্তি ভোগ করার পরও অপরাধী অপরাধ ছাড়ছে না। এতেই প্রমাণিত হয়, শুধু জানাটাই যথেষ্ট নয়, জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের মিলন অনিবার্য।

ইল্‌ম আবশ্যক। সেই ইলমের প্রতি বিশ্বাসও আবশ্যক; কিন্তু জ্ঞানার সাথে বিশ্বাসের মিলন হলেই কি তা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে ? অনেক ক্ষেত্রেই তো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কত লোক আছে যারা জানে মদ পান করা ভাল নয়। এর যেসব ক্ষতি আছে তার প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস আছে, অথচ মদ পান করে যাচ্ছে রীতিমত। ধূমপান ক্ষতিকর। এটা জানে সকল লোক, বিশেষ করে চিকিৎসকরা তো ভাল করেই জানেন, অথচ ধূমপায়ী চিকিৎসক ডাক্তারের সংখ্যা কি খুব কম? আসল কথা হলো, অন্যায় ত্যাগ করার মত মনোভাব ও স্পৃহা থাকতে হবে। দেখা যায়, অপরাধের নেশাকে জানা সত্ত্বেও পরাজিত করতে পারছে না অনেকেই। নবীগণের এটাও একটা স্বতন্ত্র অবদান। তাঁরা ইল্‌ম ও বিশ্বাসের পাশাপাশি অপরাধ বর্জনের মত স্পৃহাও তৈরি করেন মানুষের ভেতর। সে স্পৃহা বলে তাঁরা অন্যায় চাহিদাকে পরাজিত করতে পারেন যার বলে নবীদের অনুসারী গোষ্ঠী তাঁদের জ্ঞান ও বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে পারেন। সে মাফিক জীবন গড়তে পারেন। তাঁদের হৃদয় তাঁদেরকে অবিভাবকত্ব করে, অন্যায় কর্মে বলিষ্ঠ হাতে বাধা প্রদান করে।

সর্বকালের সকল পয়গম্বরই তাঁর অনুসারী জাতিকে এই তিনটি সম্পদ দান করেছেন, এই শক্তির পরশেই লক্ষ-কোটি মানব পথের সন্ধান পেয়েছেন। জীবন বদলে গেছে তাঁদের। তাই মানবতার প্রতি সত্যিকার অর্থে যদি কেউ করুণা করে থাকে সেটা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) করেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করুন! তাঁরা মানবতাকে পথ দেখিয়েছেন। মানবতাকে যথাসময়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে পৃথিবী এই সম্পদই হারাতে বসেছে। বিশুদ্ধ ইল্‌ম নেই। বিশ্বাসের প্রদীপও নিভে গেছে। সৎ কর্মের স্পৃহাও আজ কবরবাসী। খৃষ্টাব্দ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এসে মানবতার এই তিন সম্পদ এত দুর্লভ হয়ে পড়েছিল, তার ঠিকানা পাওয়াও ছিল মুশকিল। কোথাও এ সবের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। দেশের পর দেশ খুঁজে এমন একজন আল্লাহর বান্দা পাওয়া যেত না যার বক্ষে সঠিক জ্ঞানের আলো আছে। এমন কোনো আদম সন্তান পাওয়া যেত না যার আত্মায় বলিষ্ঠ ঈমান ও বিশ্বাস আছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) যে দ্বীন ও বিশ্বাস নিয়ে আগমন করেছিলেন তা সংকুচিত হতে হতে এক বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বর্ষাভেজা আঁধার রাতের জোনাকিদের মতো সংশয় ও অপরাধের অন্ধ জগতের কোথাও কোথাও ঝলক উঠত সেই আসমানী আলোর। ঈমান ও বিশ্বাসের সে এক দুর্ভিক্ষকাল! সে কালে একজন দুর্বার বিশ্বাসীর সন্ধান ও সংস্পর্শ ছিল কঠিন স্বপ্নসম। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বিশ্বাস ও সততার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। ইরান থেকে সিরিয়া, সেখান থেকে হিজরা পর্যন্ত সফর করে মাত্র চারজন বিশ্বাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি!

এই নিশ্ছিদ্র আঁধার আর আবিশ আচ্ছাদিত তমসার জগতেই আবির্ভাব হলো সর্বশেষ পয়গাম্বরের। তিনি এলেন। জ্ঞান, বিশ্বাস ও সৎ কর্মের প্রতি অগাধ স্পৃহার মশাল হাতে করেই এলেন এবং তা এমনভাবে ঘোষণা করলেন, এতো ব্যাপকভাবে প্রচার করলেন এই অমিয় সম্পদ যা এক সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত ছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানে সে আলো মহল্লা, শহর ও রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। কবির ভাষায়–

"এই আলো থেকে থাকেনি কেউ বঞ্চিত;
বিশাল ভুবন আল্লাহর ভরে উঠল সবুজ শ্যামলিমায়।"

তিনি এসে কেবল ইল্‌ম, বিশ্বাস আর স্পৃহার শিক্ষাই দেননি, মানুষের মধ্যে এ সবের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, বরং সে ছিল এক শিক্ষার ধ্বনি। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোনো কান বলতে পারবে না এর আওয়াজ আমি শুনিনি। যদি কেউ এ দাবী করে তাহলে এটা তার সংকীর্ণতা, আহ্বানকারীর সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নয়। পৃথিবীতে আজ এমন আবাদভূমি আছে কি যেখানে 'আশহাদু-আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আশহাদু আন্নামুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-এর ধ্বনি উচ্চকিত হয় না? পৃথিবীর সকল কণ্ঠ যখন ম্লান-অবসন্ন হয়ে পড়ে, জাগ্রত সকল শহরে যখন ঘুমের নীরবতা নেমে আসে, সর্বত্র যখন বাক-বিরতির গাঢ় নিস্তব্ধতা তখনও কান পেতে দেন, কানময় আলোড়িত করে উচ্চারিত হবে সেই একটি সুর—'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই পয়গম্বর'।

রেডিও'র বদৌলতে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে যে কোনো কথা দেশ থেকে দেশান্তরে। আহ্বান পৌঁছে যায় মানুষের ঘরে ঘরে; কিন্তু আমেরিকা কিংবা বৃটেনের কোনো রেডিও কি আজ পর্যন্ত তাদের কোনো বক্তব্যকে এতটা ছড়াতে পেরেছে যতটা ছড়িয়েছে এই ইল্‌ম, এই আহ্বান, অথচ এই আহ্বান আরবের এক নিরক্ষর নবীর। সাফা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একদিন উচ্চারণ করেছিলেন এই পয়গাম, এই আহ্বান।

কখনো কখনো মানুষ আবেগ-প্লাবিত হয়ে পড়ে। তখন সে অবুঝ-নিষ্পাপ শিশুর মতো নিজের মনিবের সাথে কথা বলে।

সেই শিশুর প্রকৃত আবেগমথিত সুরই ধ্বনিত হয়েছে প্রাচ্যের মহাকবি ইকবালের কণ্ঠে ঃ

'তোমার বিরান ভূমি-
আবাদ করতে পারে নি ফিরিশতা।'

আজ যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো একজন সাধারণ গোলাম একথা নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহ্! তোমার প্রভুত্ব হক ও যথার্থ। তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সৃষ্টিকর্তা। এই বিশ্বভূমিও তোমারই সৃষ্টি। তুমি সব কিছুই করতে পার। তোমার বান্দাহ ও সমগ্র মাখলুকের মধ্যে কেউ কি তোমার নামের এমন প্রচার ও প্রসার করেছে যেমনটি করেছেন তোমার বান্দাহ ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? তোমার নামের উচ্চারণ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে তিনি যে ত্যাগ সয়েছেন তা কি আর কেউ সয়েছেন? তাহলে এই জিজ্ঞাসা কোনো বেয়াদবী হবে না। এটা কোন অবাধ্যতা নয়, বরং এতেও মহান প্রভুরই প্রশংসা করা হয়। কারণ তিনি তো তাঁকে নবী বানিয়েছেন, ইসলামের প্রচার-প্রসারের সকল শক্তিও তো তাঁরই দান, তাঁর তাওফিকের ছোঁয়া না পেলে কি কিছু হতো!

বদর যুদ্ধের কথাই বলা যাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চৌদ্দ-পনের বছরের অর্জন আল্লাহর দ্বীনের সহযোগিতায় এনে ঢেলে দিয়েছেন। আর মাত্র তিন শ' তের জনকে হাজার যোদ্ধার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং মাটিতে মাথা রেখে মহান মাওলার দরবারে এ কথাইতো বলেছেন ঃ

'ওগো প্রভু!

তুমি যদি এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।'

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের যে স্লোগান উচ্চারণ করেছিলেন তার সুর ও আহ্বানে পৃথিবীর সকল ধর্ম, সকল দর্শন ও সকল চিন্তাই কম-বেশী প্রভাবিত হয়েছে। তিনি সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের প্রভু মাত্র একজন। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করা চরম অপমানের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদমের সামনে ফিরিশতাদের মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন যাতে আদম সন্তানরা তাদের মাথা আর কারো সামনে নত না করে এবং তারা যেন বুঝতে পারে সৃষ্টির এই মহান গোষ্ঠীর মাথা-ই যখন আমাদের সামনে অবনত, তখন আমরা তো এই পৃথিবীর কারো সামনে নত করতে পারি না আমাদের মাথা। যেদিন থেকে পৃথিবীর মানুষ তাওহীদের এই মর্মকথা শুনেছে সেদিন থেকে 'শিরক' নিজে নিজেই লজ্জায় অবনত হয়েছে। পরাজয় বরণ করেছে নিজে নিজেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কণ্ঠে উচ্চারিত তাওহীদ ও একত্ববাদের সুর-ই ভিন্ন। এখানে শুধু আমলের কথাই নয়, বরং এখানে তাওহীদের রয়েছে নিজস্ব ব্যাখ্যা, রয়েছে তার স্বতন্ত্র দর্শন। কারণ তাওহীদ এখন আত্মার গহীনে আশ্রয় পেয়েছে।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইল্‌ম ও বিশ্বাসের সাথে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে সহস্র পুলিস, অযুত-লক্ষ আদালত ও প্রশাসনের চাইতে অধিক ক্ষমতা নিহিত। সে শক্তি আত্মার। সত্যের প্রতি অনুরাগ, মন্দের প্রতি অনীহা আর জবাবদিহিতার আত্মউপলব্ধিই সেই শক্তি।

মূলত এই চেতনা, এই শক্তির বরকতে এক সাহাবী পাপ কর্মে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুশোচনায় অস্থির হয়ে পড়েন। কাত্‌রে ওঠে হৃদয় তাঁর গভীর বেদনায়। দৌড়ে আসেন তিনি নবীজীর খেদমতে। এসে নিবেদন করেন ঃ হে রাসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারা ফিরিয়ে নেন। তিনি আবার মুখোমুখি দাঁড়ান। আরয করেন ঃ আমাকে পবিত্র করুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। সাহাবী আবার সামনে এসে দাঁড়ান। প্রিয় নবীজী খোঁজ-খবর নেন। সে আবার মানসিক রোগী নয়তো? জানতে পারেন, লোকটি পূর্ণ সুস্থ। নবীজী তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রশ্ন হলো ঃ সে কোন্ শক্তি যা তাকে শাস্তি গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল? তিনি কোন্ শক্তি যা তাকে অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল?

এখানেই কি শেষ? গামেদিয়্যাহ্ গোত্রের সেই নিরক্ষর নারীর কাহিনী শুনুন! সে নারী থাকত অজ গাঁয়ে। একবার শয়তানের ফাঁদে পড়ে একটি পাপে জড়িয়ে পড়ল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কেউ দেখেনি, শোনেও নি; কিন্তু হৃদয় তার দগ্ধ হলো বিবেকের দংশনে। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিল না। এক চঞ্চল তপ্ত জ্বালা

তাকে তাড়া করে ফিরছিল। খানা-পিনায় কিছুতেই তৃপ্তি নেই। খানা খেতে বসলেই খাবারই যেন তাকে প্রতিবাদ করে বলে, তুমি অপবিত্র! পানির কাছে গেলে পানি তার আত্মায় আঘাত করে, তুমি অপবিত্র! তার ভেতর রাজ্য ভরে কেবল একটাই সুর সে শুনতে পায়, তুমি অপবিত্র, তোমার আবার খানাপিনার কি অধিকার? তোমাকে প্রথমে পবিত্র হতে হবে। শাস্তি পেতেই হবে। শাস্তি ছাড়া তোমার বিকল্প পথ নেই। কী আর করবে সে! হাজির হয় নবীজীর খেদমতে! আবেদন জানায় ঃ আমাকে শাস্তি দিন। আমাকে পবিত্র করে দিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোঁজ নেন। জানতে পারেন তার গর্ভে সন্তান আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আচ্ছা, তুমি না হয় পাপ করেছ, কিন্তু গর্ভের সন্তানটির কী অপরাধ! তার যখন জন্ম হবে তখন আসবে।

প্রিয় পাঠক! একবার ভাবুন তো সন্তান প্রসব হতেই কি কিছু সময় খরচ হয়নি? এই সময় কি সে খানাপিনা করেনি? খানাপিনার স্বাদ, জীবনের রূপ-রস কি তাকে বাঁচার আহ্বান জানায় নি? সে চাইলে কি এখন নবীজীর দরবারে হাজিরা থেকে বিরত থাকতে পারত না? কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দার অবস্থা দেখুন। সে তার সংকল্পে স্থির। কিছুদিন পর নবীজীর দরবারে এসে হাজির। বিনীত কণ্ঠে আরয করেছে, হে রাসূল! আমি তো অবসর হয়ে গেছি। এখন আর দেরি কেন, আমাকে পবিত্র করে দিন। নবীজী বললেন ঃ না, না, তাকে দুধ পান করাতে হবে না? সে যখন দুধ ছাড়বে তখন এসো। সকলেই জানে, এতে আরো দু'বছর সময় বেড়ে গেল। কত কঠিন পরীক্ষাকাল এটা! কোনো পুলিস নেই। কোনো পাহারাদার নেই। মুকদ্দমা নেই। মুচলেকা নেই। জামিন-জামানত কিছুই নেই। এই সময়ে জীবনের কত চরিত্র সে দেখেছে! কল্পনার আকাশ জুড়ে কতো স্বপ্ন উঠেছে, অবুঝ নিষ্পাপ শিশুর হৃদয়কাড়া অবয়ব, নিবিড়-শান্ত হাসির পল্লব, আর নিঃশব্দ উচ্চারণ মা, আমিতো তোমার কোলেই বড় হব মা! তোমার হাত ধরে হাঁটব। ঝাঁপিয়ে পড়ব সুখে-দুঃখে তোমার ঐ বুকে! এই আহ্বান কি উপেক্ষা করা যায়? কিন্তু তার হৃদয় বলছে, তুমি নাপাক। তুমি অপবিত্র। তোমাকে পবিত্র হতে হবে। হৃদয় তাকে শাসন করেছিল তোমাকে না একদিন আহ্‌কামুল হাকিমীনের দরবারে দাঁড়াতে হবে শেষ বিচারের দিনে! সে দিনের শাস্তি কিন্তু ভয়ানক। হৃদয়ের শাসনকে উপেক্ষা করতে পারল না। তাই সে হাজির হলো নবীজীর দরবারে। কোলে তার নিষ্পাপ শিশু। শিশুর মুখে তুলে দিয়েছে এক টুকরো রুটি। এসে খেদমতে আরয করেছে, হে রাসূল! আমার সন্তান রুটি খেতে শিখেছে। দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। আর দেরি নয়। এবার আমাকে পবিত্র করে দিন। অবশেষে আল্লাহ্‌র সত্যনিষ্ঠ বান্দীকে শাস্তি দেয়া হয় এবং

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার সৌভাগ্যের সনদ দান করেন। ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর এই সতী দাসীর তাওবা এমনভাবে কবুল করেছেন যদি তার এই তাওবাটি মদীনাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় সকলের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেত।

আমি বলি, এমন কি বিষয় ছিল, এমন কোন্ শক্তি ছিল যা তাকে কোনো ধরনের হাতকড়া, মুচলেকা ও জামানত ছাড়াই আদালতে হাজির হতে বাধ্য করেছিল? কোন্ সেই অদৃশ্য ক্ষমতা তাকে পুলিসের পাকড়াও ছাড়াই মাথা পেতে শাস্তি নিতে বাধ্য করেছিল? আজকের পৃথিবীতে শিক্ষিত লোকের তো অভাব নেই! নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাণ্ডিত্যের চড়া স্পর্শ কি তাদের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য তাদেরকে অপরাধ থেকে বিরত রেখেছে? গভীর বিদ্যা আর বিশ্বাস কি তাদের মঙ্গল কাজে ব্যাপৃত করতে পারছে? নিশ্চয়ই পারছে না।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীকে এই তিনটি অমূল্য সম্পদ দান করেছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস আর কল্যাণ ও সৎ কর্মের প্রতি আন্তরিক টান, শক্তিমান আকর্ষণ। আজ অবধি পৃথিবীকে কেউ এর চাইতে দামী কোনো কিছু দিতে পারেন নি এবং নবীজীর চাইতে অধিক অনুগ্রহও কেউ করতে পারেন নি।

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে অহংকার করা উচিত, আমাদেরই একজন মানুষ এই নিখিল ভুবনে মানবতার মাথা উঁচু করেছেন। আমাদেরই স্বজাতি এক আরব সন্তান গোটা মানব জাতির নাম আলোকিত করেছেন। তিনি যদি আগমন না করতেন তাহলে এ পৃথিবীর কি দশা হতো? আর আমরা মানব জাতির গর্ব-অহংকার করারই কোনো উপায় থাকত কি? নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মানব জাতির। তিনি এই পৃথিবীর এক চিরন্তন আলো, মানব জাতির অনন্ত গৌরব। তিনি বিশেষ কোনো জাতির নন, বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নন, বিশেষ কোনো দেশের সম্পদও নন তিনি। তিনি বরং সমগ্র মানবতার সম্পদ। বিশ্ব মানব জাতির হৃদয়ের ধন তিনি। আজ পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন নাগরিক অন্তত গর্ব আর অসীম আনন্দভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারে, আমি সেই মানুষ–যে মানুষরূপে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো ব্যক্তিত্ব এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

আজকের পৃথিবীতে এমন কোন মানবশ্রেণী আছে যাদের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুগ্রহ নেই। পুরুষের প্রতি কি তিনি অনুগ্রহ করেন নি? তিনি তাদেরকে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়েছেন। নারীদের প্রতিই বা তাঁর অনুগ্রহ কম কোথায়? তিনি নারীদের

অধিকারের কথা বলেছেন। তাদেরকে জীবন চলার পথ দেখিয়েছেন। তাদের জন্য অসিয়ত করে গেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়ে গেছেন, "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত।" দুর্বলদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ তো আরও স্পষ্ট, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ মযলুমের বদ্-দু'আকে ভয় কর। কারণ তার আর আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আমি ভাঙ্গা মনের কাছে থাকি।"

সবল ও শাসকের প্রতিও তাঁর অনুগ্রহ অসীম। তিনি ব্যবসার মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা বলেছেন, স্বয়ং তিনি ব্যবসা করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, করেছেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এক অনির্বচনীয় সম্মানে ভূষিত। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ সত্যবাদী আর দ্বীনদার ব্যবসায়ীরা জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবে।

অসহায় শ্রমিকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ

শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি দিয়ে দাও।

তাঁর অনুগ্রহ শুধু মানব পর্যন্তই সীমিত ছিল না, অবোধ পশু তাঁর অনুগ্রহের ছায়ায় আশ্রিত ছিল। তিনি ইরশাদ করেছেন, "যে কোন প্রাণীকে পানাহার করানো, আশ্রয় দেয়াই সদকা।" সমগ্র মানবগোষ্ঠীর প্রতিও তাঁর অনুগ্রহ অসামান্য। তিনি রাতের আঁধারে উঠে কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করতেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, প্রভু! তোমার সকল বান্দাই ভাই ভাই।"

সমগ্র পৃথিবীর প্রতি তাঁর অনুগ্রহ স্বল্প কোথায়! তিনিই তো সর্বপ্রথম ঘোষণা দিলেন ঃ আল্লাহ্ কোনো বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী কিংবা বিশেষ কোনো দেশের নন, বরং আল্লাহ্ সারা জাহানের ও সমগ্র মানবগোষ্ঠীর। যে পৃথিবীতে "আর্যদের খোদা, ইহুদীদের খোদা, মিসরীদের খোদা ও ইরানীদের খোদা" বলে আল্লাহকে সংকীর্ণ বলয়ে আবদ্ধ করে রাখত সেই পৃথিবীতেই তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর।"

অনন্তর এই ঘোষণাকে সালাতের অংশ হিসেবে নির্বাচন করলেন। এই পৃথিবীতে অনেক দার্শনিক এসেছেন, বিজ্ঞানী এসেছেন, কবি-সাহিত্যিক এসেছেন, যোদ্ধা, দেশ বিজেতা, রাজনীতিক নেতা, আবিষ্কারক কতজনই তো এসেছেন; কিন্তু নবীদের আগমনে পৃথিবীতে যে বসন্ত এসেছে তা কি অন্য কারো আগমনে এসেছে? অনন্তর সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনে পৃথিবীতে সৌভাগ্য, কল্যাণ, রহমত, বরকত, শান্তি ও মানবতার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে তা কি অন্য কারও আগমনে ঘটেছে?! ঘটে নি। কারণ মানবতাকে তিনি যা দিয়েছেন তা আর অন্য কেউ দিতে পারেন নি।

সর্বশেষ নবী ও তাঁর উম্মত

এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ! এর আদি-অন্ত সব কিছু সম্পর্কেই তিনি সম্যক ওয়াকেফহাল। এখানে তিনি যা চান কেবল তাই হয়। তাঁর মর্জির বাইরে গাছের একটি পাতারও নড়বার অবকাশ নেই। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধি-দূরদর্শিতা সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। তাই তাঁর দূরদর্শিতা নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সেই দূরদর্শিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত মাফিক তাঁর আদর্শ-মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলো। পেলবিত হলো পূর্ণাঙ্গতায় কামালিয়্যাতের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য বিভায়। আল্লাহর পয়গামের মহিমময় সন্দেশ নিয়ে এলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। পৌঁছে দিলেন মানুষের দ্বারে দ্বারে। হরফে হরফে পৌঁছে দিলেন প্রভু দয়াময়ের প্রতিটি ফরমান।

এ পথে তাঁকে মোকাবেলা করতে হয়েছে অভ্রভেদী প্রতিকূলতার। কিন্তু তিনি থমকে দাঁড়ান নি। ভড়কে যান নি। পিছু হটবার তো প্রশ্নই ওঠে না! তিনি বরং জিহাদের পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করেছেন। সবটুকু শক্তি ও সামর্থ্য ঢেলে দিয়ে বপন করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বীজ। রক্ত দিয়ে করেছেন সংগ্রামের বৃক্ষকে পল্লবিত। আর বলেছেন ঃ কিয়ামতাবধি বেঁচে থাকবে জিহাদের এই গাছ। সেই গাছের ছায়ায় এসে সমবেত হলো কিছু মানুষ। তাঁরাই তাঁর প্রথম উম্মত। অতঃপর তিনি অবিরাম ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে তুললেন এক অপূর্ব মানব কাফেলা—উম্মতে মুহাম্মদী। তাঁরা নবুওয়তী না পেয়েও নবুওয়তের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। ইসলামের দাওয়াত, ইসলামকে সব রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধনের হাত থেকে রক্ষা করে সর্বকালে, সকল স্থানে ইসলামের আলোকময় আদলে মানবতাকে ঢেলে সাজতে তাঁরা হলেন আদিষ্ট, এ মহান দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত।

এটা করুণাময়ের অনাদিকালের সিদ্ধান্ত ছিল, সর্বকালেই নবী-রাসূলের প্রতিনিধি থাকবেন। জ্ঞান ও পথ-নির্দেশের সমুজ্জ্বল মিনার সর্বকালেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দৃঢ়তা ও অবিচলতায় বলীয়ান এ কাফেলা মহাহিমাদ্রির মত অটল থাকবে সর্বযুগে। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে সর্বযুগের বাড়াবাড়ি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, আঁধারচারীদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, মূর্খদের অলীক বিশ্লেষণের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা ছিল আল্লাহ্ তাআলার পূর্ব সিদ্ধান্ত, সর্বশেষ উম্মতের আলোকিত তাকদীর। নবীজীর (সা.) ভাষায় এরই সুসংবাদ উচ্চারিত হয়েছে এভাবে—

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিজয়ী হবে তারাই।"

কিয়ামত পর্যন্ত তারা অবিচল থাকবে হকের ওপর। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কিছুই করতে পারবে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বশেষ নবী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হবেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। এটা মহান আল্লাহর অকাট্য সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের কথাও আল্লাহতাআলা জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্বময় মানবগোষ্ঠীকে। জানিয়ে দিয়েছেন, মানব জাতির উভয় জাহানের কল্যাণে ও সফলতার উৎস-বিন্দু ইসলামের শিক্ষা ও বিশ্বাসের ভিত্তি ওহীর দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। আর কোন নবীর আগমন হবে না এই মাটির বসুন্ধরায়। জিবরাঈল (আ.)-ও আর আসবেন না কোন মানবের দ্বারে ওহীর সন্দেশ নিয়ে। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বশেষ নবী। কিয়ামতাবধি সকল মানুষের নবী। আর তাঁর অনুগত উম্মত-ই সর্বশেষ উম্মত।

হ্যাঁ, অনেক সময় মানুষ আত্মিক সাধনা ও মুজাহাদায় ভর করে জয় করে নেয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনেক অজানা জগত। হৃদয় তাঁদের অদৃশ্য জ্ঞানের বিমলচ্ছটায় দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। ইলহামের ছোঁয়ায় অন্তর তাঁদের ভরে ওঠে অজানা ইলমের অপার্থিব সওদায়। অনেকে তো সাধনার চটে বসে 'গায়বী' আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায়। কিন্তু এর সাথে নবুওয়তের কোন সম্পর্ক নেই। নব্বী মানসাব ও মর্যাদার সাথে এর কোনই সূত্র নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে তো কাফের বেঈমানও এ ধরনের অদৃশ্য রাজ্য জয় করে বসে সাধনার শাবল চালিয়ে।

এই ঘোষণা আল্লাহর। স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন তিনি পবিত্র কোরআনে। ঘোষণার শব্দ ও ভঙ্গি সহজ ও পরিষ্কার। সেখানে সন্দেহ কিংবা ভিন্ন ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। একমাত্র বক্র স্বভাব ও সুযোগ-সন্ধানী জন ছাড়া আর কেউ তাতে সন্দেহ করেনি। সন্দেহ করার সাহস দেখায় নি। কিন্তু অন্তর-রোগীদের পথ-ই ভিন্ন। তারা সুস্থ মানুষের সাথে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ।

সর্বশেষ নবীর গুণাবলী

পবিত্র কোরআনে নবুওয়ত ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রত্যয় ভাষ্যে বলা হয়েছে, তিনিই 'সর্বশেষ' নবী। অধিকন্তু তাঁর পর আর কোন নবী আসার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা হয়েছে সরল ছন্দে। 'নবীজীর পর আর কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই'—এ কথাটি এমন শিল্পময় ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, যা যে কোন সুস্থ বিবেকবান পাঠককে সহজেই আন্দোলিত করবে, প্রভাবিত করবে, করবে দৃঢ় বিশ্বাসে সমর্পিত। অধিকন্তু পাঠকের সামনে মূর্তিমান হয়ে উঠবে প্রিয় নবীজীর অনুসরণীয় অতুলনীয় জীবন্ত ব্যক্তিত্ব, যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের উপমাহীন রাহবর—পথপ্রদর্শক।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসূল। নবীদের মোহর (সর্বশেষ নবী) ও আল্লাহতাআলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" (আহযাব) পবিত্র কোরআন ইসলাম ও রাসূল (সা.)-এর এক জীবন্ত মুজিযা। আলোচ্য আয়াতের শেষ অংশটি 'আল্লাহ পথ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত' সেই মুজিযারই দীপ্ত প্রমাণ। কারণ এখানে যখন ঘোষণা দেয়া হয়েছে, রাসূল (সা.) সর্বশেষ নবী, তখন কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ঃ একজন নবী কি করে কিয়ামতাবধি সকলের জন্যে আদর্শ হবেন? কি করে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন যুগের মানবগোষ্ঠীকে পথ দেখাবেন? তাঁর আনীত শিক্ষা ও শরীয়ত কি করে সমগ্র মানব জাতির প্রয়োজন পূরণ করবে, জীবন জিজ্ঞাসার জবাব দেবে? পরিবর্তনশীল এই মানব বিশ্বে শত বিবর্তনে একই আলো কিভাবে পথ দেখাবে এ মানবগোষ্ঠীকে যুগ-যুগান্তর? এ সকল প্রশ্নের জবাব-ই দেয়া হয়েছে আয়াতের এই ক্ষুদ্র অংশে। আল্লাহ্ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন ঃ তোমার মনে যত রকমের যত প্রশ্নই জাগুক, আল্লাহ্ সবই জানেন, পূর্ব থেকেই তিনি অবগত তোমার এই সুপ্ত প্রশ্ন সম্পর্কে।'

সর্বশেষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে আরব সমাজে। কোরআনও অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরই ভাষায়। এজন্যে "শেষ নবী"র সংবাদটিও পরিবেশিত হয়েছে তাদেরই ভাষারীতির কলা-কৌশল মাফিক। কারণ তাঁরাই কোরআনের প্রথম সম্বোধিত মানব কাফেলা। ইসলামের প্রথম কাতারের সৈনিক তাঁরাই। তাঁরাই পরবর্তীকালের মানব কাফেলার কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন, তুলে ধরবেন আল-কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ। আর একথাও সত্য, আরবী ভাষা একটি বর্ণাঢ্য, ব্যাপক ও বিস্তৃত ভাষা। মনের ভাব বিকাশের সমুদয় উপাদান শিল্পরসে আপ্লুত হয়ে বেঁচে আছে এই ভাষায়। সাথে সাথে 'শেষ' কথাটি বোঝাবার জন্যে 'খাতাম' (মোহর) শব্দটির চাইতে সুন্দর ও উপযুক্ত শব্দও আরবী সাহিত্যে নেই। আরবদের বোল-চাল, ভাব বিনিময়ের বিভিন্ন কলা-কৌশলে 'শেষ' বোঝাবার ক্ষেত্রে এই শব্দটিই সর্বোচ্চ যথার্থ ও সংগত শব্দ বলে বিবেচনা করা হয়। আরবরা তাদের কথাবার্তা, গল্প-কবিতায় সর্বশেষ কথাটি বোঝাবার জন্যে এই শব্দটি অহরহ ব্যবহার করে থাকে। তাই তাদের ভাষায় অবতীর্ণ কোরআনে তাদের মুখের কথাটি কেড়ে নিয়েই বলা হয়েছে, "তিনি (সা.) নবীগণের খাতাম, তিনি সর্বশেষ নবী।"

অধিকন্তু পবিত্র কোরআনে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর এমন সব গুণ আলোচিত হয়েছে ওহীয়ে ইলাহীর ভাষায় যার প্রতিটি গুণ স্পষ্ট বলে দেল তিনিই সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেণীর মানবগোষ্ঠীর জন্যে সর্বশেষ রাসূল–সকলের জন্যে তিনি এক উপমাময় আদর্শ—সর্বোত্তম নমুনা। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, কিয়ামত প্রতিষ্ঠায় আশাবাদী, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে বেশী বেশী, তার জন্যে আল্লাহর নবীর আনুগত্যটাই ভাল।" [আহযাব ঃ ২১]

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" [সূরা আল ইমরান-৩১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী এক উজ্জ্বল প্রদীপ।" [সূরা আহযাব ঃ ৪৫]

এটা তো সকলেই জানে, আল্লাহ্তাআলা অতীত ও ভবিষ্যত সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞানের পরিধি অসীম—অনন্ত। দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জানাও অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা এ কথাও জানি, একজন বুদ্ধিমান ও পথিকৃৎ কবি-সাহিত্যিক ও এমন কোন রাজ্যাধিপতির প্রশংসায় কালি ব্যয় করতে প্রস্তুত নন, যে রাজা খুব শীঘ্রই পদচ্যুত হবেন, যে রাজা অচিরেই তাজ-তখ্ত হারিয়ে নিক্ষিপ্ত হবেন সাধারণ জনতার কাতারে অথবা একজন অভিজ্ঞ হেকিম কিংবা কোন বিজ্ঞজনের কথাই ধরুন যিনি জানেন, সদ্যোপ্রসূত এই সন্তানটি বেশী সময় বাঁচবে না। বিজ্ঞজনরা কি এই শিশুর প্রশংসায় বাক্য ব্যয় করবেন? করবেন না। কোন জ্ঞানী বুদ্ধিমানই একান্ত ক্ষণস্থায়ী কিছুর প্রশংসা করেন না।

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর জীবন ও শিক্ষা, সে তো সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে এক বিস্ময়কর আদর্শ। সকল যুগের সকল পেশার সকল দেশের মানুষের জন্যে তিনি এক অনুপম আদর্শ—অনিন্দ্য নমুনা। তাই তাঁর

জীবন-সৌন্দর্য, সুবাসিত চরিত্রমাধুরী, অলংকৃত–অম্লান শারীরিক গঠন, আচার-আচরণ, স্বভাব-সভ্যতা সবই আ-কিয়ামত সকল মানুষের এক চিরন্তন সম্পদ, অব্যর্থ দিক নির্দেশক। তাই তার সংরক্ষণ, প্রচার ও ধারণ ছিল এক অপরিহার্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনে বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের বিবেকসিদ্ধ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সকল প্রথিতযশা সাহিত্যিক-কবিদের বেঁচে থাকার অমরত্ব লাভের প্রয়োজন—শ্রেষ্ঠতম সোপান। তাই কুদরতে ইলাহী-ই নিবিষ্ট হয়েছে এই মহান প্রয়োজনের প্রতি, অলৌকিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে নবী-জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিন্দুবিসর্গ। সর্বকালেই মুসলিম উম্মাহ'র একটি নির্বাচিত কাফেলা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন এই মহান ব্রতকে। তাঁরা নবী-জীবনের প্রতিটি উচ্চারণ, প্রতিটি কর্ম, অভ্যাস, নীরবতা, সমর্থনপুষ্ট কর্মমালা, এমন কি তাঁর শারীরিক গঠন-সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিবরণ ডুবুরীর সঞ্চিত মণি-মুক্তার মত সংরক্ষণ করেছে তারা জীবনের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে। এ পথে তাঁরা সয়েছেন দীর্ঘ সফরের লাগাতার ক্লান্তি, বরং এই এক স্বপ্নই যেন তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রাখত!

এ বিষয়ে তাদের যত্ন ও সতর্ক সাধনার পরিধি অনুমান করা যায় হাদীস ও সীরাত গ্রন্থগুলোর বর্ণনাসম্ভার থেকে। সাহিত্য, ইতিহাস ও সাধারণ জীবনীকারদের বিস্তৃত ভাণ্ডার মন্থন করে এর তুলনা পাওয়া যাবে না। এ এক অতুলনীয় অধ্যায়!

প্রিয় নবীজীর (সা.) হাদীসভাণ্ডারকে আমরা এক রকমের রোজনামচাও বলতে পারি। নবীজীর তেইশ বছরের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হাদীসভাণ্ডার। নবুওয়তপ্রাপ্তির পর নবীজীর চিরভাস্বর জীবন যাপন পদ্ধতির এক বিশ্বস্ত রেকর্ড বুক হাদীসগ্রন্থগুলো। হাদীস শরীফের এই পবিত্র ভাণ্ডার আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সাথে বলে দেয় তিনি (সা.) কিভাবে জীবন যাপন করতেন, কিভাবে কাটত তাঁর রাত-দিন! হাদীসে রাসূল অত্যন্ত যত্নের সাথে ধারণ করে আছে কীভাবে কথা বলতেন তিনি, মানুষের সাথে তাঁর ব্যবহার কেমন হতো! তাঁর আখলাক ও স্বভাবের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়গুলো স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে অমর হাদীসের ভাষ্যে। তাঁর অভ্যাস, স্বভাব, আবেগ-আমোদ সব কিছুই অম্লান এখানে। হাদীসের পাতা খুলে একজন মুমিন মুসলমান তার নবীকে এমনভাবে জানতে পারে যেন সে নবীজীকে দেখছে, লক্ষ্য করছে, তাঁর ওঠা-বসা, কথকতা–নীরবতা; যেন গভীর ভাবাবেগে প্রত্যক্ষ করছে তাঁর কোমল-স্নিগ্ধ অপরূপ দেহ-সৌন্দর্য, চাঁদের আলোকিত সুন্দরের ফোয়ারাও যেন সেই সুন্দরের কল্যাণময় ধারা থেকেই উৎসারিত, অথচ তার বিপরীতে আমরা আমাদের নিকট কালের কত পরিচিত মুখকে হারিয়ে ফেলি! কত মহান মনীষী সম্পর্কে জানতে চাই! কিন্তু সময়ের সংক্ষিপ্ত ব্যবধানের কারণে আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারি না।

নবী-জীবনের শিক্ষা ও আদর্শ সংরক্ষণের সমুদয় উপায়, চিত্র ও মূর্তির বলয়ে সংরক্ষিত ইতিহাসের সকল দুর্বলতা ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ অতীত কালের উম্মতেরা তাদের নবী-রাসূলের স্মরণে প্রথমে ছবি ও মূর্তি নির্মাণ করেছিল। কালক্রমে সেই মূর্তিই পূজনীয় বলে গৃহীত হয়েছে। তারা হারিয়ে গেছে প্রতিমা ভজনের অন্ধকারে।

হাদীসের এই মহান ভাণ্ডার সিঞ্চন করে মুসলমান মনীষিগণ যুগে যুগে সংকলন করেছেন অনেক অমর গ্রন্থ, যা তাদের পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি হিসেবে নিবেদিত হয়েছে। জীবনের বাঁকে বাঁকে দিয়েছে সত্য পথের দিশা। এ বিষয়ে রচিত ও সংকলিত গ্রন্থের পরিসংখ্যান পেশ করাও আমাদের জন্য অসম্ভব। মুসলিম বিশ্বের সকল সভ্য ভাষায়-ই সীরাত চর্চা হয়েছে; নবীজীর হাদীসভিত্তিক গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইবনে তায়মিয়ার বিশিষ্ট শিষ্য, এই উম্মতের এক ক্ষণজন্মা পথিকৃৎ আল্লামা ইবনে কায়্যিমের 'যাদুল মাআদ' বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্মরণযোগ্য।

এটা আল্লাহতাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও হিকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত; নইলে আমাদের রাসূলের (সা.) জীবনী আমাদের কাছে স্পষ্ট, অনুসরণযোগ্য ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিক নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত, অথচ পাশাপাশি অন্যান্য নবীর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের জীবন আকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মূর্খতা, অসতর্কতা আর অস্পষ্টতা, বরং বলা যায়, বটের ঝুড়ি যেভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ অট্টালিকার অস্তিত্ব ঢেকে ফেলে, তেমনি এসব মূর্খতা আর অসতর্কতা তাঁদের জীবন-সৌন্দর্যকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে—নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে। তাঁরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে। তাঁরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আল্লাহর দীন প্রচার করেছেন। সত্য ও সুন্দরের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। যথাসময়ে চলে গেছেন মহান মাওলার সান্নিধ্যে। তাই তাঁদের জীবন ও শিক্ষা পরবর্তীকালে আর সংরক্ষিত থাকেনি। সংরক্ষিত থাকেনি সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল না বলেই।

এই বিষয়টি প্রমাণের জন্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনীই যথেষ্ট। তাঁর আবির্ভাব আমাদের প্রিয় নবীর পূর্বে। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে। আর তাঁর অনুসারীরা পৃথিবীর এমন একটি জাতি যারা শিক্ষা, গবেষণা, রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম জাতি হিসেবে পরিচিত, বরং এ ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। পাশাপাশি তাদের নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাদের প্রেম ও ভালবাসা তো রীতিমত সীমা ছিঁড়ে ফেলেছে স্বয়ং হযরত ঈসা নবীর (আ.) আমলেই। ভক্তির আতিশয্যে তারা তাঁকে মানুষের আসন থেকে তুলে এনে সৃষ্টিকর্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবীকে বানিয়েছে খোদা।

অথচ এই ভক্ত-অনুরক্তরাই যখন হযরত ঈসা (আ.)–এর জীবনী পরিবেশন করতে চায়, তখন তারা খুব সংক্ষিপ্ত তথ্যই নিবেদন করতে পারে। তারা বরং কিছু চিত্র তুলে ধরতে পারে—পারে কিছু বিচ্ছিন্ন কাহিনী পরিবেশন করতে। এসব চিত্র-কাহিনী দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর পবিত্র জীবনের ছবি আঁকা যায় না। আদর্শ কোন মডেল হিসেবে তুলে ধরা যায় না। কিছুদিন পূর্বেও খৃস্টানরা মনে করত ইন্‌জীলে হযরত ঈসা (আ.)-এর শেষ তিন বছরের ঘটনাগুলো সংরক্ষিত আছে। কিন্তু এখন গবেষকরা বলছেন, "ইন্‌জীলে হযরত ঈসার পঞ্চাশ দিনের বেশী তথ্য নেই।" অর্থাৎ তিন বছর নয়, মাত্র পঞ্চাশ দিনের জীবনধারা সংরক্ষিত আছে–তাও কেবল তাদের দাবী মতে।

অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও অন্যান্য ধর্মের রাহনুমা ও পথ-প্রদর্শকের বেলায়ও একথা পরিষ্কার করেই বলা যায়, তাদের জীবনবিভাও হারিয়ে গেছে অতীতের কালো মেঘে। যেসব কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একজন পথনির্দেশকের জীবন দাঁড়াতে পারে, সেই সব উপাদান এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এটা একটা প্রাগৈতিহাসিক সত্যও বটে—দেখা গেছে সময়ের একটি নির্ধারিত বয়স আছে। সেটা অতিক্রান্ত হবার পর নতুন একটি সময়—একটি যুগের আবির্ভাব হয়। অতীত হয় একটি সময়—একটি যুগ। সেই অতিক্রান্ত সময় ও যুগের সাথে সেই যুগের শিক্ষা ও অবদানও হারিয়ে যায়। অন্তত তার আর কার্যক্ষমতা ও প্রভাব ফেলার শক্তি থাকে না। ফলে সেই সভ্যতা, সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মানুষ আর হাত দেয় না। অনাদরে ক্ষয় হয়ে যায় ধীরে ধীরে। আর যদি সেই শিক্ষা, সভ্যতা ও দর্শনের প্রয়োজন, প্রভাব ও কার্যকারিতা বহাল থাকে, তাহলে যুগ-যুগান্তরের শত উত্থান, শত বিপ্লব ও শত পরিবর্তনের হিমাদ্রি পাড়ি দিয়ে যুগের পর যুগ তা মানব সভ্যতাকে নেতৃত্বে দেয়, পরিচালিত করে এক ছন্দময় সুশৃঙ্খল গতিতে। অধিকন্তু মানুষের হৃদয়রাজ্যে তার প্রতিটি চিহ্ন ভাস্বর হয়ে থাকে সদা জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত এক কালোত্তীর্ণ জীবন আদর্শ হিসেবে। অনন্তর এই জীবনাদর্শ সকল লয়-ক্ষয় আর বিকৃতির নিরন্তর বাধা-বিপত্তি সবেগে পরাজিত-প্লাবিত করে এগিয়ে চলে এক মহাঅনন্তের দিকে।

এরই প্রেক্ষিতে যদি কোন বিবেকবান পাঠক পবিত্র কোরআনের সূরা হুজুরাত, আহযাব, তাহরীম ও আল-মুজাদালায় বর্ণিত নির্দেশনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন বিধানগুলো মনোযোগসহকারে পাঠ করে, যা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে–অধিকন্তু সূরা আল-ফাত্‌হ, আদ্‌-দোহা ও আল-ইনশিরাহ-য় বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা'র অনুপম অনুগ্রহ, তাঁর দীপ্তিময় বৈশিষ্ট্যমালা যদি প্রাণ খুলে অধ্যয়ন করে, তাহলে নিঃশঙ্ক

চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হবে, নিশ্চয়ই তিনি এমন এক পয়গম্বর, যিনি সকল যুগ, সকল প্রজন্ম ও সমগ্র জাহানের জন্যে প্রযোজ্য, যাঁর হিদায়াতের আলোকময় অস্তিত্বে কখনো গ্রহণ লাগতে পারে না, যাঁর উন্নতির জোয়ারে কখনো ভাটা পড়ে না, যাঁর উন্নতির নক্ষত্র কখনো পতিত হয় না, স্খলিত হয় না।

এতে কোন সন্দেহ নেই, আজ যদি নতুন কোন নবীর আবির্ভাব হয়, চাই সে নবী নতুন শরীয়তপ্রাপ্ত হোক বা না হোক, তার এই আবির্ভাব-ই রাসূল (সা.) সম্পর্কে অবতীর্ণসমূহ ইলাহী প্রশংসা, আলোকময় বৈশিষ্ট্যমালার স্পষ্ট বিরোধী, পরিষ্কার সংঘাতময়। নতুন নবীর আবির্ভাব মানেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে উম্মতের চিরন্তন শাশ্বত সুদৃঢ় সম্পর্কের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়া। কোন নতুন নবীর আবির্ভাবই প্রিয় নবীজীর অনুপম চরিত্র মাধুরী, তাঁর হাতে গড়া সোনালী কাফেলা হাযরাতে সাহাবায়ে কেরাম, আহ্‌লে বাইত, তাঁর জন্মভূমি ও হিজরতভূমির সাথে মুসলিম উম্মাহ'র চিরন্তন বন্ধনকে করবে দুর্বল, করবে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ নবীজীর পর যদি নতুন কোন নবীর আবির্ভাব হয়, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় নবীজীর সম্মানিত উম্মত আর এই নতুন নবীর (?) উম্মতের মাঝে সৃষ্টি হবে এক বিভেদ প্রাচীর, গড়ে উঠবে এক বিস্তর ব্যবধান। কল্পিত সেই উম্মত আমাদের নবীর সূত্রে গ্রন্থিত হবার মহান গৌরব থেকে বঞ্চিত হবে, বরং নবীজীর সাথে তাদের কোন দূরবর্তী সম্পর্কও থাকবে না এবং এটা প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও নীতি-দর্শনেরও কথা। "আল্লাহ্ তাআলা কোন মানুষকেই দুটো অন্তর দেননি।" চিরন্তন এই আইন ও দর্শনের আলোকেই পৃথিবীর কোন বিবেকবান, মানুষের মন-মানস ও বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত কোন ব্যক্তি যিনি অতীতকালের ধর্ম ও মিল্লাত সম্পর্কেও গভীর অধ্যবসায় ও বিস্তৃত ধারণা রাখেন, তিনি অবশ্যই বলবেন ঃ পৃথিবীতে যখনই কোন নতুন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, তখনই তাঁর অনুসারী উম্মত ও পূর্ববর্তী নবীর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তপ্ত লড়াই, দুর্ভেদ্য সংঘাত–ভেঙ্গে পড়েছে চিরপ্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্বের সকল ভিত। এটা একটা শাশ্বত বিধান। এই সংঘাতও অনিবার্য।

এটা পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের স্পষ্ট দাবী, প্রিয় নবীজীর পবিত্র সত্তা মুমিনদের কাছে পৃথিবীর সকল কিছু, এমন কি তাদের স্বীয় জীবনের চাইতেও অধিক প্রিয়, অধিক মূল্যবান। পৃথিবীকে সকল মুমিন বান্দা প্রিয় নবীজীকে তাদের জান-মাল সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়; উৎসর্গ করে দেয় তাঁর তরে জীবন-মরণ সব কিছু। এর উপমা অনেক।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার কাছে আমার সত্তা, তাঁর জীবন, জনক, আত্মজ ও সকল মানুষের চাইতে প্রিয় মনে না হবে। (বুখারী, মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلنَّبِيُّ اَوْ لٰى بِالْمُؤْ مِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ
اُمَّهٰتُهُمْ ط وَاُولُوالْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ
كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى
اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ـ

"মুমিনদের কাছে নবীগণের অধিকার তাদের স্বীয় জীবনের চাইতে বেশী আর নবীগণের সহধর্মিণীরা হলেন মুমিনদের জননী।" (আল-আহযাব)

বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন নতুন নবীর আবির্ভাব, অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ভালবাসার এই আলোকময় ঐক্যকে ভেঙ্গেচুরে খান খান করে দেবে; প্রিয়তমের পাশে এনে দাঁড় করাবে আরেক অংশীদার–ভালবাসার প্রার্থী। পৃথিবীর কোন প্রেমিকই এই অংশীদারিত্বকে স্বীকার করতে পারে না, মেনে নিতে পারে না । এটাই প্রাগৈতিহাসিক বাস্তবতা, এক অলৌকিক সত্য কথা।

পবিত্র কোরআনের আরেকটি স্বতন্ত্র উপস্থাপন ভঙ্গি আছে যে ভঙ্গি কথা বলে অতি গভীর থেকে। বর্ণনার এ রীতিও প্রিয় নবীজীর বিশ্বজনীন রিসালাত ও শাশ্বত শরীয়তের পরিচয় বিধানে ব্যবহৃত হয়েছে বার বার। স্পষ্ট, নিঃশংক ও দ্বিধাহীন এই উচ্চারণগুলো অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র আরবী ভাষায়। সে ভাষায় কোন মার-প্যাঁচ নেই, আছে স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা আর ভাবের বলিষ্ঠতা। পবিত্র ওহীর ওই আলোকময় ভঙ্গিতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা, মানবীয় প্রয়োজন-প্রত্যাশার পরিপূর্ণতার কথা। মানবগোষ্ঠী তার উন্নতির শিখর স্পর্শ করেছে, আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে গেছে তাঁর শীর্ষ মনযিলে—প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ সোপানে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ...
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .....

"আমি আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম; তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আর ইসলামকে মনোনীত করলাম তোমাদের দ্বীন হিসাবে।" [মায়িদা ঃ ৩]

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে দশম হিজরীতে। অবতীর্ণ হয়েছে আরাফার ময়দানে বিদায় হজ্জের মওসুমে। বিভিন্ন হাদীস সূত্রে প্রমাণিত হয়, এরপর আর হালাল-হারাম সম্পর্কিত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। এই আয়াত নাযিল হবার

পর নবীজী (সা.) এই নশ্বর দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলেন মাত্র একাশি দিন। বিশিষ্ট সাহাবীগণ যাঁরা নবীজীর সঙ্গ লাভে ছিলেন সদা অগ্রণী, তাঁর প্রতি প্রেম-ভালবাসা, তাঁর মিশন ও আদর্শের প্রতি ছিলেন সদা নিবেদিত-উৎসর্গীকৃত প্রাণ, হযরত আবূ বকর আর হযরত উমর (রা.) যে কাফেলার প্রথম সারির স্বর্ণসত্তা, তাঁরা এই আয়াত নাযিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান করেছিলেন, নবীজী আর বেশি দিন থাকবেন না এই বিনাশী পৃথিবীতে। পরম প্রিয় বন্ধুর কাছে চলে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে তার কারণ, উম্মতের প্রতি, বিশ্ব মানবতার প্রতি—যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্যে ছিল তাঁর আভাদীপ্ত আবির্ভাব, সে পয়গাম যখন পূর্ণাঙ্গতার শীর্ষ বিন্দু ছুঁয়ে ফেলেছে, তখন আর তিনি থাকবেন কেন এই ধ্বংসালয়ে! তাঁর নিয়ামতের ধারা যখন সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করেছে, তখন আর তিনি এই দুঃখের দুনিয়ায় পড়ে থাকবেন কোন্ প্রয়োজনে? তিনি থাকবেন না। তিনি চলে যাবেন। চলে যাবেন পরম প্রিয় বন্ধুর সকাশে। এ কথা ভাবতেই কেঁদে ফেলেছিলেন কোন কোন সাহাবী! আবার কোন কোন সাহাবী বলেছিলেন ঃ দ্বীন যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, নিয়ামত যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে, তখন কিয়ামতের আর বেশি বাকী নেই! প্রলয় তাহলে ঘনিয়ে এসেছে! কোন কোন বিচক্ষণ ইহুদী আলেম বলেছে ঃ এই আয়াতটি মুসলমানদের জন্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের স্মারক। অবশ্য এটা ইসলামের জন্যেও একটি অনন্য-লা শারীক বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোন ধর্মের ভাগে জোটে নি। সে আরো বলেছিল ঃ যে দ্বীনের প্রতি এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সে দ্বীন চিরন্তন হয়ে থাকবে। মুসলমানদের উচিত এর প্রতি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

স্বয়ং রাসূল (সা.)-ও এই মর্মই উপলব্ধি করেছিলেন—যাঁর প্রতি এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই লক্ষাধিক সাহাবীর জনাকীর্ণ সম্মেলনে যখন চাতকের মত অপলক তাকিয়ে আছে প্রতিটি প্রাণ হৃদয়ের সব ক'টি কপাট খুলে দিয়ে, তখনই তিনি গুরু গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ঃ

"হে লোক সকল! আমার পরও আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না; আবির্ভাব হবে না তোমাদের পরেও আর কোন উম্মতের। মনে রেখো, স্বীয় প্রভুর ইবাদতে মগ্ন থেকো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি আদায় করো, রমযান মাসে রোযা রেখো, আনন্দ চিত্তে যাকাত দিও, শাসকের কথা মেনে চলো। যদি এই কথাগুলো মেনে চলো, তাহলে স্বীয় প্রভুর বেহেশতে স্থান পাবে।"

অনুরূপভাবে পবিত্র ইসলামের অবিনাশী মর্যাদা, অক্ষয়তা, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, কবুলিয়্যাত-গ্রহণযোগ্যতারও স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে আল কোরআন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন যাতে একে সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতার ওপর আল্লাহ্ যথেষ্ট।"
[সূরা আল-ফাত্হ]

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

"তিনিই তো সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে তোলেন যদিও তা মুশরিকদের কাছে অপছন্দ।" [সূরা তুস-সাফ ঃ ৯]

এ সকল পবিত্র ভাষ্য এ কথাই ঘোষণা করছে, ইসলাম আল্লাহতাআলার সর্বশেষ দ্বীন। ইসলাম সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেণীর সকল মানুষের এক অবিসংবাদিত প্রয়োজন। অধিকন্তু এ সুবাদে আল্লাহ্ তাঁর অমোঘ অভিপ্রায় অবশ্যই পূরণ করবেন চাই মানুষ তা পছন্দ করুক অথবা অপছন্দ করুক। ইসলামের শত্রু ও বিপক্ষ শক্তি চাই সন্ধি করুক অথবা লড়াই করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ এ সংবাদ কোরআনের! যে কোরআনকে কোন বাতিল, কোন পরিবর্তন, কোন ক্ষয় কখনও স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং পবিত্র কোরআনের এই শাণিত চ্যালেঞ্জ, দুর্বার ঘোষণাকে পরাজিত পরাভূত করে নতুন নবীর আবির্ভাবকে কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না এবং নতুন নবীর আবির্ভাবের কোন প্রয়োজনও নেই।

ইসলামপূর্ব যুগের ধর্মগুলোতে বিশ্বজনীনতা ছিল না, ছিল না পৃথিবীময় ব্যাপ্তির ছোঁয়া এবং সে সব ধর্ম ছিল বিশেষ কোন গোত্র অথবা বিশেষ কোন এলাকার সাথেই সম্পৃক্ত। এর বাইরে তার কোন আবেদন ছিল না। নির্দিষ্ট কালের পর আর ক্ষমতা ছিল না সেই মাযহাবের গতি প্রবাহের, বরং তাতে কুদরতীভাবেই সমাপ্তির পর্দা পড়ে যেত।

এই যেমন ইহুদী ধর্ম। এটা কোনকালেই সমগ্র মানবের জন্যে ছিল না। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের কোথাও এ কথা নেই, এই পয়গাম সমুদয় মানবগোষ্ঠীর তরে, বরং বিভিন্ন ভাষ্যে তাকে বিশ্বময় সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে

নিষেধ করা হয়েছে। ইহুদীদের বাইরে আর কাউকে আহ্বান জানানো হয়নি এই ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে, বরং আহ্বান করা হয়েছে সীমাবদ্ধতা বজায় রাখতে যার অনিবার্য ফল এটাই ছিল, ইসরাঈল আর অনৈসরাঈলের মধ্যে বিরাট ফারাক গড়ে উঠবে। উঠেছেও তাই। গড়ে উঠেছে ভাল-মন্দের মাপ-জোকের বিভিন্ন ভিত্তি, যে ভিত্তি সময় ও প্রজন্মের পরিবর্তনের সাথে সাথে রীতিমত পরিবর্তিত হতে থাকে।

আপনি ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ খুলুন। পড়ুন। মনে হবে সে এক ইহুদীদের শাহ্নামা অথবা মনে হবে তাদের বংশকাহিনী। সেখানে আত্মার খোরাক নেই। চারিত্রিক শিক্ষা, উন্নত স্বভাব, মানবিক সাম্য, পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ, মমত্ববোধ, বিনয়, বিসর্জন, তুষ্টি ও আত্মশুদ্ধির প্রতি কোন আহ্বান নেই, আবেদন নেই। নেই বেহেশতী নেয়ামতের আশায় পার্থিব সুখ-বিলাসকে উৎসর্গ করার কোন স্পষ্ট পয়গাম। সেখানে জাহান্নামের দুর্বিষহ শাস্তি সম্পর্কে কোন ভয়-ভীতি নেই। নেই এমন কোন ধর্মকথা যার পরশে হৃদয় গলে যায়, আত্মা হয়ে ওঠে পবিত্র-পরিশুদ্ধ। একজন অইহুদী পাঠক তাদের সেই ধর্মগ্রন্থ পড়ে নিজের ভেতর কোন মর্যাদাবোধ কিংবা দায়িত্ববোধের জাগৃতি পাবে না, বরং সেই গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে সে লক্ষ্য করবে 'এই গ্রন্থ একান্তই ইহুদীদের। তাদের জন্যে রচিত। তাদের জীবনালেখ্যকে কেন্দ্র করেই ঘূর্ণায়মান এর প্রতিটি উচ্চারণ।'

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত—তাও সেই বনী ইসরাঈলের জন্যেই সীমিত। তিনি নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ঃ বনী ইসরাঈলের হৃত সম্পদ উদ্ধারকল্পেই তাঁর আবির্ভাব। তাই তাঁর রিসালাত, তাঁর যুগ, এলাকা ও বনী ইসরাঈলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি তাঁর বারজন সহচরকে যখন তাবলীগ করতে পাঠান, তখনও তাঁদেরকে একথাই বলে পাঠিয়েছিলেন ঃ

'বনী ইসরাঈল ছাড়া আর কারও কাছে যাবে না। সামেরীদের কোন শহরে প্রবেশ করবে না।'

তাছাড়া পশ্চিমা রাজ্য ও এশিয়ার ধর্মগুলোরও সেই একই দশা। হিন্দু ধর্মের দর্শনও এ থেকে আলাদা নয়, বরং আরও বেশী অদ্ভুত রকমের। তাদের ধর্মে আরিয়া সমাজ আর ব্রাহ্মণ জাতি ছাড়া অন্যদেরকে অপবিত্র, অচ্ছুত ও অস্পৃশ্য মনে করা হয়, বরং তারা চতুষ্পদ প্রাণীর মত। তাদের সাথে কখনো কখনো কুকুরের মত আচরণ করা হতো।

অতীতকালের ধর্ম-দর্শনের এই গণ্ডিবদ্ধতা ও সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে অধিকন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত ও অপার হিকমতের চাহিদাও ছিল এমন একজন নবীর আবির্ভাব—যে নবীর শিক্ষা, শরীয়ত ও আইন হবে বিশ্বময় সকল

মানুষের। সে শিক্ষা ও আইন হবে অনাগত বিশ্বের সকল গ্রন্থি উন্মোচনে সমান কার্যকর। বিবর্তিত সমাজ ও সময়ের সকল চাহিদা পূরণে যে আইন ও শরীয়ত দ্ব্যর্থহীন ভূমিকা পালন করবে। কারণ পূর্বকালের আসমানী গ্রন্থগুলো আরামপ্রিয় আত্মপূজারী শাসকদের পরশে এমন এক বন্ধনহীন উন্মুক্ত মাঠে রূপান্তরিত হয়েছিল, যাকে কেবল রিপু ও প্রবৃত্তির স্বপ্ন পূরণের দীপ্ত গাইড-বুক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অনুরূপভাবে কিছু প্রান্তিকতাপ্রিয় বাড়াবাড়ির শিকার আবেদদের সীমানাভেদী মানসিকতার কারণেও এসব ধর্মগ্রন্থ হয়ে পড়েছে আমলের অনুপযুক্ত, জীবনবিমুখ শাস্ত্রমাত্র যে গ্রন্থ মানতে গেলে একজন মানুষ তার বৈধ চাহিদাকেও পূরণ করতে পারে না। আর এই অবস্থা থেকে মুক্তি ও উত্তরণের জন্যেই তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে নতুন নবীর আবির্ভাব। হযরত ঈসা (আ.) এ মর্মেই বলেছেন–কুরআনের ভাষায় ঃ

"আমার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতকে সত্যায়ন করি আর আমার আবির্ভাব এ জন্যেও যে, তোমাদের জন্যে হারাম করে রাখা কতিপয় বিষয়কে আমি হালাল করব। তাছাড়া আমি তো তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়েই এসেছি। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল।" [আল-ইমরান]

"যে সব কারণে নবীর আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে, তার প্রধান দুটি কারণ রহিত করে দিয়েছে কোরআন। ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে "এই ইসলাম, এই মুহাম্মদী পয়গাম সমগ্র বিশ্বের তরে, এটা বিশ্বজনীন দাওয়াত। এই দাওয়াত পৃথিবীর সকল শ্রেণীর জন্যে।"

এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ -

"হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সকলের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি যিনি আসমান-যমীনের বাদশাহ! তাঁকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। জীবন-মরণের তিনিই মালিক।" [আল-আ'রাফ ঃ ১৫৮]

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

"হে মুহাম্মদ! আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শক করে পাঠিয়েছি। তবে অধিকাংশ লোকই এটা বোঝে না।" [সাবা ঃ ২৮]

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

"হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে নিখিল বিশ্বের রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।" [আল-আম্বিয়া ঃ ১০৭]

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ ـ

"বড় বরকতময় সেই প্রভু যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন যাতে তিনি জ্ঞানীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন।" [আল-ফুরকান ঃ ১]

এসব আয়াত থেকে এ কথাই প্রতিভাত হয়ে ওঠে, পবিত্র ইসলাম বিশ্ব মানবের সম্পদ। পৃথিবীর সকল জাতি, সম্প্রদায়, প্রজন্ম ও সমুদয় মানবগোষ্ঠীর জন্যে এক যৌথ সম্পদ, একান্নভুক্ত ওয়ারিস। এখানে ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, ব্রাহ্মণের কোন বিভেদ নেই, এখানে এক জাতির ওপর অন্য জাতির প্রাধান্য নেই, এক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব নেই অন্য প্রজন্মের ওপর। এ ক্ষেত্রে সকলেই সমান; সকলেই অধিবাসী একই বৃত্তের। এখানে বংশ-বর্ণের কোন বালাই নেই। এখানে বরং সত্যের প্রতি আকর্ষণ-আগ্রহ, সত্য গ্রহণে প্রতিযোগিতা, সত্যের মূল্যায়ন, ইলাহী অনুগ্রহের প্রতি নিঃশর্ত নিবেদন, বিনীত স্বীকৃতি, সত্যের পথে ত্যাগ ও কোরবানী, কল্যাণকামিতা ও আল্লাহভীরুতায় অগ্রগামিতাই সবিশেষ বিবেচ্য।

আল্লাহতাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, বিভক্ত করেছি জাতি ও গোত্রে যাতে একে অপরকে চিনতে পার। আল্লাহ'র দরবারে সর্বাধিক সম্মানিত সেই, আল্লাহভীরুতায় যে অগ্রণী। নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু জানেন, সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল।" [আল-হুজরাত— ১৩]

"তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও বিদায় হজ্জের সময় ইরশাদ করেছেন ঃ

"সকলেই আদমের সন্তান। আদমের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। কোন আরবী অন্য কোন আজমীর চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়; তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে কেউ কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে।" [তিরমিযী]

পাশাপাশি এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে, ইসলাম একটি সহজ ও স্বভাবজাত ধর্ম। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَا.....

.....

"আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্যে সহজাত চান, বাড়াবাড়ি চান না।"
[বাকারা ঃ ১৮৫]

পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে কঠোরমনা আবিদদের বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতার ফলে, বিশেষ করে আসমানী বিদ্যায় তাদের ধারণা অপ্রতুল হওয়ার কারণে এমন কিছু নীতি ও আইন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, স্বীকৃতি পেয়েছিল যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে করে ফেলেছিল খুবই সংকীর্ণ। রুদ্ধ-বদ্ধ সেই আইনবাঁধা জীবন তাদের জন্যে হয়ে উঠেছিল বিষাক্ত ও শ্বাসরুদ্ধকর। আখেরী নবুওয়ত ও সর্বশেষ রাসূলের আইন ও শরীয়ত সেসব কঠোরতাসিঞ্চিত সংকীর্ণ ধর্মকথার, অযাচিত-অবাঞ্ছিত বাড়াবাড়ির সমূহ কাঁটাতার খুঁটিশুদ্ধ উপড়ে ফেলে নির্মাণ করেছে এমন এক বিস্তৃত-বিস্তীর্ণ সবুজ সুন্দর ধর্ম-নিবাস, যেখানে শুধু স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসই করা যায় না, বরং সুস্থ বিবেকবান কল্যাণকামী সকল আদম সন্তান পঙ্গপালের মত ছুটে এসে চাতকের মত তাকিয়ে থাকে শুধুই হুকুমের প্রত্যাশায়– অপার্থিব এক কল্যাণের মাদকতায়।

সারকথা হলো, সমগ্র মানব জাতির, মানবগোষ্ঠীর সকল শ্রেণীর, অধিকন্তু সকলের প্রাকৃতিক চাহিদা মুতাবিক প্রতিষ্ঠিত এমন এক জীবন দর্শনের প্রয়োজন ছিল, যে প্রয়োজন পূরণে স্পষ্ট ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে পূর্ব যুগের সকল ধর্মচিন্তা-ধর্মগ্রন্থ। অধিকন্তু বিশ্বময় সকল শ্রেণীর মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, সর্বকালের সকল প্রজন্মের সকল চিন্তার যথার্থ নির্দেশনা সকল সংকটের উত্তরণ পথ বাতলে দেয়ার মত জীবন দর্শন আবিষ্কার করাও পৃথিবীর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং এসব বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ, সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত সহজ-সরল জীবনধর্মী এক পূর্ণাঙ্গ ধর্ম সে কেবল ইসলাম যার পরে স্বাভাবিকভাবেই আর কোন নতুন দ্বীন নতুন ধর্মের প্রয়োজন থাকে না।

বিশুদ্ধ হাদীসের দৃষ্টিতে খতমে নবুওয়ত

এতে সন্দেহ নেই, একজন আরবী ভাষী, আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক, ওয়াফেকহাল ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের সাবলীল বলিষ্ঠ বর্ণনা থেকে সহজেই বুঝতে পারে, নবীজীর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, বরং এ বিষয়ে তাকে কোন সন্দেহ-সংশয় স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ বিষয়টি

দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোথাও কোন জটিলতা নেই, রহস্যময়তা নেই। তারপরও বিষয়টির গভীর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে রাসূল (সা.) আরও কিছু সুস্পষ্ট প্রতিভাত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এ মর্মে। তিনি বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষার আলোকে তুলে ধরেছেন এই মহান সত্য। এ সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। আমরা এখানে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরছি মাত্র। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

১. "বনী ইসরাঈলের নবী তাদের শাসকও হতেন। তাদের এক নবীর ওফাতের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন দ্বিতীয় নবী। কিন্তু আমার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না, বরং আমার খলীফা হবে।" [বুখারী শরীফ]

২. রাসূলুললাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হলো সেই ব্যক্তির মত– যে ব্যক্তি একটি সুন্দর অট্টালিকা তৈরি করেছে। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি ছিল। দর্শনার্থীরা এসে ঘুরে-ফিরে অট্টালিকা দেখে আর তাজ্জব হয়ে বলে, এখানে এই ইটটি খালি কেন? সেই ইটটিই আমি। আমি সর্বশেষ নবী।" [বুখারী শরীফ]

৩. নবীজী (সা.) বলেছেন ঃ আমাকে ছয়টি কারণে অন্য সকল নবীর ওপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে ঃ ১. আমাকে সারগর্ভ বক্তব্যের অধিকারী করা হয়েছে। ২. প্রভাব ও ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৪. আমার জন্যে সমগ্র মৃত্তিকাকে মসজিদে ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমাকে সমগ্র সৃষ্টির নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬. নবুওয়তের পরিসমাপ্তিও সাধিত হয়েছে আমার-ই মাধ্যমে। [মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ]

৪ . রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, "নবুওয়ত ও রিসালাত সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমার পর আর কোন নবী-রাসূলের আগমন হবে না।"

৫। সাহাবী হযরত জুবায়র ইবনে মুতইম (রা.) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ আমি মুহাম্মদ, আমিই আহমদ। আমিই মূলোৎপাটনকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা কুফুরকে মূলোৎপাটিত করবেন। আমি 'হাশির'। আমার মাধ্যমে হাশরের মাঠে সমগ্র জাতিকে পুনরুত্থিত করবেন আল্লাহতাআলা। আমি সকলের শেষে আগত। আমার পর আর কোন নবী আসবে না। [বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ]

আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলাম। অন্যথায় এ সম্পর্কে হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লমা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.) তদীয় গ্রন্থ আকীদাতুল ইসলামে বলেছেন, খতমে নবুওয়তকে

প্রমাণ করে এমন হাদীসের সংখ্যা দু'শ'টি। মুফতীয় শফী (র.) এ বিষয়ে প্রণীত তদীয় অমর রচনা "খতমে নবুওয়ত"- এর দুই শ' দশটি হাদীস সংকলন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর সর্বযুগেই খতমে নবুওয়াতের ওপর উম্মতের ইজমা ও ঐকমত্য ছিল। সর্বকালেই নবীজীর পর নবুওয়তের দাবীদারকে মিথ্যাবাদী, ধর্মত্যাগী দাজ্জাল বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। খতমে নবুওয়ত সর্বকালের বিশ্ব মুসলিমের একটি শাশ্বত বিশ্বাস। এ বিশ্বাস তাদের অস্তিত্বের অংশ। প্রাণের চেয়ে প্রিয় এ বিশ্বাসকে তারা অফুরান যত্ন দিয়ে লালন করেছে যুগের পর যুগ। পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বস্ত পূর্বসূরীরা যোগ্য উত্তরসুরিদের কাছে। এ কথাও সত্য, ইসলামের ইতিহাসে মানসিক, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। ক্ষয়-লয় এসেছে। বয়েছে অনেক ঝড়-তুফান। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মে, উম্মাতের ক্ষুদ্র বলয়ে যে পরিমাণে মিথ্যা নবীর আবির্ভাব হয়েছে আবিশ্ব বিস্তৃত শত শত বর্ষের বরেণ্য বর্ণাঢ্য ধর্ম ইসলামের আঙ্গিনায় গজিয়ে ওঠা ভণ্ড নবীর সংখ্যা সে হিসেবে খুবই নগণ্য, বরং কম পড়া যা অশিক্ষিত মহলে সাময়িকভাবে এসব ভণ্ড নবী কিছুটা লম্ফঝম্প মারলেও অনুসারী সৃষ্টিতে তারা সর্বকালেই চরম দৈন্যের পরিচয় দিয়েছে এবং কখনোই তারা নির্ভরযোগ্য সংখ্যা ভক্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।

সহীহ হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত সত্তর জন মিথ্যা নবীর সংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর বিশাল বিস্তীর্ণ কাল, বিশ্বময় ব্যাপ্তি, মূর্খতার আধিক্য আর বিশ্বাসের বিরোধ ও পতনের তুলনায় এ সংখ্যাও খুব বেশী নয়। মূলত মুসলমানদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, অবিচল আকীদা, রক্ত-মাংসে নিহিত অনির্বাণ চেতনা, অধিকন্তু কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্যেরই ফলশ্রুতি এটা। সন্দেহ নেই, অনন্তকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে বিশ্বমুসলিম তাদের এই গৌরবময় অভিধায়। এটাই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অহংকার—সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি—তাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্বশেষ্ঠ রাসূল আর তারা হলো সর্বশেষ উম্মত।

সমকালীন পৃথিবীর প্রতি সীরাতে মুহাম্মদীর পয়গাম

আমাদের সামনে যখন অন্ধকার যুগের নাম আসে, অনায়াসেই তখন চোখের সামনে প্রতিমূর্ত হয়ে ওঠে খ্রস্টীয় ষষ্ঠ শতকের সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্বনবী (সা.) যাতে তাঁর হিদায়েত ও প্রশিক্ষণের সর্বপ্রথম ও উল্লেখযোগ্য মু'জিযা। জাহিলিয়্যত শব্দটি শুনতেই স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে আরব সম্প্রদায়, তাদের বর্বরোচিত বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও বেপরোয়া চলাফেরার দৃশ্য ঐতিহাসিকগণ যার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

তবে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ শুধু সে কালের সাথে বিশেষিত নয়, ইসলামের পরিভাষায় যুগ ওহী ও নব্বী দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোক রশ্মি যেখানে হয়ত পৌঁছেছে, কিন্তু লোকেরা তা থেকে বিমুখ থেকেছে, চাই সেটা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দিগন্তবিস্তৃত বর্বরতা হোক, সাধারণ অন্ধকার যুগ হিসেবে যাকে স্মরণ করা হয় অথবা বিংশ শতাব্দীর দীপ্তিময় আলোকোজ্জ্বল, সভ্য ও অগ্রগতির যুগ হোক, আমরা যা অতিক্রম করছি।

কুরআনে কারীমের ভাষায় ভূমণ্ডলে আলোকরশ্মি একটাই এবং এর উৎসও একটাই। ইরশাদ হচ্ছে "আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাকাশ ও জমিনের আলোকরশ্মি।" তবে আঁধার অসংখ্য অগণিত। যদি আল্লাহ্ তা'আলার আলোকরশ্মির (যা শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হয়) দীপ্তি না থাকত, তাহলে থাকত না পৃথিবীতে আঁধারের কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানা, বরং পরিলক্ষিত হতো জীবনের বাঁকে বাঁকে, পরতে পরতে আঁধার আর আঁধার। ইরশাদ হচ্ছে, "অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ওপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের ওপর এক অন্ধকার যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহতা'আলা যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।"

কুরআনে কারীমের যেখানেই 'আলো-আঁধার'-এর আলোচনা এক সাথে এসেছে, সেখানে 'আলো'কে একবচন ও 'আঁধার'কে আনা হয়েছে বহুবচন যা থেকে প্রতীয়মান হয়, 'আঁধার' অসংখ্য—অগণিত। আর 'আলো' একটিই। ঐ প্রাকৃতিক মেঘঢাকা আঁধারে প্রভাতের উদয় হতো না। আর এই দীপ্তময় ও জাগ্রত জগত এক বিস্তৃত, তিমিরাচ্ছন্ন সমাধি, যাতে আলোর কোন ফাঁক নেই। যেখানেই প্রদীপ জ্বালানোও প্রজ্জ্বলিত হবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলেফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে, সেখান থেকে বের হতে পারছে না?"

একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, পাশ্চাত্য জগতে যেখানে সূর্য উদিত হয় না, অস্ত যায়, নববী আলোকে বিশ্বের ছোঁয়া লেগেছে খুব কম। এখানে আসমানী আলোক রশ্মি চিত্রায়ণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে প্রতিনিয়ত মানব মস্তিষ্কপ্রসূত আলোকরশ্মির দিয়ে। মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গ্রীস ও রোমানদের সোনালী যুগ নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এক দীপ্ত অধ্যায়; কিন্তু নববী প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনার তুলনায় তা যেন নিষ্প্রভ, তিমিরাবগুণ্ঠিত বর্বর যুগ! আল্লাহ্ তা'আলার যাত, ছিফাতের ব্যাপারে এখানে কোন আলোকরশ্মি ও দিকনির্দেশক

ছাড়াই শুধু যুক্তির ঘোড় দৌড়ানো হয়েছে। "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু আন্দাজের অনুসরণ করে।" বিজ্ঞান ও দর্শনের যে ম্যাজিক দেশের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা সুবিস্তৃত করেছেন, তা কল্পনাপ্রসূত ও বিস্ময়কর হিসেবে প্রাচ্যের বিরল কল্পকাহিনী ও মনোহরী ভোজবাজি থেকে কম নয়। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের কথা দর্শন ও দার্শনিকদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণে কোথাও কোথাও দৃষ্টিগোচর হতো, আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রশিক্ষণের ঝলক, দ্যুতি, বর্ষার ঘন অন্ধকার রাত্রে জোনাকি পোকার যৎসামান্য আলোর ন্যায় যা থেকে প্রতিভাত হয়, আম্বিয়ায়ে কেরামের কিছু কথা, তাদের শ্রুতিগোচর হয়েছিল কখনও। কিন্তু এ আলোক রশ্মি তার সহায়তায় ভ্রমণ সম্পন্ন করার মত প্রখর ও স্থায়ী ছিল না। " বিদ্যুতালোক যখনই চমকাত, তার আলোতে তখন তারা পথ চলতে পারত আর যখন ছেয়ে যেত আঁধারে, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকত।"

আশ্চর্য! হযরত মাসীহ (আ.)-এর হিদায়েতের প্রদীপ্ত প্রাচ্যে দু'শত শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের নাশকতার মুকাবালা করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে তা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে গুণগ্রাহীদের আঁচল তলে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা-সংস্কার পাশ্চাত্যে হারিয়ে ফেলেছে তার মূল গতি। সর্বপ্রথম উত্থান হয়েছিল যেখানে খৃস্টবাদের। শিরক ও প্রতিমা পূজার স্রোতধারা বইতে লাগল খৃস্টবাদের অতলান্ত সাগরে। সম্ভবত পৃথিবীতে এক ধর্মের জন্য নতুন ধর্ম এতটা অশুভ প্রমাণিত হয়নি, যতটা খৃস্টবাদের জন্য, কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট ও সেন্ট পল। খৃস্টবাদের সেই স্বর্গীয় আলোববর্তিকা নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার পর পাদ্রীরা বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশ সাজিয়ে এতে প্রজ্জ্বলিত করত কর্পূরের নির্মিত উজ্জ্বল প্রদীপ। শতাব্দীভর সন্তুষ্ট খৃস্ট জগতকে এ বিশ্বাস দেয়ার নিমিত্ত যে, হযরত ঈসা (আ,) আনীত আলোকবিম্ব এখনও তাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। মূলত কত শতাব্দী পূর্বেই এ আলোক রশ্মি হারিয়ে গেছে তিমির সব কিছু।

এতদ্সত্ত্বেও এ বাস্তবতাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে পাশ্চাত্যে আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাস পরকালের চিন্তা-চেতনা খৃস্টবাদেরই অনিবার্য ফল আসমানী ধর্ম যতই রূপান্তরিত হোক, আল্লাহ্ পরকালের কল্পনা শিরায় শিরায় থাকে প্রবাহিত। খৃস্টীয় পনের ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে যৌক্তিকতা তথা বস্তুবাদ ও ইন্দ্রিয় পূজার যে বিপ্লব সৃষ্টি হলো, পাশ্চাত্য জগতকে তা দিবালোকে লাগিয়ে দিল জড়পূজায়। ধীরে ধীরে ইউরোপ হয়ে উঠল জড়পূজারী। তাদের জীবনধারা কল্পিত রীতিনীতিতে অবশিষ্ট থাকল না আল্লাহ্, পরকাল। মুখে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেনি কেউ। কিন্তু তাদের জীবনধারা এমন ছাঁচে ঢালা, যাতে না আছে আল্লাহ্,

না পরকাল। আজ একথা বলা বিলকুল যথার্থ, ইউরোপের ধর্ম খৃস্টবাদ নয়, বরং বস্তুবাদ। যুগ যুগ ধরে ইউরোপ প্রতিমাপূজায় লিপ্ত, আর দাবী করেছে খৃস্ট ধর্ম পালনের অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আবেগের সাথে খৃস্টবাদের প্রতি তাদের নিখাদ ভালবাসা ও প্রেমাসক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে প্রতিনিয়ত। যেমন বস্তুবাদী মতাদর্শ ঠিকরে পড়ে তাদের থেকে। ঐ নতুন মতাদর্শের গির্জা, উপাসানালায়গুলো (ফ্যাক্টরী, শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও প্রমোদ ভবন) অহর্নিশ থাকে জনপূর্ণ- আবাদ। সে মতাদর্শের পুরোহিতকে (শিল্পপতি, পুঁজির মালিক, কারিগর, শিল্পী) দেখা হতো বড় সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে, বরং আরাধনা করা হতো তাদের। অপর দিকে পাশ্চাত্য খৃস্টবাদ রয়ে গেল অশরীরী মূর্তিরূপে।

পাশ্চাত্যে এ আত্মভোলা জাতির সে সব পরিণাম বিকশিত হয়েছে, হচ্ছে, যা তাদের বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও আদর্শের অনিবার্য ফল। তার একটি হলো, পশ্চিমা গোষ্ঠী এক আল্লাহ্‌কে বর্জন করে আঁকড়ে ধরেছে অসংখ্য খোদা। এ যথার্থ আস্তানা থেকে শির উঠিয়ে—যেখানে মাথা নত করলে সে সমস্ত আস্তানা থেকে স্বাধীন হতে পারত—মাথা ঝোঁকাতে লাগল সকল প্রস্তরে। এক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দেয়ার শাস্তিস্বরূপ অহর্নিশ তারা দেখতে পেয়েছে অসংখ্য প্রভুকে, তাদের ওপর বিজয়, গোটা পাশ্চাত্য জগত তাদের হিংস্র লুণ্ঠিত থাবায় জিম্মি কোথাও রাজনৈতিক নেতৃত্বে, অর্থনীতির দেবতা হিসেবে কোথাও কোথাও মনগড়া জীবনের মানদণ্ড নির্ধারণে, আবার কোথাও স্ববিবেচনায় জীবনের অপরিহার্য করণীয় নির্বাচনে যারা তিক্ত করে রেখেছে তাদের আজ্ঞাবহদের জীবনযাত্রা। উপাসনা বেশী হওয়া উচিৎ সহস্র গুণ, কঠোর পরিশ্রম নিচ্ছে তাদের থেকে, যা বোবা প্রাণী, নিষ্প্রাণ মেশিন থেকে নেয়া যায় না। কঠোর সাধনায় নিয়োজিত রেখেছে তাদের অদ্যাবধি যা কোন দেবতার নামে করা হয়নি। আল্লাহ্ ছাড়া ঐ অসংখ্য প্রভুর অভিসন্ধি ও অভিলাষে রয়েছে প্রচণ্ড সংঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ। তাদের অসঙ্গত উদ্দেশ্য হেতু উত্থান-পতন হতে লাগল গোটা বিশ্বে। সাম্প্রতিককালের দেশাত্মবোধেও একটি বড় ভূত, অহর্নিশ যা শোণিত ধারা ও মানুষের জীবনোপহারের অভিলাষী। পেট তাদের আরেকটি দেবতা বিংশ শতাব্দীর মানবগোষ্ঠী দিবানিশি যার বন্দেগীতে লিপ্ত। তদুপরি সে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এই তো কিছু দিন আগে স্যার আলয়ুরলাজ তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "অনাড়ম্বর জীবন যাপন এখন পরিগ্রহ করেছে স্বপ্নপুরীতে। এখন না জীবনের কোন লক্ষ্য সামনে আছে, না বড় কোন পরিকল্পনা। প্রত্যেকেই দিবানিশি গাধার ন্যায় স্বীয় ফ্যাক্টরী বা অফিসে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। দ্রুত থেকে দ্রুততর যান-বাহন আবিষ্কৃত হয়ে প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির পদ যেন চক্কর ও ঘূর্ণনে ব্যতিব্যস্ত।"

আল্লাহ্ বিস্মৃতির দ্বিতীয় পরিণাম হলো আত্মবিস্মৃতি। কোরআন কারীম এ বাস্তব সত্যটির বিবরণ দিয়েছে, "আল্লাহ্ বিস্মৃতির শাস্তি আত্মবিস্মৃতি'- ইরশাদ হচ্ছেঃ "তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্তৃত বানিয়ে দেবেন।"

বিংশ শতাব্দীর মানুষ আত্মবিস্মৃতির পরিপূর্ণ মডেল। সে বেমালুম ভুলে গেছে তার মূল সত্তা, ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য, জীবনের ও জন্মলাভের মূল উদ্দেশ্য। অবলম্বন করেছে সে পশুসুলভ জড়বাদী জীবন যাপন। রূপান্তরিত হয়েছে সে টাকা তৈরির মেশিনে। যে নিজে তা থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না। অন্তত শারীরিক আমোদ-প্রমোদ আন্তরিক প্রশান্তিই তো ওঠে না! এ অনুভূতিটুকুও তার মধ্যে নাকি নেই! প্রফেসার জোড যথার্থই লিখেছেন ঃ সাম্প্রতিককালের সোসাইটির সম্পর্ক যতটুকু, আমাদের বিশ্বাস, তমদ্দুন, অগ্রগতিরই নাম। অগ্রগতিই ইদানীং কালের যুবকদের উপাস্য। এর আস্তানায় তারা পায় স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা। অন্যের প্রতি দয়াপরবশ হওয়াকে তারা প্রত্যাখ্যান করে নির্দয়ভাবে।

বর্তমান বিশ্ব আত্মভোলা, মাতলামিতে মানুষের মৌলিক অবকাঠামোই রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সে স্বীয় উন্নতির গণ্ডি ছেড়ে ভিন্ন লাইনের অগ্রগতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছেছে। আসলে সত্যিকার মানুষ হিসেবে সে কোন উন্নতিই করেনি, বরং তার মনুষ্যত্ব বৈশিষ্ট্যে ধস নেমেছে প্রতিনিয়ত। সাম্প্রতিক অগ্রগতিগুলো বিশ্লেষণ করলে কিছু বের হবে হিংস্র প্রাণীর, বিহঙ্গমালার কিছু, আর কিছু বের হবে মৎস্যরাজির। একজন পশ্চিমা লেখক এর বাস্তবতাকে সুস্পষ্টরূপে স্বীকার করে বলেছেন ঃ আমাদের বিস্ময়কর শৈল্পিক বিজয় ও লজ্জাকর ছেলেমানুষী চরিত্রে যে ব্যবধান, এর কারণে আমাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে জন্ম নিচ্ছে প্রচুর সমস্যা। এক দিকে আমাদের শৈল্পিক অগ্রতির রূপরেখা হলো এই ঃ আমরা সমুদ্রের পাড়ে বসে বসে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশের লোকের সাথে কথা বলতে পারি অনায়াসে। সমুদ্রের ওপর, জমিনের তলদেশে ছোটাছুটি করি। রেডিও মারফত সেলুনে বসে লন্ডনের বড় ঘন্টার ধ্বনি শুনি। শিশুরা টেলিফোনযোগে পরস্পর কথোপকথন করে, বিদুৎযোগে আসতে থাকে ছবি। চলতে থাকে নিঃশব্দ টাইপ-রাইটিং। কোন প্রকার কষ্ট ছাড়া যুক্ত করা হচ্ছে দন্তরাজি। বিদ্যুতের সাহায্যে পরিপক্ব করা হচ্ছে ফসলাদি। সড়ক হচ্ছে রাবারের। এক্স-রে যোগে আমরা নির্নিমেষে দেখতে পাচ্ছি শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশ। ছবি কথা বলে, গায়। বেতার যোগে অপরাধ ঘাতকদের চিহ্নিত করা যায়। বৈদ্যুতিক হিটে সিঁথি কাটা যায় কেশরাজিতে। সামুদ্রিক জাহজ উত্তর মেরু ও উড়োজাহাজ দক্ষিণে মেরু পর্যন্ত উড়ে বেড়ায়। এতদ্সত্ত্বেও

আমরা পারি না আমাদে বৃহৎ শহরগুলোতে কোন বিস্তৃত ময়দান বানাতে, যাতে অসহায় শিশুরা আরাম-আহ্লাদে খেলবে। পরিণামে ধ্বংস হচ্ছে হাজার হাজার শিশুর অমূল্য জীবন। আক্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার শিশু।

সহসা এক হিন্দুস্থানী দার্শনিকের সাথে নিজেদের সভ্যতার গুণ কীর্তন করছিলাম এক মোটর চালক সম্পর্কে। সে তিন শত/চার শত মাইলের দূরত্ব এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে রেকর্ড করেছিল অথবা কোন আকাশচারী মস্কো থেকে নিউ ইয়র্কের দূরত্ব, আমার স্মরণ নেই, বিশ/পঞ্চাশ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিল। আমি যখন সব কিছু বল্লাম, হিন্দুস্তানী দার্শনিক তখন বললেন ঃ "হ্যাঁ, কথা সত্য! চড়ুই পাখির মত তোমরা আকশে উড়তে জান, মৎস্যরাজির মত পানিতে সাঁতরাতে জান, কিন্তু এখনও মানুষের মত পৃথিবীতে চলতে জান না।"

এ বিশ্ব আত্মবিস্তৃতিতে অনেক অগ্রসর, তাই পাশ্চাত্যবাসীদের প্রতি আল্লাহবিস্মৃতির অভিযোগ অবান্তর। আল্লামা ইকবালের এ কবিতার লক্ষ্যস্থল যেন তারাই ঃ

পলায়নরত তুমি নিজেই, তালাশ করছ বন্ধু তোমার?
পৌঁছাতে পারবে না মানুষ অব্দি, কি অন্বেষণ করছ খোদ তোমার?

পাশ্চাত্যের পরকাল ভুলে যাওয়াকে ধরুন, তাদের পরজীবন বিস্মৃতির প্রথম ও প্রাকৃতিক স্বরূপ হলো, পার্থিব জীবন ও জাগতিক বস্তুর স্বাদ আস্বাদন, ভোগ বিলাস এক চরম উন্মাদনা ও অবিচ্ছেদ্য পীড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভোগ-বিলাসই স্থির হয়েছে তাদের জীবনের আজ পাশ্চাত্যের পরতে পরতে ভোজন উৎসব ও পানাহারের কলরব ভেসে আসছে আমোদ-প্রমোদের সুউচ্চ প্রতিনিধি। তারা এ ভোগ বিলাস ও তার উপকরণ লাভার্থে টার্গেট প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। এ প্রতিযোগিতা মানুষের জীবনকে এক 'রেসকোর্স' বানিয়ে দিয়েছে, যার কোন অন্ত নেই। এ যেন জীবনের এক তীব্র তৃষ্ণা, যা নির্বাপিত হবার নয়! এক প্রচণ্ড ক্ষুধা, যা নিবারণ হবার নয়! এতে মানুষের মুখে ধ্বনি একটি, "আরো চাই, আরো চাই।" দিন দিন বাড়তে লাগল জীবনের প্রয়োজন। বাড়তে লাগল প্রবৃত্তির দাবী পূরণের রকমরারি উপরকণ, যা সামাজিক জীবনকে করে তুল্ল দুর্বিষহ, জটিল। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মুকাবেলা এতে মদদ যুগিয়েছে। জীবনের মানদণ্ড দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হতে লাগল, অনন্তর মানুষ যখন চোখ তুলে তাকায়, ভেসে ওঠে তখন মনজিলে-মকসুদ অলিন্দে দূরে বহু দূরে, পরিণামে মনযিল পাওয়ার তীব্র বাসনা, কঠোর পরিশ্রমে তার জীবন বিসস্বাদ ও তিক্ততায় ভরে ওঠে এবং সে লোভ-লালসার নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি ও জীনের অবিরাম সাধনায় লিপ্ত। স্বস্তির ও আত্মপ্রশান্তির সর্বাধিক বৃহৎ উপকরণ ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি ইউরোপে তা যুগ যুগ ধরে অনুপস্থিত।

পরকাল অস্বীকৃতি কিংবা পরকাল বিস্মৃতির পর আমোদ-প্রমোদ ও উপভোগের এ আবেগ, আমরা মুসলমান যাকে ছেলেমী মনে করি, পরকাল অস্বীকৃতি হিসেবে হুবহু ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি। যারা এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে তা ভাবতে পারে না তারা কেন ত্রুটি করবে- এ জীবনের স্বাদ উপভোগে, আত্মার দাহ নেভাতে। ভোগ বিলাস রেখে দেবে কোন্ দিনের জন্য? এজন্যই কোরআন বলে, "আর যারা কাফের তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।" অন্যত্রও ইরশাদ হচ্ছে, "ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে যাবে।"

পরকাল অস্বীকৃতির দ্বিতীয় স্বাভাবিক পরিণাম হলো, দুনিয়ার তার উপকরণ ও তার কর্ম অত্যধিক সুসজ্জিত, বিবেকসম্মত ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। জন্ম নেয় বস্তুবাদী মানসিকতা ও স্থূল দৃষ্টি, বাস্তবতা পর্যন্ত যা পৌঁছাতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে, "যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।" "বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে, তারা সৎ কর্ম করছে। তারাই সেই লোক যারা তাদের পালনকর্তার নির্দেশনাবলী ও তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না।"

এর (পরকাল অস্বীকৃতির) আরেকটি পরিণতি, জীবনে বাস্তবতা ও গাম্ভীর্যের অংশ খুবই নগণ্য, ক্রীড়া-কৌতুকেই কেটছে সিংহ ভাগ। বিভিন্ন ব্যস্ততা, আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের করাল গ্রাসে চলে যাচ্ছে জীবনের এক বৃহৎ অংশ। বড় বড় সঙ্কটপূর্ণ, আশংকাজনক মুহূর্তেও তাদের এ আমোদ-প্রমোদ ও উপভোগে ভাটা পড়ে না। ইরশাদ হচ্ছে: "তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবনে যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।"

এর আরেক অশুভ পরিণাম এই, আকস্মিক ঘটনাবলীতে বাস্তব কারণের প্রতি তাদের দৃষ্টি যায় না এবং তা আটকে যা কতক বাহ্যিক বস্তুর ওপর। তারা পৌঁছতে পারে না মুয়ামালাতের অন্তর্নিহিত ভেদ পর্যন্ত। ফলত অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ও আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। উদাসীনতায় ঘাটতি আসে না তখনও। ঐ আকস্মিক ঘটনার কোন একটি ব্যাখ্যা বের করে এবং এর কোন কাল্পনিক বা বাস্তব কারণ নির্দেশ করে শান্ত হয়ে যায়। কোন বৈপ্লবিক

পরিবর্তন আসে না তাদের রীতিনীতিতে। কুরআনে কারীমে বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের কু-প্রবত্তির অবস্থা বর্ণনায় ঘোষিত হয়েছে, "আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গাম্বর প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আজাব আসল, তখনও কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।"

পরকাল অস্বীকৃতির এক বিশেষ গুণ হলো, অহংকার আখেরাত অস্বীকারকারীর দাম্ভিক হওয়ার অন্তরায় হয় না। কোন কিছু যে তার চেয়ে বড় কোন শক্তিধর, এ জীবনের পর অন্য কোন জীবন ও প্রতিদান দেবার প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তাকে এক লাগামহীন উষ্ট্র, উদ্ধত মানুষ হওয়া থেকে রুখতে পারে কিসে? যেন উভয়টা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস হতে করে না। তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শনকারী। -(সূরা নহল ঃ ২২) ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে ঘোষিত হয়েছে, "ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।"

এরূপ পরজীবন অস্বীকারকারী, বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের হিংস্র থাবা, তাদের অত্যাচারী পাকড়াও এবং তাদের বিজয় যেন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প, যা শহরের পর শহর, দেশের পর দেশকে উলট-পালট করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ যখন তোমরা আঘাত হান, তখন যালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ নিশ্চয়ই রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করে।

অনুরূপ পাশ্চাত্যবাসীরা রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের দৌলত থেকে বঞ্চিত। যদিও তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মেনে নিয়েছে কিন্তু তারা তাঁকে জীবনাদর্শ ও অনুরসণীয় রাসূল হিসাবে কার্যত মেনে নেয়নি। প্রথম জিনিষটি ছিল একটি বিশ্বাসগত বিষয়। একে মেনে নেয়া দ্বারা জীবন, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে বিস্তর প্রভাব পড়ে না কিন্তু তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসত তাঁকে জীবনের রাহবর, তাঁর আদর্শকে আলোকবর্তিকা ও তাঁকে পরিপূর্ণ আদর্শরূপে মেনে নিলে, কিন্তু পশ্চিমা গোষ্ঠী এরূপ করেনি, তাদের জন্য

সহজে সম্ভবও ছিল না। হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবনের শুধু তিনটি বছরের বিবরণ তাদের কাছে রক্ষিত ছিল, তাও যা জীবনের বাস্তবায়ন করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য জগত যদি হযরত মাসীহ (আ.)-এর সীরাত, কথাবার্তা, হিদায়তে ও প্রশিক্ষণকে তাদের জীবনের দিকনির্দেশক বানাতে চাইত, তবে এতে তাদের জন্য জটিলতা ছিল। কারণ খৃস্টান পাদ্রীদের কাছে এরূপ কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানভাণ্ডার ছিল না যদ্দ্বারা একটি সম্প্রদায়ের জন্য সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। না, তারা ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না যদ্দ্বারা পাশ্চাত্যের অনভিজ্ঞ জাতিকে জাগতিক অগ্রগতির পাশাপাশি ধর্মীয় পরিমণ্ডলে রাখতে পারে। ফলে খৃস্ট সম্প্রদায় তাদের বাস্তব জীবন মুক্ত করে নিল হযরত ঈসা (আ.)-এর নেতৃত্ব ও গির্জার তত্ত্বাবধান থেকে। জীবন যাপন করতে লাগল বাধাবন্ধনহীন যেন তারা কোন নবীর উম্মত নয়! হযরত মাসীহ (আ.)-এর পবিত্র প্রশিক্ষণের অন্তর্নিহিত প্রভাব পড়েনি তাদের বিকৃত মস্তিষ্ক ও হৃদয়তন্ত্রীতে। বঞ্চিত হলো তারা চারিত্রিক শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধি থেকে, যা নবীদের অনুসারীরাই লাভ করে থাকে। তারা জাগতিক উপকরণ সঞ্চয় করেছে প্রচুর। কিন্তু কল্যাণপ্রবণতা তো অর্জিত হয় শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেই। বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা তা হতে পারে না, হয়নি। পরিণামে এ সকল উপকরণ ও এ সকল শক্তি যা কল্যাণপ্রবণতার সাথে সাথে মনুষ্য জগতের অগ্রগতির কারণ হতে পারত, রূপান্তরিত হলো নেতৃত্ব ও সকল অপকৃষ্টতার হাতিয়াররূপে। তাইত এগুলো ব্যবহারকারীদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে এ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় না। "এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা ভূমণ্ডলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।"

এ আল্লাহ্ ভোলা পরজীবন বিস্মৃতি ও আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা-প্রশিক্ষণবিমুখতার পরিণাম হলো, পাশ্চাত্য আজ এত আলোকিত যে, তার রাত দিনের ন্যায় উজ্জ্বল, আবার এত তমাসাচ্ছন্ন যে, দিনও যেন রাতের ন্যায় তিমিরাবগুণ্ঠিত। আলোকিত ও অগ্রগতির এ যুগে অহরহ তা-ই হচ্ছে, যাকে ভয়াল বর্বর যুগের বৈশিষ্ট্য মনে করা হতো। মীর আকবর হুসাইন ইলাহাবাদীর ভাষায়–

"কঞ্চি লেখবে পৃথিবীর বেদনাময় ইতিহাসে,
আঁধার ছেয়ে গেল বিদ্যুতের আলোকিত বিশ্বে।"

বিগত যুদ্ধ সমাপ্তির পর মাস্টার লয়েড জর্জ বলেছিলেন,, "যদি হযরত মাসীহ (আ.) এ ধরায় আগমন করেন তো বেশী দিন বাঁচবেন না।" লক্ষণীয় বিষয় হলো, দু' হাজার বছর পরও মানুষ ফেৎনা-ফাসাদ, রক্তপাত, হত্যা, লুণ্ঠনে নিয়মিত জড়িত, বরং ভয়াবহ এখন তো মানবতার প্রতিবিম্ব থেকে, ইতিহাসের সবচেয়ে মহাযুদ্ধের প্রভাব থেকে ঝরছে তপ্ত খুন লহরী এবং পৃথিবীতে এত পরিমাণ লুণ্ঠন হলো, যে ঘনিয়ে এল দুর্ভিক্ষ। কী দেখবেন হযরত এসে? ভ্রাতৃত্ববোধে পরস্পর হাত মেলাতে? না তার বিপরীত সেই মহাযুদ্ধের চেয়ে বড় ধ্বংসাত্মক, বেদনাদায়ক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে? একের পর এক জীবন হরণ করতে? নিপীড়ন নির্যাতনের রকমারি হাতিয়ার আবিষ্কার করতে এবং মানুষকে কষ্ট দেয়ার নিত্যনতুন প্রণালী নিয়ে ভাবতে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে মাস্টার ইডেন বলেছিলেনঃ বিশ্ববাসি! যতদিন কিছু করা যায়, জানা যায়, করে নাও, জেনে নাও! কেননা এ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে গুহায় জীবন যাপনকারীরা পৃথিবীর প্রাচীন বর্বর যুগের জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। সূচনা হবে ঐ বর্বর যুগের, হাজার বছর পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! সমস্ত দেশ একটি অস্ত্র থেকে বাঁচার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, যার ব্যাপারে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত কিন্তু তাকে আয়ত্তে রাখতে কেউ রাজী নয়। কোন সময় বিস্মিত হয়ে ভাবি, অন্য কোন গ্রহ থেকে যদি কোন পর্যটক, তীর্থযাত্রী এ পৃথিবীতে আসে, এ পৃথিবীকে দেখে সে তখন কি বলবে? সে দেখবে আমরা সবাই নিজের ধ্বংসের উপকরণ তৈরি করছি। আরো মজার কথা হলো, একে অপরকে তার ব্যবহার পদ্ধতিও জানিয়ে দিচ্ছি।"

আজ থেকে সাড়ে তের শ' বছর পূর্বের সভ্য জগত রোম ও ইরান তথা প্রাচ্যের সম্রাটদের হাতে ছিল যার দিক নির্দেশনা, তা আজকের জগতের সাথে প্রায়ই মিলে যায়। মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে আত্মবিস্মৃতিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস এক ঐতিহাসিক থিউরী, জ্ঞানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃতি দিত, এ বিশ্ব-ভুবনকে কোন কালে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে দৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্।" কিন্তু তাদের বাস্তব জীবন ছিল ভিন্নতর, তাদের কর্মজীবন ছিল এরূপ যেন আল্লাহ্ বলতে কেউ নেই অথবা আছেন, নির্জনতা অবলম্বন করেছেন (আল্লাহর আশ্রয় চাই) এবং অন্যদের হেতু সাম্রাজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। জগত জুড়ে এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বহু খোদার পূজা, উপাসনার মায়াজাল বিস্তৃত ছিল। কোথাও ভূতের অর্চনা চলত, আবার কোথাও সম্প্রদায় ও বংশের, কোথাও লালসা ও কামনার, আবার কোথাও শক্তি ও

ক্ষমতার, কোথাও বাদশা ও সম্রাটের, আবার কোথাও পাদ্রী ও সন্ন্যাসীর। মানুষ ভুলে গিয়েছিল তার জীবনের উদ্দেশ্য তার আদিঅন্ত। জীবনের সঠিক কর্ম ভুলে গিয়ে লিপ্ত হয়েছিল ক্রমান্বয়ে আত্মহত্যা ও অর্থহীন ব্যস্ততায়। জগত জুড়ে বিস্মৃতি ছেয়ে গিয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী লিপ্ত ছিল নির্যাতন, নিপীড়ন, বলাৎকার, অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ করে রাজত্ব পরিচালনা, মানুষকে কষ্ট দেয়া ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগতকরণে। ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল আমীরগণ। জীবন যাপনের মডেল ছিল বহু উন্নত এবং জীবনোপকরণ বেড়ে গিয়েছিল বিস্তর। ফলে শাসকগোষ্ঠী নতুন নতুন শুল্ক, জরিমানা ও অত্যাচার করেও জীবনের দাবী পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিল। সামাজিক জীবন যাপনের নমুনা, জীবনের কল্পনা হয়ে গিয়েছিল অনেক সমুন্নত, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যে সরকারী চাকরীজীবী নয়, তাকে মানুষ মনে করা হতো না, সমাজ জীবনে তার সাথে মানুষের ন্যায় আচরণ করা হতো না। উন্নত জীবন যাপন ও সমসাময়িকদের সমতালে চলা ও পদমর্যাদা লাভই ছিল তাদের অহর্নিশ চিন্তা এবং মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে সর্বদা। মধ্যস্তরের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত থাকত প্রতিনিয়ত উঁচু স্তরের লোকদের ভাড়ামি ও অনুকরণে। অসহায় লোকেরা মাথা তোলার সুযোগ পেত না নির্দেশ পালন, দাসত্ব ও নিত্য নতুন শুল্কের ভারে। স্বীয় মনিবের ভোগ-বিলাস, তাদের বৈধ-অবৈধ দাবী পূরণের জন্য বন্দী থাকত, ভাষাহীন প্রাণীর ন্যায়। যখন তা থেকে ছুটি পেত, অবৈধ আমোদ-প্রমোদে তখন ডুবে যেত। আত্মপ্রশান্তি লাভ করত এভাবে। গোটা দেশ জুড়ে চলত এ আমোদ-প্রমোদ। দ্বীন ও পরকালের চিন্তায়, মৃত্যুর ভাবনায় কাটত না তাদের এক শ্বাস পরিমাণ সময়ও। পঙ্কিলতাহীন শহরে হুকুমতের লালসা ও রাজ্য দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাক্কির দুই পাটের অভ্যন্তরে রয়েছে পতন ও লাঞ্ছনা। ইরানী সাম্রাজ্য কোন যৌক্তিক কারণ ও প্রয়োজন ছাড়াই সিরিয়ার খৃস্ট রাজ্যে আক্রমণ চালিয়েছে। নব্বই হাজার নিষ্পাপ মানুষের তপ্ত লহুতে রক্তাক্ত করেছে আল্লাহ্‌র জমিন। এর প্রতিশোধ নিল রোম সাম্রাজ্য। ইরানী সাম্রাজ্যের উত্থান পতনে রূপান্তরিত করল। পূর্ণ নিরাপদ শহরের প্রতিশোধ নিল, পূর্ণ নিরাপদ শহর দিয়ে। ঐ রক্তাক্ত যুদ্ধধারা বছরের পর বছর ধরে চলল বড় কোন অভিসন্ধি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাড়াই। পৃথিবীর দুটি সভ্য সাম্রাজ্যের সুসভ্য মানুষগুলো হায়নার ন্যায় পরস্পর লড়ছে। আঁধারে ছেঁয়ে গিয়েছিল তখন গোটা ভূ-মণ্ডলে। মানুষের কৃত ভুল হেতু ছড়িয়ে পড়ছিল বিশ্ব জুড়ে ধ্বংস, দিগন্তবিস্তৃত অশ্লীলতা। ইরশাদ হচ্ছে, "স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্ম হেতু বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।"

তৎকালে ঐ সভ্য জগতের (যাতে ঘুণে ধরেছে সম্পূর্ণরূপে) ভিন্ন কিন্তু একেবারেই নিকটবর্তী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় সম্রাটের ঠিক মাঝখানে উম্মীদের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা আবির্ভাব ঘটালেন এক উম্মী নবীর। তিনি যেন শতাব্দীভর নিপতিত শাস্তি থেকে উদ্ধার করেন জগতকে। আসন্ন পর জীবনের শাস্তি থেকে সতর্ক করেন, তমসা থেকে বের করে আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত করেন। ছিন্ন করে দেন যাবতীয় শিকল, যাতে তারা আবদ্ধ ছিল। "তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎ কর্মের, বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে। তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন, নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ, তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীদশা অপসারণ করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।"

সপ্তম হিজরী সনে নবীয়ে উম্মী (সা.) মদীনা থেকে রোম সম্রাট বরাবর একটি (বার্তা) চিঠি পাঠালেন যাতে দাওয়াত ছিল এই, "হে আহলে কিতাবগণ! একটি কালেমা-বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীফ সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।"

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বিশ্বাস করেছে এ দাওয়াতের সত্যতা, কিন্তু নিজস্ব দুর্বলতা হেতু সে তার প্রভুত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পারেনি, যা থেকে সে উপকৃত হতো। মুক্ত হতে পারেনি তখনও ঐ রোমক যিন্দেগীর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে যাবত আনতে পারেনি মুসলিম মুজাহিদগণ সাম ও রোম সাম্রাজ্য তাদের রহমতের শামিয়ানায়। কিন্তু নবীয়ে উম্মী (সা.)-এর বার্তা সাদরে গ্রহণ করেছেন আরবের নিরুপায় দুর্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়, পরিণামে লাভ করেছেন তারা অসংখ্য নেয়ামত, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে তাদের দাসত্বের সকল শৃঙ্খল-বাঁধন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাথা ঝুঁকিয়ে মুক্ত হয়ে গেছে সমস্ত পৃথিবীর আস্তানা থেকে। না প্রবৃত্তির দাসত্ব বাকি রয়েছে, না সম্রাট ও হুকুমতের, না কুসংস্কার ও ভ্রান্ত প্রথার এবং না সোসাইটির সাবেক নিপীড়নমূলক বন্ধনের, না অবশিষ্ট রয়েছে নিজের ও অন্যের আপতিত বিপর্যয়-বিপদাপদ। আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় তাঁর মাহাত্ম্য, বড়ত্ব, তাঁর জ্ঞান ভণ্ডুল করে দিয়েছে পৃথিবীর কৃত্রিম আলাহ্র মাহাত্ম্যের ম্যাজিক। তাদেরকে তাদের দৃষ্টি থেকে ফেলে দিল। আরবের ভুখা, ক্ষুধার তাড়নায় কাতর, ছিন্ন বস্ত্র, পশমী কম্বল পরিহিত মরুচারী যারা নির্জন বন ও মরুভূমি থেকে বের হতো না কখনও, যারা শান-শওকতের বিকাশ ঘটাতে জানত না, তাদেরকে দেখা যায় অনারবী সম্রাটের চোখে চোখ রেখে অকৃত্রিম কথোপকথন করতে এবং তাদের দরবারীদেরকে গুরুত্বহীন হেয় দৃষ্টিতে দেখতে, যেন মাটির প্রতিমা, কাগজের খেলনা, সুশোভিত করা হয়েছে যাদেরকে রণ

পতাকা দিয়ে। বাস্তব সত্যের সাথে তারা পরিচিত হয়েছে গভীরভাবে। শান-শওকতের কৃত্রিম প্রকাশ তাদের ওপর কোন প্রতিক্রিয়াই করত না। তারা তাদের মূলনীতি ও উন্নত চরিত্রের মানদণ্ড থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসতে পছন্দ করত না। তারা নিজেকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের পুনরায় আল্লাহর উপাসনায় লিপ্ত করতে এবং মানুষের প্রভুত্বের কারিশমা ভণ্ডুল করতে আদিষ্ট ও প্রেরিত মনে করত।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ইরানের প্রতাপী সেনাপতি আমীর রুস্তমের আহ্বানে হযরত রাবয়ী ইবনে আমের (রা.)-কে দূত হিসেবে পাঠালেন। ইরানীরা বেশ জাঁকজমকের সাথে সংসদ সাজিয়েছে, সোনালী তারের কারুকার্য-খচিত কার্পেটে রেশমের তুলতুলে নরম বিছানা বিছিয়েছে। ইয়াকুত ও মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্যে দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছিল। স্বর্ণখচিত মুকুট রুস্তমের মাথায়, শরীরে স্বর্ণ অলংকৃত পরিচ্ছদ, সোনালী সিংহাসনে সমাসীন। হযরত রাবয়ী (রা.) রাজদরবারে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, শরীরে মোটা মোটা পরিচ্ছদ, হাতে নাঙ্গা তালোয়ার, ঢাল, রানের নীচে হালকা গঠনের অশ্ব, অত্যন্ত সংকোচহীন ভঙ্গিতে রাজদরবারে আসলেন। ঘোড়া বেঁধে সভায় উপস্থিত হতে যাচ্ছেন, ইতোমধ্যে একজন অগ্রগামী দূত তাঁর পথ আগলে ধরলেন, আবেদন করলেন, "হাতিয়ার রেখে দিন।" বলিষ্ঠ উত্তর দিলেন তিনি, বললেন, "আমি স্বেচ্ছায় আসিনি, তোমাদের আহ্বানে এসেছি। যদি এ অবস্থায় আমার আগমন তোমাদের অনুমোদিত না হয় তাহলে আমি এক্ষনি প্রস্থান করছি।" সেনাপতি রুস্তম বললেন, "আসতে দাও।" হযরত রাবয়ী (রা.) কার্পেটে স্বীয় বর্শা বিদ্ধ করতে করতে দৃঢ় পদক্ষেপে আগে বাড়তে লাগলেন। কার্পেট জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেল। অবশেষে তিনি রুস্তমের পাশে গিয়ে বসলেন। রুস্তমে জিজ্ঞেস করলঃ এদেশে কি উদ্দেশে আপনার আগমন? তিনি জবাব দিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ জবাব ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এক মহৎ কাজের জন্য আমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন। তা হলো, আমরা তাঁর নির্দেশে তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে, পার্থিব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রশস্ততায়, ধর্মের নামে রকমারি নির্যাতন নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করে ইসলামের ন্যায়নীতির ছায়াতলে প্রবেশ করাতে তিনি আমাদেরকে স্বীয় ধর্মসহ মাখলুকের প্রতি পাঠিয়েছেন। আমরা যেন সেই ধর্মের দাওয়াত প্রদান করি। যদি তারা তা মেনে নেয় তো আমরা চলে যাব, আর যদি তা অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ে যাব, অনন্তর আমরা পাব আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্রুত সেই ইনাম—পুরস্কার। রুস্তম জিজ্ঞেস করল ঃ কি সেই পুরস্কার? বললেন ঃ এ পথে যারা শহীদ, তাদের জন্য জান্নাত আর যারা গাযী, তাদের জন্য নসরত—সাহায্য। রুস্তম বলল ঃ আমি

আপনার কথা শুনলাম। আপনি আমাদেরকে কিছু সময়ের সুযোগ দেবেন কি আমরা যাতে পরামর্শ করে নিতে পারি রাজন্যবর্গের সাথে? বললেন ঃ হ্যাঁ, জরুর। কতদিন প্রয়োজন আপনার, একদিন, দু' দিন? বলল ঃ এত ত্বরিৎ কি করে হবে? আমাদের চিঠিপত্র পাঠাতে হবে, রায় জানতে হবে। হযরত রাবয়ী (রা.) বললেন ঃ রাসূলে কারীম (সা.) শত্রুর মুকাবেলায় তিন দিনের বেশী সুযোগ দেয়ার নযীর রেখে যাননি। তাই এ ব্যাপারে ত্বরিৎ চিন্তা করে ফেলুন এবং তিন জিনিসের (ইসলাম, কর, যুদ্ধ) মধ্যে থেকে একটি নির্বাচিত করুন। রুস্তম বলল ঃ আপনি কি মুসলমানদের সরদার? হযরত রাবয়ী বললেন ঃ না, সমস্ত মুসলমান এক শরীরসদৃশ। তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন জনেরও সর্বোচ্চ জনের মুকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে।

এক দৌত্যকার্যে গিয়েছিলেন হযরত মুগীরা (রা.)। সেদিন রাজদরবার ছিল অভিনব জাঁকজমকপূর্ণ। ইরানীরা তাদের শান-শওকত, দওলত, ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত সমাবেশ ঘটিয়েছিল। হযরত মুগীরা (রা.) প্রচলিত রীতিনীতি উপেক্ষা করে সভাপতির প্রতি অগ্রসর হলেন এবং তার রানের সঙ্গে রান মিলিয়ে বসে গেলেন। ইরানীরা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। তাঁর বাহু ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিল। হযরত মুগীরা (রা.) দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন ঃ মেহমানের সাথে এ আচরণ সমীচীন ছিল না। আমাদের মাঝে এই রীতিনীতি নেই, এক ব্যক্তি খোদা সেজে বসে থাকবে আর সমস্ত লোক তার সামনে বান্দার মত দাঁড়িয়ে থাকবে। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কথোপকথনের যখন অনুবাদ করা হলো, দরবারে তখন নীরবতা ছেয়ে গেলো এবং তারা তাদের ভুল স্বীকার করল।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) এক রোমীয় রাজদরবারে দূত হিসেবে গেলেন। রাজদরবারে সোনালী কিংখাবের ফরশ বিছানো ছিল। হযরত মুয়াজ (রা.) জমীনে বসে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি এমন বিছানায় বসতে চাই না, যা গরীব অসহায়দের অধিকার হরণ করে তৈরি করা হয়েছে। খৃস্টানগণ বলল ঃ আমরা তোমাকে সম্মানিত করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু কি করব–আত্মসম্মানের প্রতি তোমার কোন খিয়াল নেই। হযরত মুয়াজ (রা.) হাঁটুর সহায়তায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ তোমরা যাকে সম্মান মনে করো, আমার তার পরোয়া নেই। যদি জমিনে বসা দাসদের অভ্যাস হয়ে থাকে. তাহলে আমার চেয়ে আল্লাহ্‌র বড় দাস আর কে? একজন জিজ্ঞেস করল ঃ মুসলমানদের মধ্যে তোমার চেয়ে বড় কেউ আছেন কি? হযরত মুয়াজ (রা.) বললেন ঃ (আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) আমি সর্বনিকৃষ্ট নই, এটাই তো ঢের! রোমকরা গর্ববোধ করতে লাগল তাদের সম্রাটকে নিয়ে। হযরত মুয়াজ (রা.) বললেন ঃ তার ওপর তোমাদের গর্ববোধ যে, তোমরা এমন সম্রাটের প্রজা, তোমাদের জান-মালের ব্যাপারে যার

ইখতিয়ার আছে কিন্তু আমরা যাকে আমাদের শাসক বানিয়েছি, তিনি কোন বিষয়ে নিজেকে প্রাধান্য দেন না। যদি তিনি ব্যভিচার করেন, তাকে দুররা লাগানো যাবে, যদি চুরি করেন, হাত কাটা যাবে। তিনি পর্দার আড়ালে বসেন না, তিনি নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করেন না, মাল-দৌলত-ঐশ্বর্য আমাদের চেয়ে তাঁর বেশী নেই।

এই হচ্ছে মানুষের আমূল পরিবর্তন যা এক আল্লাহ্‌কে স্বীয় প্রকৃত উপাস্য ও প্রতিপালক মেনে নেয়া হয়েছে। বিবর্তিত হয়েছে তাদের জীবন–আদ্যোপান্ত। যারা ছিল পশুর গুণে গুণান্বিত, তারা বিভূষিত হলো ফেরেস্তার ভূষণে। যারা ছিল লুণ্ঠনকারী ডাকাত, তারাই রক্ষাকারী হয়ে গেল অন্যের সম্পদ, সম্মান, জীবন সম্ভ্রমের। যারা পশুকে আগে পরে পানি পান করানো নিয়ে রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত করত, তারাই অন্যের জীবন রক্ষায় তৃষ্ণায় মরে যাওয়া পছন্দ করতে লাগল। যারা তাদের স্নেহাস্পদ শিশুদের স্বহস্তে সমাধিস্থ করত জমিনে, অন্যের শিশু প্রতিপালনের নিমিত্ত নিজের কোল খালি করতে লাগল। যারা অন্যের সম্পদকে মনে করত নিজের সম্পদ, তারাই আগ্রহ ভরে স্বীকার করতে লাগল নিজের সম্পদে অন্যের অধিকার। যারা দিবালোকে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনে সন্ত্রস্ত হতো না, তারাই রাতের আঁধারে ইরানের সম্রাটের স্বর্ণখচিত মুকুট যা লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ ছিল, স্বীয় কম্বলে লুকিয়ে আমীরের নিকট পৌছে দিয়েছিল।

আল্লাহর অন্বেষণ, দুনিয়া ও রিজিক অন্বেষণের ঐ উদ্যম ও আবেগকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, যা সংকীর্ণ করে দিয়েছিল পার্থিব নিরাপত্তা এবং দুনিয়াকে রূপান্তরিত করেছিল শুধু হাট-বাজারে। প্রতিযোগিতার ঐ স্বাভাবিক আবেগ যা মানুষের বশীভূত শক্তিকে উত্তেজিত করে তোলে এবং তার নৈপুণ্যকে উজ্জ্বল করে তোলে, যে দুনিয়ার প্রতি প্রথমেই নিবিষ্ট হয়ে জীবনকে রূপান্তরিত করেছিল এক অহর্নিশ আকর্ষণ-বিকর্ষণে, সৃষ্টি করে দিয়েছিল ভাই ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে-ই দ্বীনের প্রতি মনোনিবেশ করে জাগিয়ে তুলল অভিজাত মানুষের স্বভাব। পবিত্র বানাল তার সীরাত-চরিত্র। মানুষের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন মানুষের মাঝে পরস্পর থেকে অগ্রণী হওয়ার প্রতিযোগিতা চলত কিন্তু তা পুণ্যময় কাজে, আজর ও সওয়াবে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভার্থে গরীব সাহাবায়ে-কেরাম অভিযোগ করলেন দরবারে রিসালাতে, "আমাদের সম্পদশীল ভাইয়েরা আমাদের চেয়ে আগে বেড়ে যাচ্ছে, নামায, রোযা তো তারা আমাদের মতই করে কিন্তু দান-খায়রাতে আমরা তাদের সাথে পারি না।"

দয়ার নবী তাদেরকে একটি 'যিকর' বলে দিলেন গোপনে। সম্পদশালীরা তা শুনল, পড়তে শুরু করে দিল তারাও। গরীব সাহাবায়ে-কেরাম এলেন, আবেদন করলেন, "আমরা তো আবার পেছনে পড়ে যাচ্ছি। আমাদের সম্পদশীল

ভাইয়েরা তো এটাও পড়তে শুরু করে দিয়েছেন যা আপনি আমাদেরকে বলে দিয়েছিলেন।" তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। যুহদ (সংসারের প্রতি উদাসীনতা), ক্বানাআত (অল্পে তুষ্টি) পার্থিব জীবনকে জান্নাতের মডেল বানিয়ে দিয়েছিল, যাতে "তাদের ওপর না কোন ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত সন্তপ্ত হবে"-এর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মালের লোভ-লালসার প্রতিযোগিতা তিরোহিত হয়ে হৃদয়তন্ত্রীতে জন্ম নিয়েছিল নিখাদ প্রেম; গভীর ভালবাসা। পরিণামে 'তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ছিল আমি তা দূর করে দিয়েছি।' এর দৃশ্যপট, যা জান্নাতীদের গুণ, ইহজগতে দৃশ্যমান হতে লাগল। অধিকার চাওয়ার পরিবর্তে কর্তব্যজ্ঞান, লোভ-লালসার স্থলে আত্মত্যাগের এরূপ শক্তি যুগিয়েগিল, "নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে"-এর বাস্তব নমুনা দর্শকের সামনে ভেসে উঠল। স্বর্গীয় আঁখি নির্নিমেষে দেখেছে এ যুগ। মেযবান প্রাণপ্রিয় শিশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নির্বাপিত করে দিয়েছেন প্রদীপ, মেহমানকে এ বিশ্বাস দেয়ার নিমিত্ত, "তাঁর সাথে তাঁরাও খাচ্ছেন।" মেহমান উদর পূর্তি করে খেলেন আর মেযবান স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ রাতভর ভুখা থাকলেন।

এসব সংশোধন, অগ্রগতি, আল্লাহ্ তা'আলাকে একক উপাস্য মেনে নেয়া, নিজেকে তাঁর সমীপে অর্পণ করা এবং এক নিষ্পাপ নবীর তত্ত্বাবধান ও লালন-পালনে নিজেকে সোপর্দ করার অনিবার্য ফল। এ দ্বারা যেন তার জীবনধারা তার আসল ছাঁচে মিলে গেছে। এসে গেছে প্রত্যেকে তার স্ব স্ব স্থানে।

খৃস্ট জগত এ বার্তা মূল্যায়ন করেনি। প্রাচ্য দেশগুলো তো ত্বরিৎ তাদের সামনে মাথা নত করেছে, যারা এ বার্তার বাহক, স্বীয় নবীর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মুজাহিদীন ও ইসলামের প্রতি আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দেয়নি। তারা পূর্ণ নয় শতাব্দী (প্রায় ১ হাজার বৎসর) মূর্খতা ও অন্ধকার যুগে কাটিয়েছে, যাকে নিজেরাই অন্ধকার যুগ আখ্যায়িত করত। মানবিক ইতিহাসের এই সুদীর্ঘকাল যা জাতিকে উপহার দিয়েছে কেবল বর্বরতা, মূর্খতা, জ্ঞান-শত্রুতা, প্রবৃত্তি পূজা, পাদ্রী কর্তৃক মানুষকে কষ্ট দান, মানুষকে অসন্তুষ্ট করা, পাদ্রীদের অগ্নিপূজা ও নিপীড়নমূলক খতিয়ান। এর আফসোস অহর্নিশ থাকবে ইউরোপে। এর লজ্জা ও অনুশোচনায় তার গর্দান অবনমিত থাকা উচিৎ প্রতিনিয়ত। এসব ভোজভাজি ছিল সৃষ্ট পূজার। "তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও।"

ষোল শতাব্দীতে যখন তাদের আঁখিযুগল খুলল, কল্পনায় ভেসে উঠল তখন তাদের সমস্ত বিপর্যয়ের চিকিৎসা হলো গীর্জার গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করা। কিন্তু 'লা-ইলাহা'-এর পুরো মনযিল তারা অতিক্রম করেনি তখন, কেবল 'লা কালীমা'কে 'লা-ইলাহা'-এর প্রতিশব্দ মনে করেছে এবং শুধু একে অস্বীকার করে সমস্ত উপাস্যকে স্থান দিয়েছে হৃদয়ে। আর 'ইল্লাল্লাহ' তো তারা শুরুই করেনি। পাশ্চাত্যবাসী তাদের ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিন শতাব্দীতে পছন্দনীয় এক উপাস্যকে বর্জন করে নতুন নতুন উপাস্য আবিষ্কার করতে লাগল। "তোমরা কি স্বহস্তে নির্মিত পাথরের পূজা করছ?" এর দৃশ্যপট ভেসে আসতে লাগল। আজও তাদেরকে অনেক প্রাচীন উপাস্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে অন্য নতুন ভ্রান্ত উপাস্য গ্রহণ করতে দেখা যায়। ওসবের কোনটির নাম গণতন্ত্র। কোনটির নাম আমিরিয়্যাত বা ডিক্টেটরশিপ। কোনটির নাম পুঁজিবাদ। কোনটির নাম সমাজতন্ত্র। কারো নাম সাম্প্রদায়িক সমাজতন্ত্র। কারো নাম সম্প্রদায়। কারো নাম স্বদেশ, জন্মভূমি। পাশ্চাত্যবাসী তাদের জীবনের নকশা তৈরি করে প্রৌঢ় হিসেবে এবং তাদের জীবনের সময়ের প্রহর পাট পাট করে একত্র করে। কিন্তু তাদের কোন ছাঁচ মডেল নেই যার মত করে জীবন সাজাবে ঐ ঝঞ্ঝাটে দড়ির পাক খুলতে, সমস্যার সমাধান করতে যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত কৌশলে বিশ্লেষণ চলছে ; কিন্তু বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা যে পরিমাণ হচ্ছে তাতে সেটা আরো জটিল থেকে জটিল হচ্ছে। অনন্তর তার অঙ্গুলি এমনভাবে পাঁকে পড়ছে যে বের হতে পারছে না।

তারা জীবনের হাজারো নক্শা প্রণয়ন করেছে এবং এতে হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংশোধন করেছে এবং নতুন নতুন নাম দিয়েছে। এক ব্যক্তির দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছে অনেকের ওপর কিংবা অনেকের দায়িত্ব অর্পণ করেছে একজন অভিজ্ঞ, নির্বাচিত, যোগ্য দায়িত্ববান ব্যক্তির ওপর এবং তার ওপর আরোপ করেছে অনেক শর্তাবলী, নিয়মাবলী কিন্তু যাবৎ এই শরীরের অন্তর্নিহিত অন্তরে রূপান্তর আসবে না, চাই জিম্মাদার একজন/ দল/ পুরো সম্প্রদায় হোক, যাবৎ নিজেকে সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টার সামনে দায়িত্ববান মনে করবে না, তার হৃদয়ে আল্লাহর ভয়, পর জীবনের পুংখানুপুংখ বিচার-বিশ্লেষণের ভয় হবে না, কল্যাণপ্রবণতা, পুণ্য ও আমানতের অনুভূতি আসবে না, তাবৎ শুধু নামের পরিবর্তন দিয়ে, ক্বানুন ও নিয়মাবলী দিয়ে বাস্তব অর্থে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর জগতের প্রতি, যার নেতৃত্ব আজ পাশ্চাত্যের হাতে—সীরাতে মুহাম্মদীর মৌলিক বার্তা হলো, "হে আল্লাহ্ থেকে পলায়নকারি! আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। তাঁকে ছাড়া কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো না।" ইরশাদ হচ্ছে,

"অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তার তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এ বার্তা, আদর্শ প্রতি বৎসর জগতকে শোনানো হচ্ছে। পৌঁছিয়ে দেয়া হচ্ছে এ দাওয়াত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। বাতাস তার কাঁধে নিয়ে, সমুদ্র তার মাথায় রেখে প্রতি বছর পৌঁছিয়ে দেয় এ বার্তা দাওয়াত দেশের পর দেশে, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়ে। জগতের এ নবীর ধ্বনি, যদিও তা অস্ফুট, সামান্য, তথাপি এখনও যেন প্রতিধ্বনিতে হচ্ছে শ্রবণেন্দ্রিয়ে, যা শুনছিল আহলে-কিতাবগণ প্রথমে শতাব্দীতে। "তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।"

নবীগণই মানবিক জাহাজের ক্যাপ্টেন। যুগে যুগে মানুষের নৌকা তাদেরই দক্ষ পরিচালনায় উপকূলে পৌঁছেছে। হযরত নূহ (আ.)-র ছেলেরই শুধু বিশেষত্ব ছিল না; যুগে যুগে যে কেউ দাবী করেছে, "আমি অচিরেই কোন পর্বতে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে", তাকেই জবাব দেয়া হয়েছে, "আজকের দিনে কোন রক্ষাকারী নেই।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হওয়ার পর ব্যক্তি, সম্প্রদায়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, প্রাচীন-আধুনিক—সকলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা হলো, সৌভাগ্য ও সফলতা তাঁর আদর্শ অনুকরণেই নিহিত। দুর্ভাগ্য, ধ্বংস, বঞ্চনা আর অকৃতকার্যতা তাঁকে বর্জনেরই অনিবার্য পরিণাম।

সমাপ্ত